

মাসুদ রানা

নরকের কীট

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



Boighar



BOIGHAR.COM

Please Give Us Some
Credit When You Share
Our Books!

Don't Remove
This Page!

COLLECTION

वशे

२६

EDIT

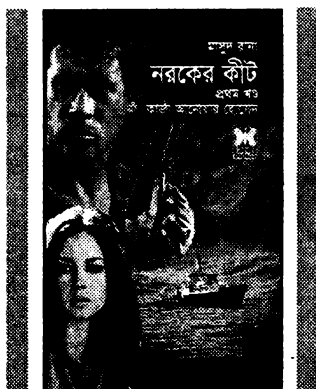


घर

Visit Us at
boighar.com

If You Don't Give Us
Any Credits, Soon There'll
Nothing Left To Be Shared!

মাসুদ রানা ৪৩৯
নরকের কীট
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7439-4



আশি টাকা

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০১৫

রচনা. বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ- বিদেশি ছবি অবলম্বনে
বনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং- বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দুরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪

সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩

জি. পি. ও বক্স ৮৫০

mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-439

NOROKER KEET

Part-I

A Thriller Novel

By: Qazi Anwar Husam

www.boighar.com



এক নজরে

মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*বর্ণমগ্ন*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু
ভয়ঙ্কর*সাগরসন্ধ্যা*রানা! সাবধান!!*বিশ্ময়*রত্নধীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর
*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাখি অঙ্ককার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা
*কাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও যড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ
*অদৃশ্য শত্রু*শিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ
সীমাহিত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনা*জ*লাল
পাহাড়*কব্জ*স্পন*প্রতিহিংসা*হংকং স্ট্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস
*বর্ণতরী*পণি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই
লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টাগেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রোতাত্ম
*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*বর্ণ সংকট*সল্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার
*বর্ণগরাজ*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনখান*অ্যামবুশ*আরেক
বারমুড়া*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ
*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অঙ্ককারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ
*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্ষয়*শান্তিদূত*শেত সন্ধান*ছত্রবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুগ্ধ বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই
সম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অন্তঃ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন স্ট্রাট*বিষকন্যা*সত্যাবাবা
*যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন
*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিপথ
*জাপানী ক্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরশিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী
*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় কুখ্যাত*বর্ণধীপ*রক্তপিপাসা
*অপহরণ*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাঁউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বন্ধু*মৃত্যুর প্রতিনিধি
*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোখা*কালো কাইল*মাকিয়া
*হীরকস্ট্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টাগেট
বালাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুকাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা
*মায়ান ট্রেজার*বড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা
*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*ভূপের ভাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রক্তবড়
*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জুলাহে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ
*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সারিয়া
চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা
*বাঘের খাচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপথ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ
চক্রান্ত*চরস্বধীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোন্ধুর*আবার যড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অন্তঃ
প্রহর*কনকতরী*বর্ণধনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড
মিশন*স্টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাক্সনজ*গহীন অরণ্য
*প্রজেক্ট X-15*অঙ্ককারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডকাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন
তেলআবিব*ক্রাইম বসু*সুন্সের ডাক*ইশকানের টেকা*কালো নকশা*কালনাগিনী
*বেইমান*সুপ্তে অস্তরীপ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাকিয়া ডন
*হারানো অটিলান্টিস*মৃত্যুবাণ*কমান্ডো মিশন*শেষ হাসি*স্মাগলার*বন্দি রানা*নাটের
গুরু*আসছে সাইক্রোন*সহযোগী*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুইন কন্যা*অরক্ষিত
জলসীমা*দুরন্ত ইগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*ব্লাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান
*জলরাফস*মৃত্যুনীভল *স্পর্ধা*সুপের ডালবাসা*হাকার*খুনে মাকিয়া*নিষোজ*বৃশ
পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অভ্যর্থন*ড্রাগলড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে
সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*বর্ণ-বিপর্ষয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্রাইবার*আন্তন
নিয়ে খেলা*মরুসর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*অন্তঃ পিঙ্ক*সুর্ষ*সৈনিক
*ট্রেজার হাণ্ডার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক
*পাশিয়ান ট্রেজার*বাউন্টি হাণ্ডার*মৃত্যুধীপ*জাপানি টাইকুন*পাতকিনী*নরকের কীট।

এক

ভারত মহাসাগরের সুনীল বুকে গড়াতে শুরু করে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক মস্ত ঢেউ। আর সেগুলোকে চিরে দিয়ে ছুটছে এস.এস. ভিক্টর কেইন। ম্যালেরিয়ার রোগীর মত বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে কাঁপছে গোটা জাহাজ।

গত চার বছর ধরে একটানা চলছে সর্বনাশা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। রণতরীগুলোর জন্যে প্রয়োজনীয় মালামাল পরিবহনের গুরু দায়িত্ব নিয়ে অল্প কিছুদিন আগে সাগরে নেমেছে দ্রুতগতির এই মার্কিন ফ্রেইটার। প্রয়োজনে পাড়ি দেবে হাজার হাজার মাইল। সাগরে প্রথম ট্রায়ালের পর আর কখনও এত গতি তুলতে হয়নি ওটাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে ফেটে যেতে চাইছে বয়লার। প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জ্বলন্ত জাহাজটা। চিমনি দিয়ে ভক-ভক করে বেরোনো কালো ধোঁয়া পেছনে ফেলে ছুটছে ওটা ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যায়।

দুলতে দুলতে দশ ফুট উঁচু ঢেউয়ের শিখরে উঠছে এস.এস. ভিক্টর কেইন, পরক্ষণে হোঁচট খেয়ে খোঁড়লের মত নিচু সাগরে গিয়ে ঢুকছে বো। দু'পাশের রেলিং টপকে ডেক ভিজিয়ে দিচ্ছে সাগরের জল। ঝাঁকি খেয়ে বার-বার উঠছে-নামছে ভাঙাচোরা ব্রিজ।

এস.এস. ভিক্টর কেইনের সুপারস্ট্রাকচারের উপর অংশ প্রায় নরকের কীট-১

বিধ্বস্ত। রকেটের আঘাতে তুবড়ে যাওয়া ডেকের প্লেটিঙের ফাঁক দিয়ে বেরোচ্ছে ধোঁয়া। নানান দিকে পড়ে আছে ভাঙা যন্ত্রপাতি ও নাবিকের লাশ। ক্ষতি যা হওয়ার হয়েছে জাহাজের উপর অংশে, পানির নীচে খোল এখনও পুরোপুরি অক্ষত। আর কোনও হামলা না হলে হয়তো পালাতে পারবে এ যাত্রা।

পিছনের কালো দিগন্তে জ্বলছে দাউ-দাউ আগুন, সেইসঙ্গে ধোঁয়া আর ধোঁয়া। বহরের আর সব জাহাজের কপাল ছিল মন্দ। ওদিকে আরও একটা জাহাজের বুক থেকে লাফিয়ে উঠল কমলা আগুনের গোলক। সেই লালচে আলোয় পলকের জন্য দেখা গেল সাগরের বুকে নিমজ্জিত-প্রায় অন্য জাহাজগুলোকে। নরক হয়ে উঠেছে ওদিকটা।

চারটে মন্ত, জ্বলন্ত জাহাজ— তিনটে ডেস্ট্রয়ার, অন্যটা ক্রুয়ার। ওগুলো ছিল এস.এস. ভিক্টর কেইনের এস্কের্ট। ওরা নির্বিঘ্নে পাড়ি দিচ্ছিল সাগর, এমনসময় দেখে ফেলল জাপানি এক সাবমেরিন। খবর পেয়ে ছুটে এসেছে এক স্কোয়াড্রন ডাইভ-বমার। এখন ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যা, তলিয়ে যেতে শুরু করা সব জাহাজের তেল ভাসছে সাগরে। নানান দিকে জ্বলছে আগুন, আকাশ আঁধার করে তুলেছে ঘন ধোঁয়া। ওই চার জাহাজের কোনোটাই আর দেখবে না আগামী সকাল।

প্রথমেই ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে সব রণতরী। একের পর এক রকেটের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সরে গিয়ে পালাতে শুরু করেছে এস.এস. ভিক্টর কেইন। একটি মাত্র কারণে ওটাকে ডুবিয়ে দেয়নি জাপানি বৈমানিকরা। তারা ভাল করেই জানে, ওই জাহাজে আছে টপ সিক্রেট কার্গো— জিনিসটা চাই তাদের।

মারা গেছে এস.এস. ভিক্টর কেইনের বেশিরভাগ ক্রু, ক্যাপ্টেন জন উইলি নিজেও আহত; কিন্তু শপথ করেছেন, জান থাকতে শত্রুর হাতে পড়তে দেবেন না তাঁর কার্গো। গাল ফেটে

দরদর করে বরছে রক্ত, খপ্ করে ভয়েস টিউব তুলে নিয়ে
টেঁচিয়ে উঠলেন ইঞ্জিন রুমের উদ্দেশে: ‘আরও গতি চাই!’

জবাব দিল না কেউ।

শেষবার যখন নীচ থেকে পরিস্থিতি জানানো হলো, বলা
হয়েছে, আগুনে জ্বলছে নীচের ডেক; তখন দলের শেষ ক’জনকে
আগুন নেভাতে পাঠিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন।

কিন্তু এখন ওদিক থেকে কারও কোনও সাড়া নেই।

আশঙ্কায় গলা শুকিয়ে গেল তাঁর।

‘পোর্ট বো থেকে ছয় হাজার ফুট দূরে শত্রু বিমান, নেমে
আসছে খুব দ্রুত,’ ব্রিজ উইং থেকে চিৎকার করল লুকআউট।

ভাঙা জানালা দিয়ে ওদিকে চাইলেন ক্যাপ্টেন উইলি। ধূসর
আকাশে দেখলেন চারটে কালো ফোঁটা। অনেক উপর থেকে
নামছে জাহাজ লক্ষ্য করে। দুটো বিমান সামনে, ওগুলোই আগে
হাজির হবে রকেট ছুঁড়তে।

‘অপারেটর, সামনের বিমানের ককপিটে তাক করো পেইন
মেকার মেশিন!’ চিৎকার করে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

বেশ কয়েকটা স্পিকারওয়ালা বিদ্যুটে এক যন্ত্র নিয়ে বো-তে
আছে এক টেকনিশিয়ান, স্টিয়ারিংয়ের মত হুইলে রেখেছে একটা
হাত। সামনের দুই বিমানের একটার দিকে স্পিকার তাক করেই
বন-বন করে ঘোরাতে লাগল হুইলের হ্যাণ্ডেল।

ডানের বিমানের ককপিটে তাক করা হয়েছে সব স্পিকার।
অদ্ভুত যন্ত্র থেকে বেরোল চাপা খ্যাস-খ্যাস আওয়াজ।

অনেক কাছে চলে এসেছে সামনের দুই বিমান।

কিন্তু হঠাৎ করেই সরাসরি নীচের সাগরে নাক তাক করল
ডানদিকের বিমান। যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে বৈমানিক। বিমান
সামান্যতম নিয়ন্ত্রণ না করেই বিশাল ঝপাস্ আওয়াজ তুলে
তলিয়ে গেল সে সাগরে।

বামের বিমানের ককপিটে পেইন মেকার মেশিন তাক করল অপারেটর। কিন্তু আগেই খুব কাছে চলে এসেছে যান্ত্রিক পাখি।

‘সবাই শুয়ে পড়ো!’ গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন।

বিমানের ডানা থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে আগুনের লাল হলকা। জাহাজের বো থেকে স্টার্ন পর্যন্ত ঝাঁঝরা হলো পঞ্চাশ ক্যালিবার বুলেটে। বিজে করাত দিয়ে কাটা গাছের মত দুই টুকরো হলো লুকআউট। বো-র কাছে কিমা হলো পেইন মেকার মেশিনের অপারেটর। বিজের নানান দিকে ছিটকে গেল কাঠ-কাঁচ-স্টিলের টুকরো।

ঝাঁপিয়ে পড়ে ডেকে শুয়ে পড়েছেন ক্যাপ্টেন উইলি। তাঁর উপর দিয়ে বয়ে গেল উষ্ণ হলকা। এইমাত্র বিজের ছাতে আঘাত হেনেছে আরেকটা রকেট। ওটার বিস্ফোরণে থরথর করে কাঁপছে গোটা জাহাজ। দানবীয় ক্যান ওপেনারের মতই ভারী প্লেটিং উপড়ে নিয়েছে রকেট, যেন ছিঁড়ে দিয়েছে অ্যালিউমিনিয়ামের পলকা ক্যানের ঢাকনি।

ধ্বংসযজ্ঞের ভয়ঙ্কর তোড় কমতেই মুখ তুলে চাইলেন ক্যাপ্টেন। শেষ হয়ে গেছে তাঁর সব অফিসার। বোমার আঘাতে উড়ে গেছে লোহার বিজ। এমন কী জাহাজের হুইলও উধাও। স্পিগুলের সঙ্গে ওখানে আছে শুধু লোহার স্টাব। তবুও কেমন করে যেন এখনও ছুটছে মার খাওয়া জাহাজ।

মেঝে ছেড়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন উইলি, একটা ব্যাপার খেয়াল করেছেন। নতুন আশা জন্মাল তাঁর বুকে: ওই যে সামনে থেকে ধেয়ে আসছে কালো মেঘ, ওখানে ঝরছে ঝমঝম বৃষ্টি। স্টারবোর্ড লক্ষ্য করে যেন আসছে ভারী একটা পর্দার মত। একবার ওই বৃষ্টির মাঝে ঢুকে যেতে পারলে হয়তো রক্ষা পাবে তাঁর জাহাজ। একটু পর নামবে রাতের কালো। ডাইভ-বমারগুলো তখন আর খুঁজে পাবে না এস.এস. ভিক্টর কেইনকে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বালকহেড ধরলেন তিনি। ওখান থেকে হাত বাড়িয়ে দিলেন হুইলের অবশিষ্ট অংশের দিকে। গায়ের জোরে বামে ঘোরালেন ওটা। আধপাক ঘোরাতে গিয়েই পা ফস্কে পড়ে গেলেন তিনি। তবুও ধরে রাখলেন ভাঙা হুইল।

হ্যাঁ, গতিপথ পাল্টে যাচ্ছে এস.এস. ভিক্টর কেইনের।

মেঝে না ছেড়ে দু'হাতে হুইলটা উপরে ঠেললেন ক্যাপ্টেন। ওটা আধপাক ঘুরাতে ব্যয় করলেন অবশিষ্ট শক্তি। পুরো এক চক্র ঘুরল স্টাব। কাত হয়ে বাঁক নিয়ে সাগরে সাদা ফেনা তৈরি করে ঝড়-বৃষ্টির দিকে ছুটল-জাহাজ।

সামনের আকাশে ঘন কালো মেঘ থেকে তুমুল বৃষ্টি ঝরছে সাগরের বুকে। যেন নেমে আসছে একের পর এক ধূসর, ভারী পর্দা, সেইসঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের ঝিলিকের পর ঝিলিক। জাপানি হামলার পর এই প্রথম ক্যাপ্টেন উইলির মনে হলো, বাঁচার সামান্য সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু তখনই ঝড়-বৃষ্টির শব্দের উপর দিয়ে ভেসে এল ডাইভ-বমারের নেমে আসবার তীক্ষ্ণ শোঁ-শোঁ আওয়াজ।

ক্রমেই কাছে চলে আসছে ডাইভ-বমারের হুঙ্কার। ক্ষত-বিক্ষত জাহাজের বালকহেডের পাশ থেকে আকাশে চোখ রাখলেন ক্যাপ্টেন উইলি। সরাসরি সামনে থেকে আসছে আরও দুটো আইচি ডি থ্রি এ ডাইভ-বমার। ওই বিমান ব্যবহার করেই আমেরিকার পার্ল হার্বার ভয়ঙ্করভাবে তুণ্ডে দিয়েছে জাপানিরা। পরেও শ্রীলঙ্কার কাছে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ ফ্লিটের।

চূপ করে চেয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন উইলি।

ডানার তীব্র আওয়াজ তুলে নেমে এল দুটো বিমান। রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেল ক্যাপ্টেনের। গালি দেয়ার ফাঁকে কোমরের হোলস্টার থেকে বের করলেন রিভলভার। 'আমার জাহাজ থেকে সরে যা, শয়তানের বাচ্চারা!' চেষ্টাচ্ছেন তিনি, বার-বার ট্রিগার

টিপে খালি করে ফেললেন কোন্স্ট পয়েন্ট ফোর ফাইভ।

জাহাজের নাকের কাছে নেমে পরক্ষণে সাঁই করে আকাশ চিরে বেরিয়ে গেল দুই বমার। তার আগে পঞ্চাশ ক্যালিবারের ঝাঁক ঝাঁক গুলি নেমেছে জাহাজের ডেকে। একটা গুলি বিঁধেছে ক্যাপ্টেনের উরুতে, চুরমার করে দিয়েছে হাড়। কাদা রঙের আকাশে চোখ রেখে চিত হয়ে পড়ে থাকলেন তিনি। চেষ্টা করেও সরে যেতে পারলেন না। তাঁর উপর দিয়ে বয়ে গেল কটু-গন্ধী ধূসর ধোঁয়া। বুঝলেন, তাঁর লড়াই শেষ। এবার যে-কোনও সময়ে জাহাজে উঠে গোপন কার্গো দখল করবে শত্রুরা।

বিড়বিড় করে নিজেকে অভিশাপ দিলেন উইলি। আগেই উচিত ছিল জাহাজটা ডুবিয়ে দেয়া। এখন আর কিছুই করবার নেই। বার-বার প্রার্থনা করলেন, যেন শত্রুরা পৌছবার আগেই নিজ থেকেই তলিয়ে যায় এই জাহাজ।

তীব্র ব্যথার ভিতর সবই আবছাভাবে দেখছেন তিনি। শুনলেন পৌছে গেছে আরও কয়েকটা ডাইভ-বমার। ডানার আওয়াজ বাড়ছে। আর কয়েক সেকেন্ড পর ফুরিয়ে যাবে তাঁর জীবন।

কিছু ঠিক তখনই মাথার উপরে কালচে হয়ে গেল আকাশ। বাতাস ভীষণ শীতল আর ভেজা। এক সেকেন্ড পর ঝড়ের মধ্যে ঢুকল এস.এস. ভিক্টর কেইন। দমকা হাওয়ায় কোটি কোটি খুদে জলকণা আর তুমুল বৃষ্টি গপ্ করে গিলে নিল জাহাজটাকে।

শেষবার ওটাকে দেখে রিপোর্ট করেছিল যুদ্ধবিমানের এক পাইলট। ওই জাহাজের ডেকে তখন জ্বলছিল লেলিহান আগুন। ইঞ্জিনের পুরো শক্তি নিয়ে ছুটছিল এস.এস. ভিক্টর কেইন। পরে আর কখনও দেখা যায়নি ওই জাহাজ। কেউ জানে না ওটার কী হয়েছে।

দুই

উনিশ শ' সাতষটি সাল ।

সৌদি আরবের সীমান্ত থেকে সামান্য দূরে উত্তর ইয়েমেনের মরুভূমি এলাকা । মাঝ দুপুরকে পিছনে ফেলে হাঁটি-হাঁটি পায়ে বিকেলের দিকে চলেছে ঘড়ির কাঁটা ।

একবার জুলাইয়ের তপ্ত কড়াইয়ের মত সূর্য দেখে নিল মনযুর বিন হানিফি । মাথা মুড়ে নিয়েছে কাফিয়া দিয়ে । সাদা, নরম সুতির কাপড়ে ঢাকা নাক-মুখ । মরুভূমির কড়া তাপ, শুষ্ক হাওয়া আর কর্কশ বালি থেকে আড়াল করেছে তার রুম্ম, কঠিন চেহারা; সেইসঙ্গে দুনিয়া থেকে গোপন করেছে নিজের মুখ । শুধু দেখা যাচ্ছে তার বিড়ালের মত কটা চোখদুটো । ওখানে কঠোর, শীতল দৃষ্টি । পিছনে ফেলে এসেছে মরুভূমির কঠিন, কষ্টকর একানুটি বছর । প্রতিপক্ষের দিকে চাইলে কখনও চোখের পলক পড়ে না তার, যেন দেখছে তার লাশ ।

এখনও সামনে পড়ে আছে মৃতদেহ ।

সব মিলে আটটা । অপরিচিত ।

দু'জন পুরুষ, তিনজন মহিলা, তিনটে বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ।

সবাই উলঙ্গ ।

এমন কী লাশের পোশাকও কেড়ে নেয়া হয়েছে ।

গুলি করা হয়েছে কয়েকজনকে ।

অন্যরা খুন হয়েছে ছোরার আঘাতে ।

উটের কাফেলা থামিয়ে নিজে এগিয়ে এসে লাশগুলো দেখছে
মনযুর বিন হানিফি, ভাবলেশহীন চোখ ।

কিছুক্ষণ পর আর সবাইকে পিছনে রেখে সর্দারের দিকে
এগিয়ে এল একজন ।

শক্ত-সমর্থ এই যুবক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসেছে উটের পিঠে ।
নাম খালিফ বিন আদনান । মনযুরের বিশ্বস্ত কর্মচারী, সাগরেদ ও
নিত্যসঙ্গী । ঋজু দেহ তার । প্রশস্ত কাঁধে ঝুলছে রাশার তৈরি
একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল ।

‘মরু দস্যুদের কাজ,’ বলল খালিফ । ‘তবে কাউকে দেখিনি
আমরা ।’

কর্কশ বালিতে পায়ের চিহ্ন খুঁজল মনযুর বিন হানিফি ।
পশ্চিমে গেছে । আর ওইদিকেই আছে এক শ’ মাইলের মধ্যে
পানির একমাত্র উৎস ।

ওই মরুদ্যানের নাম ‘মিয়াহা আন্বা’ অর্থাৎ মিষ্টি পানি ।

‘না, তারা অপেক্ষা করেনি,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল মনযুর বিন
হানিফি । ‘ক’জন, তাও গোপন করেছে । হেঁটে গেছে শক্ত জমির
ওপর দিয়ে । কোনও ছাপ নেই । অথবা নরম বালির ওপর দিয়ে
গেছে হাওয়ায় যেন মুছে যায় সব ছাপ । কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে
পারছি, ওরা যাচ্ছে আমার বাড়ির দিকেই ।’

কয়েক প্রজন্ম ধরেই মিয়াহা আন্বার মালিক মনযুর বিন
হানিফির পরিবার । ওখানে আছে সুপেয় পানি, আর সে কারণেই
হাতেও আসে প্রচুর টাকা । কূপের আশপাশের উর্বর মরুদ্যানে
অভাব নেই খেজুর গাছের । এ ছাড়া রয়েছে ভেড়া বা উটের জন্যে
প্রচুর ঘাস । বিক্রির জন্যে তৈরি তরতাজা ভেড়া বা উট ।

এখন অবশ্য ক্রমেই মালামাল বহনের জন্য বাড়ছে ট্রাক বা
অন্যান্য যানবাহন । অনেক কমে গেছে দুস্তর মরু পাড়ি দেয়া
কাফেলা । ফলে ক্রমেই পানি, খেজুর, উট ও ঘাস বিক্রি করে

পাওয়া টাকার পরিমাণ কমে আসছে। মনযুর বিন হানিফির মত উট পালনকারী বেদুঈনদের পরিবার তাই দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে আরব ভূখণ্ড থেকে। মনযুর বুঝে গেছে, তার পরিবার ও দলের লোকজনকে টিকিয়ে রাখতে হলে যেভাবে হোক ওই মরুদ্যানের ওপর থেকে নির্ভরতা কমাতে হবে।

‘আপনার ছেলেরা তাঁবু আর পরিবারকে রক্ষা করবে,’ বলল খালিফ বিন আদনান।

ওই মরুদ্যান এখান থেকে বিশ মাইল পশ্চিমে। ওখানে অপেক্ষা করছে মনযুর বিন হানিফির তিন ছেলে, দুই ভতিজা এবং পরিবারের অন্যরা। বাড়ি বলতে ছয়টি বড় তাঁবু। ওখানে আছে দশজন পুরুষমানুষ। প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে রাইফেল। একদল ডাকাত আচমকা হামলা করে সব দখল করে নেবে, সেটা সহজ হবে না। তবুও খুব অস্বস্তি বোধ করছে মনযুর বিন হানিফি।

‘জলদি যেতে হবে,’ বলেই নিজের উটে উঠল সে।

আস্তে করে মাথা দোলাল খালিফ। উটে চেপে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে বাগিয়ে ধরল একে-৪৭। আলতো খোঁচা দিল উটের পেটে।

পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল কাফেলা।

অতি ক্লান্ত উটের কারণে গন্তব্যের কাছে পৌঁছতে লাগল চার ঘণ্টা। আর সামান্য দূরেই মরুদ্যান। ওখানে অস্বাভাবিক কিছু দেখা গেল না। তাঁবুগুলোর সামনে জ্বলছে ছোট কয়েকটা আগুন। কোথাও লড়াইয়ের চিহ্ন নেই। ছিঁড়ে ফেলা হয়নি তাঁবু। জন্তুগুলো ঠিক জায়গায় রাখা। বালির উপর পড়ে নেই কারও লাশ।

সামনে না বেড়ে কাফেলা থামিয়ে উট থেকে নেমে পড়ল মনযুর বিন হানিফি। তার সঙ্গে পায়ে হেঁটে চলল খালিফ এবং দুই যুবক। সবাই প্রস্তুত রাইফেল হাতে।

চারপাশ সম্পূর্ণ নীরব নয়। ওরা শুনতে পেল আঙনে কাঠ পুড়বার ফুট-ফাট আওয়াজ। ওদের হেঁটে যাওয়ার সময় বালিতে শব্দ হচ্ছে খস-খস। কোথাও ডেকে উঠল একটা শেয়াল। ওটা আছে অনেক দূরে।

দাঁড়িয়ে গিয়ে শেয়ালের ডাক থামবার জন্য অপেক্ষা করল মনযুর বিন হানিফি। হাহাকার মিলিয়ে যাওয়ার পর শুনল মিষ্টি কচি কণ্ঠ। বেদুঈনদের জনপ্রিয় গান গাইছে। ওই আওয়াজ আসছে প্রধান তাঁবু থেকে।

মনযুর বিন হানিফির মন থেকে দূর হয়ে গেল সব দুশ্চিন্তা।

ওই কণ্ঠ তার ছোট ছেলে জায়েদের।

‘কাফেলা নিয়ে এসো,’ বলল মনযুর, ‘সব ঠিক আছে।’

কাফেলা আনতে ফিরে গেল খালিফ ও সঙ্গে দু’জন— রাত ঘনিয়ে আসার আগেই উটগুলোকে খাইয়ে, নিজেরাও বিশ্রাম নিতে যাবে।

প্রধান তাঁবুর দিকে পা বাড়াল মনযুর। বড় তাঁবুতে পৌঁছে ফ্ল্যাপ সরিয়েই জমে গেল বরফের মূর্তির মত।

তাঁবুর ভিতর অপেক্ষা করেছে ছেঁড়া, নোংরা পোশাক পরা এক দস্যু, মনযুরের ছোট ছেলের গলায় ধরেছে বাঁকা ছোরার তীক্ষ্ণধার ফলা। পাশেই বসে আছে আরেক দস্যু, হাতে পুরনো রাইফেল।

‘এক পা সামনে বাড়লে দু’ফাঁক করে দেব তোমার ছেলের গলা,’ হুমকি দিল ছোরা-ধরা দস্যু।

‘কে তুমি?’ জানতে চাইল মনযুর।

‘আমি মাজিদ,’ বলল দস্যু।

‘কী চাও?’

‘কী না চাই!’ কাঁধ ঝাঁকাল মাজিদ।

‘উটের দাম অনেক,’ ধীরে ধীরে বলল মনযুর, ‘আঁচ করছে এ জন্যই এখানে এসেছে এরা। সবই দেব, ছেড়ে দাও আমার

পরিবারকে।’

‘তোমার কথার কোনও অর্থ নেই,’ জবাবে বলল মাজিদ। রাগের ছাপ চেহারায়। ‘চাইলেই যা খুশি কেড়ে নিতে পারি। আর...’ বামহাতে শক্ত করে ছেলেটার ঘাড় ধরল সে, ‘এই ছেলে ছাড়া তোমার পরিবারের আর কেউ বেঁচে নেই।’

বুক আঁকড়ে এল মনযুর বিন হানিফির। বিরাট এক ধাক্কা খেয়েছে। জোব্বার পকেটে ওয়েবলি-ফসবেরি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। ওই অস্ত্র দিয়ে নিখুঁত লক্ষ্যে গুলি পাঠাতে পারে সে। ওটা মরুভূমির বালিতে একমাস পড়ে থাকলেও জ্যাম হয় না। কীভাবে ওটা বের করবে, তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে মনযুর।

‘সেক্ষেত্রে সবই তোমাদের দেব,’ বলল সে। ‘বদলে ক্ষতি কারো না আমার ছেলের। যা খুশি নিয়ে যেতে পারো, বাধা দেব না।’

‘এখানে সোনা লুকিয়ে রেখেছ তুমি,’ নিশ্চিত কণ্ঠে জানাল মাজিদ। ‘শুধু বলো কোথায় আছে সেগুলো!’

আস্তে করে মাথা নাড়ল মনযুর। ‘বিশ্বাস করো, আমার কাছে কোনও সোনা নেই।’

‘হারামজাদা মিথ্যা বলছে,’ বলল দ্বিতীয় দস্যু।

বিশী খ্যাক-খ্যাক শব্দে হাসতে শুরু করেছে মাজিদ। দেখা গেল বাঁকাচোরা, কালচে, নোংরা দাঁত। বামহাতে ছেলেটার ঘাড় ধরে রেখেছে সে, ডানহাতে ছোরা বসিয়ে দিতে চাইল কণ্ঠনালীর উপর। কিন্তু তখনই গা মুচড়ে ছুটে গেল ছেলেটা, জোরে কামড় বসিয়ে দিল মাজিদের আঙুলে।

ব্যথা পেয়ে গালি দিয়ে উঠল মাজিদ, ঝাট করে পিছিয়ে নিয়েছে বামহাত, যেন আগুন ধরে গেছে আঙুলে।

একই সময়ে জোব্বা থেকে পিস্তল বের করেই পর পর দু’বার গুলি করল মনযুর মাজিদের বুকে। কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে ধড়াস

করে মেঝেতে পড়ল মাজিদ, মারতে এসে মারা পড়েছে নিজেই।
বুকের দুই গর্তে ধোয়ার আভাস।

দ্রুত রাইফেল ঘুরিয়ে গুলি করল দ্বিতীয় দস্যু, ওই বুলেট
চিরে দিল মনযুরের উরুর বাইরের দিকটা। একই সঙ্গে গুলি
করেছে মনযুরও। টু শব্দ না করেই টলে পড়ল দস্যুর লাশ।

এইমাত্র বাইরে শুরু হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্রের হুঙ্কার।

বুম-বুম আওয়াজে খান-খান হলো সাঁঝের নীরবতা। তুমুল
গোলাগুলি চলছে দুই পক্ষের ভিতর। মনযুর শুনতে পেল ভারী
বোল্ট-অ্যাকশন রাইফেলের গর্জন। পাল্টা গুলি করছে খালিফ,
খ্যাট-খ্যাট আওয়াজ করছে তার অটোমেটিক রাইফেল।

খপ করে ছেলেকে কাছে টেনে এনে ওর হাতে পিস্তল ধরিয়ে
দিল মনযুর। মৃত দস্যুর পাশ থেকে তুলে নিল পুরনো রাইফেল,
মেঝে থেকে বাঁকা ছোরা। ছেলে জায়েদকে নিয়ে তাঁবুর পিছনে
সরে এল। নরম কণ্ঠে জানতে চাইল আর সবার খবর।

‘নেই... কেউ নেই, সবাইকে...’ ফুঁপিয়ে উঠে থেমে গেল
জায়েদ।

টাকার অভাব নেই বলে তিন ছেলেকেই ইংল্যান্ডের নাম করা
স্কুলে পড়াচ্ছিল মনযুর, এখন তার বড় দুই ছেলে মেঝেতে পড়ে
আছে আশপাশের কোনও তাঁবুতে। পোশাক ভিজে গেছে কালচে
রঙে। বুকে বুলেটের গর্ত।

বাইরে চলছে কঠিন লড়াই। তাঁবুর দেয়ালের পাশে থেমে
ছোরা দিয়ে মোটা কাপড় কাটতে শুরু করেছে মনযুর। ছোট গর্ত
তৈরি করে উঁকি দিল বাইরে।

মৃত উটের দেহের আড়াল নিয়ে পাল্টা গুলি করছে খালিফ
আর তার তিন সঙ্গী। তাঁবুর ভিতর যে দুই দস্যুকে শেষ করেছে
মনযুর, তাদের মতই নোংরা পোশাক পরা বাইরের ওই দস্যুরা;
এ মুহূর্তে আছে খেজুর গাছের আড়ালে, হাঁটু সমান গভীর বর্নার

পাশে ।

মনে হলো না বেশি লোক আছে দলে, থাকলে তাঁবুর ধারে-কাছে ভিড়তেই দিত না ওদের ।

জায়েদকে জিজ্ঞেস করল মনযুর, ‘এরা এখানে এল কী করে?’

‘আজ রাতের জন্যে আশ্রয় চেয়েছিল,’ বলল ছেলেটা ।
‘আমরা ওদের উটগুলোকে পানি দিয়েছি ।’

খুনি মাজিদ আর তার দলের ডাকাতরা বেদুঈনদের স্বাভাবিক আতিথেয়তা এবং মনযুরের ছেলেদের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে মেজবানদেরকেই খুন করেছে । মহিলারাও কেউ বেঁচে নেই । ছোট মেয়েটার নিষ্পাপ চেহারা কল্পনা করে রাগে-দুঃখে পাগল হওয়ার দশা হলো মনযুরের । তাঁবুর আরেক পাশে গেল সে, এবার ছোট কোনও গর্ত করতে গেল না, ছোঁরা দিয়ে উপর থেকে নীচে হ্যাঁচকা পৌঁচে কেটে ফেলল পুরু ক্যানভাস ।

‘তুমি এখানেই থাকো,’ ছেলেকে বলল গম্ভীর কণ্ঠে ।

তাঁবুর চেরা জায়গা দিয়ে বেরিয়ে এল মনযুর । আবছা আঁধারের সুযোগে মরুদ্যানে বড় অর্ধবৃত্ত তৈরি করে চলে গেল শত্রুদের পিছনে ।

খালিফ আর তার লোকদের ঠেকাতে ব্যস্ত ডাকাতরা । কেউ দেখল না পিছন থেকে হাজির হয়েছে যম । খুব কাছের রেঞ্জ থেকে লোকগুলোর পিঠে গুলি শুরু করল মনযুর ।

বেঘোরে মরল ডাকাতরা ।

ধূপ-ধাপ বার্নার পানিতে পড়ল তিন দস্যুর লাশ । পরক্ষণে চতুর্থজন । দৌড়ে পালাতে চাইল আরেকজন । সে মরল বুকে খালিফের গুলির আঘাতে । কিন্তু ঘুরেই মনযুরকে লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি করল ষষ্ঠ দস্যু ।

কাঁধে গুলি লাগতেই ছিটকে পিছিয়ে গেল মনযুর, ভয়ঙ্কর

ব্যথায় ঝটকা খেল শরীর। পা পিছলে পড়ে গেল ঝর্নার ভেতর।

ওর দিকে তেড়ে এল দস্যু। ভেবেছে শত্রু মৃত, বা এতই আহত যে লড়তে পারবে না।

পুরনো রাইফেল দস্যুর দিকে ঘুরিয়েই ট্রিগারে চাপ দিল মনযুর। কিন্তু বুলেট জ্যাম হয়েছে বিচে। হ্যাঁচকা টানে বোল্ট পিছিয়ে গুলিটা ফেলতে চাইল সে। চেম্বারে পাঠাবে নতুন বুলেট। কিন্তু জোর নেই আহত কাঁধে, আটকেই রইল বোল্ট।

নিজের অস্ত্র মনযুরের বুকে তাক করল দস্যু, আর তখনই কানের খুব কাছে বজ্রপাতের মত শব্দ হলো পিস্তলের।

কাত হয়ে খেজুর গাছে হেলান দিল দস্যু, দুই চোখে অবাক বিস্ময়। পিছলে পড়ে গেল বালিতে। হাত থেকে ঝর্নার মধ্যে পড়ল অস্ত্রটা।

পিছনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে কিশোর জায়েদ, থরথর করে কাঁপছে। চোখে রাজ্যের ভীতি।

আরও শত্রু আছে কি না বুঝতে চারপাশ দেখে নিল মনযুর। না, কেউ নেই। থেমে গেছে গোলাগুলি। নিজেদের দলের উদ্দেশে গলা উঁচু করে নির্দেশ দিচ্ছে খালিফ, ‘লড়াই শেষ, চলে এসো তোমরা।’

‘কাছে এসো, জায়েদ,’ শান্ত স্বরে ডাকল মনযুর।

ভীত পায়ে বাবার সামনে এসে দাঁড়াল জায়েদ, চোখে টলটলে অশ্রু।

‘আমার চোখে চোখ রাখো, জায়েদ,’ নরম কণ্ঠে বলল মনযুর।

চোখে চোখ রাখতে পারল না ছেলেটা।

‘চোখ রাখো চোখে, জায়েদ!’ কণ্ঠ কঠিন হলো মনযুরের। শক্ত হাতে ধরেছে ছেলের দুই কাঁধ। চোখে চোখ পড়তেই বলল, ‘জায়েদ, তুমি ছোট বলে অনেক কিছুই বুঝবে না। কিন্তু আজ মস্ত

কাজ করে ফেলেছ। তুমি রক্ষা করেছ তোমার বাবার প্রাণ। রক্ষা করেছ বাপ-দাদার এই মরুদ্যান।’

‘কিন্তু ভাই-বোন আর আম্মু যে মরে গেল?’ ফুঁপিয়ে উঠল জায়েদ।

‘না, জায়েদ,’ আস্তে করে মাথা নাড়ল মনযুর। ‘ওরা আছে আর কোথাও। একদিন ওদের সঙ্গে মোলাকাত হবে আমাদের।’

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে ছেলেটা।

ডানদিকে একটা আওয়াজ শুনল মনযুর।

হামাগুড়ি দিয়ে পালাতে চাইছে আহত এক দস্যু।

বাঁকা ছোরা হাতে তার পাশে পৌঁছে গেল মনযুর। লোকটার পিঠে ছোরা গাঁথে দিতে গিয়েও থমকে গেল। ঘুরে চাইল ছেলের চোখে। ‘জায়েদ, এসো! খুন করো একে!’

অবাক চোখে বাবাকে দেখল জায়েদ।

কঠোর চোখে তাকেই দেখছে বাবা। ‘এসো!’

এক পা সামনে বেড়েও থেমে গেল জায়েদ।

‘তোমার ভাইয়ারা মারা গেছে, জায়েদ,’ বলল মনযুর। ‘এখন বংশের বাতি বলতে রইলে শুধু তুমি। শক্ত হতে হবে তোমার, বদলা নিতে হবে তোমার ভাই-বোন আর মায়ের অকাল মৃত্যুর।’

মাথা নাড়তে গিয়েও থেমে গেল কিশোর ছেলেটা।

‘মেজবানী করতে গিয়ে প্রায় শেষ হয়ে গেছি আমরা,’ বলল মনযুর। ‘ওই ধরনের দুর্বলতা মানেই খুন হয়ে যাওয়া। মনে রেখো, তুমি আমার একমাত্র সন্তান। আর এই লোকগুলো আমাদের জন্মের শত্রু। আমাদের কাছ থেকে জোর করে কেড়ে নিতে চায় সবুজ মরুদ্যান। দুর্বলতা মানেই খুন হয়ে যাওয়া, আর এই পানি হারালে তুষার কষ্ট পেয়ে মরতে হবে আমাদেরকেই।’

মনযুর বুঝে গেছে, ছেলেটা মানবে ওর কথা।

নির্দেশ পালন না করে উপায়ও নেই তার।

তবুও নিজ পথ ওকে বেছে নেয়ার সুযোগ দিল মনযুর। নরম
সুরে জানতে চাইল, ‘তুমি কি ভীত, জায়েদ?’

আস্তে করে মাথা নাড়ল কিশোর।

‘তা হলে বাবার কথা মত কাজ করো।’

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করে পিস্তল তুলল জায়েদ।

হামাগুড়ি দেয়ার ফাঁকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল
দস্যু।

এখন আর হাত কাঁপছে না জায়েদের।

দুই হাতে শক্ত করে ধরেছে পিস্তল।

চলে গেল দস্যুর সামনে। লোকটার কপাল লক্ষ্য করে অস্ত্র
তুলেই টিপে দিল ট্রিগার।

বর্ণা পেরিয়ে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল গুলির আওয়াজ।

এখন আর জায়েদের মধ্যে সামান্যতম দুর্বলতা নেই।

তিন

ভারত মহাসাগরের সুনীল জলে ডুব দেয়ার আগে টলমল করছে
ফুটবল সদৃশ লাল সূর্যটা। কে জানে, হয়তো ঠিক করেছে মিটিয়ে
নেবে জেনুর তৃষ্ণা। মৃদু দুলতে দুলতে ঘণ্টায় তিন থেকে চার নট
গতি তুলে চলেছে নব্বুই ফুটি ক্যাটাম্যারান সেইল বোট,
মেরিগোল্ড। বইছে অলস ঝিরিঝিরি হাওয়া, ডেকের অনেক উপরে
ধীরভাবে নড়ছে ঝকঝকে সাদা, বিশাল পাল। বোটের একপাশে
বড় অক্ষরে ফিরোজা রঙে লেখা: দ্য ন্যাশনাল আগুরওঅটর অ্যাও

মেরিন এজেন্সি।

ক্যাটাম্যারানের দুই বো-র একটার ডগায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে হাওয়াইয়ান যুবক সুপুরুষ জ্যাকো কাপুল। বয়স পঁচিশ, একমাথা কুচকুচে কালো চুল এলোমেলো, চিতার মত ক্ষিপ্ত ভঙ্গি, দুই বাহু ও কাঁধ জুড়ে প্যাঁচানো নীল হাওয়াইয়ান টাট্ট। দেখে মনে হতে পারে, তিরিশ ফুটি ঢেউয়ের শিখরে উঠে পায়ের সামনের অংশে ভর করে সার্বর্বাঙ্গে চেপে ছুটে চলেছে।

একপাশ থেকে সাগরে বাড়িয়ে দিয়েছে দীর্ঘ দণ্ড, ওটার ডগায় প্রয়োজনীয় ইন্সট্রুমেন্ট। ছোট ডিসপ্লে স্ক্রিন দেখাচ্ছে ঠিকভাবেই কাজ করছে যন্ত্রটা।

গলা উঁচু করে রেযাল্ট জানাল জ্যাকো। ‘অক্সিজেন লেভেল সামান্য নিচু, তাপমাত্রা একুশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা সত্তর দশমিক চার ফারেনহাইট।’

ডেকে দাঁড়িয়ে ওকে দেখছে দু’জন। তাদের একজন টিম লিডার টিম জনসন। ক্রুদের মধ্যে সে-ই বেশি বয়স্ক, দাঁড়িয়ে আছে হেলমে। পরনে থাকি শর্টস্, কালো টি-শার্ট ও মাথায় জলপাই রঙা হ্যাট। পাশেই সুন্দরী টিনা অ্যালার্সবি। পরনে সাদা হাফপ্যান্ট ও লাল বিকিনি টপ। প্রায় উদোম বললেই চলে। চক-চক করছে রোদে পোড়া ব্রোঞ্জ রঙা ত্বক।

‘বহু দিনের ভেতর সবচেয়ে শীতল পরিবেশ,’ মন্তব্য করল টিম জনসন। ‘গত বছর এ সময়ে তাপমাত্রা ছিল কমপক্ষে তিন ডিগ্রি বেশি।’

‘গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে যারা ভাবে, তারা বলবে, এটা ওদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র,’ হাসল জ্যাকো কাপুল।

ছোট কমপিউটার ট্যাবলেটে তথ্য টুকে নিল টিনা। ‘এটা বোধহয় কোনও বিশেষ প্যাটার্ন। গত ত্রিশটা রিডিঙের চেয়ে কমপক্ষে দুই ডিগ্রি কম।’

‘হয়তো এদিক দিয়ে পেরিয়ে গেছে ঝড়,’ বলল জ্যাকো, ‘প্রচুর বৃষ্টি পড়লেও আমরা টের পাইনি।’

‘গত কয়েক সপ্তাহে তেমন কিছুই ঘটেনি,’ বলল জনসন। ‘এ তাপমাত্রা অস্বাভাবিক। স্থানীয় জলবায়ুর কারণে এমন হয়নি।’

সায় দিয়ে মাথা দোলাল টিনা। ‘গভীর সাগরে নামিয়ে দেয়া রিমোট সেন্সারও একই তথ্য দিচ্ছে। হঠাৎ করেই কমে গেছে সাগরের তাপ। যেন হঠাৎ কোনও কারণে রোদ দেয়া বন্ধ করেছে সূর্য।’

‘সূর্যের দোষ নেই,’ বলল জ্যাকো কাপুল। কয়েক ঘণ্টা আগেও তাপমাত্রা ছিল বেশ চড়া। আকাশে মেঘ নেই। আর এখনও সূর্যের শেষ রশ্মি যথেষ্ট গরম।

ইন্সট্রুমেন্ট রিল ঘুরিয়ে তুলে আনল জ্যাকো, তাপ দেখে নিয়ে মৎস্য-শিকারিদের মত থো করে অনেক দূরে ফেলল যন্ত্রটা। সেন্সার পড়েছে বোট থেকে চল্লিশ ফুট ফারাকে। টুপ করে তলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর এল দ্বিতীয় রিডিং। আগের মতই, যা ছিল তাই।

‘যাক, হেড-অফিসকে জানানোর মত কিছু পাওয়া গেল,’ বলল জনসন। ‘ওরা তো মনে করে আমরা প্রমোদতরী নিয়ে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছি।’

‘হয়তো এল নিনো বা লা নিনার মত কিছু ঘটছে সাগরে,’ বলল জ্যাকো। ‘যেহেতু ভারত মহাসাগর, ওরা এটার কোনও হিন্দু দেব বা দেবীর নাম দেবে।’

‘আমাদের নামও দিয়ে দিতে পারে,’ বলল টিনা, ‘অ্যালার্সবি-জনসন-কাপুল এফেক্ট। সংক্ষেপে এজেকে।’

‘ওস্তাদ, দেখেছেন, প্রথম সুযোগে নিজের নামটা আগে বসিয়ে নিয়েছে,’ জনসনের কাছে নালিশ করল জ্যাকো।

‘লেডিং ফাস্ট বলে কথা আছে না?’ হাসল টিনা অ্যালার্সবি।

মৃদু হেসে হ্যাট ঠিক করে নিল জনসন। ‘ঝগড়া শেষ করে চলে এসো। আমি কেবিনে গিয়ে দেখি কপালে কী আছে। আজও বোধহয় ফ্লাইং-ফিশ ট্যাকোস।’

সন্দেহ নিয়ে জনসনের দিকে চাইল টিনা। ‘গতকালও তো ওই মালই ছিল।’

‘বড়শিতে কিছুই ধরা পড়েনি,’ বলল জনসন। ‘কপাল মন্দ।’

কথাটা শুনে ভুরু কুঁচকাল জ্যাকো। ওরা সাগরের যত গভীরে যাচ্ছে, কমছে মাছের ঝাঁক। বিরান ও শীতল হয়ে উঠছে সাগর। বলল, ‘ক্যানের খাবারের চেয়ে ফ্লাইং-ফিশও ঢের ভাল।’

আস্তে করে মাথা দোলাল টিনা।

ডিনার তৈরি করতে কেবিনে গিয়ে ঢুকল জনসন।

বো-তে দাঁড়িয়ে পশ্চিম সাগরে চেয়ে রইল জ্যাকো কাপুল।

টুপ করে ডুব দিয়েছে সূর্য। আকাশ থেকে সোনালী আবির বিদায় নিয়ে সাগরের বুকে দেখা দিয়েছে কমলা আভা। মৃদু ও ভেজা হাওয়ার তাপমাত্রা নব্বুই ডিগ্রি ফারেনহাইট। চমৎকার সন্ধ্যা, আর আজ অদ্ভুত কিছু আবিষ্কার করেছে ওরা।

তাপমাত্রার সঙ্গে পাল্টে গেছে পরিবেশ। সরে গেছে মাছের ঝাঁক। বছরের এ সময়ে মৌসুমী হাওয়ায় ভর করে সাগর থেকে স্থলভূমির দিকে ছুটতে শুরু করে প্রচুর জলকণা, অথচ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারত উপমহাদেশে ভয়ঙ্করভাবে হ্রাস পেয়েছে বৃষ্টিপাত।

‘বৃষ্টির জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে দেড় শ’ কোটি মানুষ। ফসলের মাঠে বুনতে হবে ধান ও গম। জ্যাকো কাপুলের মনে পড়ল, পত্রিকায় লিখেছে: মারাত্মক খরার আশঙ্কায় ভীত ভারত উপমহাদেশের কৃষক। সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না এলে নিশ্চিতভাবেই দেখা দেবে চরম দুর্ভিক্ষ।

তেমন বিপর্যয় হলে ঠেকাতে পারবে না জ্যাকো কাপুল, কিন্তু অন্তর থেকে বুঝল, কী কারণে অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছে, তা বুঝবার

খুব কাছে পৌছে গেছে ওরা। গত কয়েক দিন ঠিক পথেই কাজ হয়েছে। একঘণ্টা পর এখান থেকে কয়েক মাইল পশ্চিমে সরে গিয়ে নতুন করে পরীক্ষা করবে রিডিং।

ভাবনা থেকে বাস্তবে ফিরল জ্যাকো।

দিনার তৈরি, কেবিন থেকে ডাকছে টিম জনসন।

রিল ঘুরিয়ে সেন্সার ফিরিয়ে নিল জ্যাকো। যন্ত্রটা পানি থেকে তুলবার মুহূর্তে চোখে পড়ল অদ্ভুত কিছু। চোখ সরু করে ওদিকে চাইল সে। জায়গাটা এক শ' গজ দূরে। সাগর-সমতলে ছড়িয়ে পড়ছে তেল বা ছায়ার মত কী যেন।

‘ওদিকটা দেখো,’ টিনাকে বলল জ্যাকো।

‘তুমি বোধহয় আমাকে কাছে টানতে চাইছ?’ হাসল টিনা।

‘না, ঠাট্টা না,’ বলল জ্যাকো। ‘ওখানে পানিতে কী যেন!’

কমপিউটার ট্যাবলেট নামিয়ে জ্যাকোর পাশে এসে সংকীর্ণ বো-তে দাঁড়াল মেয়েটা, একহাতে শক্ত করে ধরল যুবকের বাহু।

ছায়ার মত জিনিসটার দিকে আঙুল তাক করল জ্যাকো। ছড়িয়ে পড়ছে সাগরের চারপাশে। তেল বা অ্যালগির মত।

‘দেখতে পেয়েছ?’

জ্যাকোর দৃষ্টি অনুসরণ করে চাইল টিনা। চোখে তুলল বিনকিউলার। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘আলো-ছায়ার কারণে ভুল দেখেছ।’

‘না, আলোর কারণে নয়।’

আরও কিছুক্ষণ বিনকিউলার দিয়ে চেয়ে রইল টিনা। তারপর বিনকিউলার ধরিয়ে দিল জ্যাকোর হাতে। ‘নাহ, ওখানে কিছুই নেই।’

আবছা আলায় ওদিকে চেয়ে রইল জ্যাকো।

চোখের ভুল?

বিনকিউলার তুলে ভাল করে দেখল ওই এলাকা। কিছুক্ষণ

পর নামিয়ে ফেলল দূরবিন।

ওদিকের পানিতে কিছুই নেই— না তেল, না অ্যালগি।

সাগর-সমতলে কিছুই ভাসছে না।

ভুল জায়গার দিকে চেয়েছে কি না বুঝতে ডানে-বামে চোখ বোলাল। না, সাগর ঠিকই আছে। বলল, ‘বিশ্বাস করো আর না করো, কিছু দেখেছি।’

‘কাঁচা গুল মারছ,’ ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্যাটাম্যারানের ডেকের দিকে পা বাড়াল টিনা। ‘চলো, ডিনার রেডি।’

শেষবারের মত চারপাশ দেখল জ্যাকো, তারপর আনমনে মাথা নেড়ে মেয়েটার পিছু নিল।

কয়েক মিনিট পর মেইন কেবিনে ডিনারে বসল ওরা।

খাবার বলতে সেই ফিশ ট্যাকোস।

খাওয়ার ফাঁকে তাপমাত্রা হ্রাস নিয়ে আলাপ করছে ওরা।

ওদিকে উত্তর-পশ্চিমের মৃদু হাওয়া ঠেলে নিচ্ছে শান্ত সাগরে ফাইবারগ্লাস বোট। সামান্য আওয়াজও নেই হাইড্রোডাইন্যামিক শেপের কারণে।

কিছু ওদের অগোচরে পাল্টে যাচ্ছে সাগর।

আগের চেয়ে ভারী হয়ে উঠছে পানি। এখনকার ঢেউ বেশ বড়, নড়ছে ধীরভাবে। সাগরের কাছে কালচে হয়ে উঠছে ঝকঝক সাদা ফাইবারগ্লাসের পণ্টন, যেন রং মেখে দেয়া হয়েছে।

পরের কয়েক সেকেন্ডে বোটের খোল জুড়ে ছড়িয়ে গেল ঝাপসা কালো রং। মাধ্যাকর্ষণকে পান্ডা না দিয়ে উপরে উঠছে।

গ্র্যাফাইট বা কালচে বর্ণের কোনও কালি?

এ জিনিসের চরিত্র অনেকটা চোরাবালির মত।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই অদ্ভুত জিনিস উঠে এল ক্যাটাম্যারানের বো-তে। সরছে নানান দিকে। একটু আগে

ওখানেই ছিল জ্যাকো কাপুল। জায়গাটা ঢাকা পড়ল রঙের নীচে, ধূসর ছোপ চলেছে মেইন কেবিনের দিকে।

ওখানে শটওয়েভ রেডিয়োতে বাজছে ক্লাসিকাল মিউজিক। সুরেলা বাজনা শুনতে শুনতে পছন্দের মানুষগুলোর সঙ্গে বসে সুস্বাদু খাবার খেতে ভাল লাগছে জ্যাকো কাপুলের। চেপে ধরেছে ওরা দু'জন টিম লিডারকে, কিন্তু নিজের গোপন রেসিপি কিছুতেই বলছে না জনসন। তার আপত্তি শুনতে শুনতে হঠাৎ আরেক দিকে চোখ গেল জ্যাকোর।

কেবিনের চওড়া জানালার টিণ্টেড কাঁচটা ঢেকে দিচ্ছে কী যেন। তারা জ্বলা আকাশ আর দেখা যাচ্ছে না। উঁচু মাস্তুলের বাতিটাও অদৃশ্য হয়েছে। কাঁচ বেয়ে আরও ওপরে উঠছে কালচে রং। জোর হাওয়ায় যেভাবে সরে তুষার বা বালি, ওই ধূসর বর্ণের জিনিসটার চলন অনেকটা তেমনি।

‘আরে, ওখানে ওটা...’

জানালার দিকে চাইল টিনা অ্যালাসবি।

পিছনের ডেকে চোখ যেতেই চমকে উঠল জনসন।

ঝট করে ঘাড় ফেরাল জ্যাকো কাপুল। কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকছে কালো জিনিসটা। সাগর থেকে বোটের ডেকে উঠে আসছে অনায়াস স্রোতের মত।

টিনাও দেখেছে। ওটা আসছে ওর দিকেই।

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সে।

হাতের ধাক্কা খেয়ে টেবিল থেকে অগ্রসরমাণ স্রোতের সামনে পড়ল বাসন। ওখানে পৌঁছে দেখতে না দেখতে খাবারগুলো ডেকে ফেলল ধূসর কালি। এখন দেখাচ্ছে স্তূপের মত।

‘জিনিসটা কী?’ অবাক হয়ে প্রশ্ন করল টিনা।

‘জানি না,’ মাথা নাড়ল জ্যাকো, ‘আগে কখনও...’

কথা শেষ না করেই চেয়ে রইল জিনিসটার দিকে। মনে হচ্ছে

কোনও ধাতব গুঁড়ো। সামনে বাড়ছে ঢেউ বা হাওয়ায় ওড়া মিহি বালির মত।

‘তখন সাগরে এটাই দেখেছিলাম,’ বলল জ্যাকো। পিছাতে শুরু করেছে। ‘আগেই বলেছি ওখানে কিছু আছে।’

‘কী করছে ওরা? খাচ্ছে খাবারগুলো?’

চেয়ার ছেড়ে পিছাতে শুরু করেছে ওরা।

‘মনে হচ্ছে সত্যিই ভাজা মাছ খাচ্ছে,’ বলল জনসন।

ভয়-বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইল জ্যাকো। দরজা দিয়ে বাইরে চোখ গেল। পিছনের ডেক ঢাকা পড়েছে ধূসর গুঁড়োর নীচে।

বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজতে গিয়ে চারপাশে চাইল সে। সামনে গেলে নামতে হবে ক্যাটাম্যারানের বার্থে। তার মানেই আটকা পড়বে ওরা ওখানে। পিছনের ডেকে যেতে চাইলে পা ফেলতে হবে ওই অদ্ভুত গুঁড়োর উপর।

‘আসুন,’ বলেই টেবিলে উঠে পড়ল জ্যাকো। ‘জিনিসগুলো যা-ই হোক, স্পর্শ করা ঠিক হবে না।’

পাশে মেয়েটা উঠে আসতেই স্কাইলাইটের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল জ্যাকো। টান দিয়ে খুলে ফেলল ওটা। দু’হাতে টিনার সরু কোমর ধরে উপরে ঠেলে দিতেই জানালার মত জায়গাটা দিয়ে বেরিয়ে কেবিনের ছাতে পৌঁছে গেল মেয়েটা।

এবার লাফিয়ে টেবিলে উঠতে গিয়ে পা পিছলে মেঝেতে পড়ল জনসন। প্যাচপেচে কাদার মত ছিটকে উঠল ধূসর গুঁড়ো। কিছু লাগল হাঁটু আর গোড়ালিতে।

‘উহ্!’ বলে কাতরে উঠল জনসন। যেন শরীরে বিঁধেছে ভিমরুলের হল। উবু হয়ে পা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল গুঁড়ো। পরক্ষণে ব্যস্ত হয়ে হাফপ্যান্টে ঝাড়ল দু’হাত। ‘হাত-পা আগুনের মত জ্বলছে!’ ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল তার চেহারা।

‘উঠে আসুন,’ তাড়া দিল জ্যাকো।

ধড়মড় করে আবারও টেবিলে উঠল জনসন, এখনও হাত-পায়ে মেখে আছে ধূসর কণা। কিন্তু দু'জনের ভারী ওজনে মড়াং করে ভেঙে গেল টেবিলের একটা পায়া।

খপ্ করে স্কাইলাইটের কিনারা ধরে ফেলেছে জ্যাকো, বুলে আছে বানরের মত। কিন্তু ভাঙা টেবিল পাশে নিয়ে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ল জনসন। ঠাস্ করে ঠুকে গেল মাথা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান হারাল সে, চেতনা ফিরতেই গড়িয়ে উঠে বসতে চাইল। চিৎকার ছাড়ল ভীষণ যন্ত্রণায়। ডেকে দু'হাত রেখে উঠতে গেল। কিন্তু রাঙ্কুসে মাংসাশী পিপড়ার মত ছেকে ধরেছে তাকে ধূসর গুঁড়ো। ঢেকে ফেলছে হাত-বাহু-পিঠ-পা! টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল জনসন, ঠেস দিল বালকহেডে, কিন্তু মুখে অজস্র ধূসর কণা! থাবা দিয়ে সরাতে চাইল। যেন ঘিরে ফেলেছে এক ঝাঁক মৌমাছি, আর নিজেকে বাঁচাতে লড়ছে সে। শক্ত করে বুজল দু'চোখ। কিন্তু বোজা পাতার ভিতর ঢুকে পড়ল কিছু কণা। নাক আর কানেও। ঝটকা দিয়ে বালকহেড থেকে সরল সে, বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। শুরু করেছে করুণ বিলাপ। কান থেকে ঝাড়তে চাইল কণা। ঠোঁটে চেপে বসল এক দঙ্গল। ঢুকে গেল গলা দিয়ে। জনসনের আঁত চিৎকার অল্পক্ষণেই ক্ষীণ হয়ে রইল শুধু বীভৎস, ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। যেন তাকে গলা টিপে খুন করছে কেউ। ধুপ্ করে উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ল সে। চোখের পলকে তাকে সম্পূর্ণ ঢেকে ফেলল ধূসর কণা। খেয়ে ফেলা হচ্ছে জীবন্ত!

‘জ্যাকো!’ উপর থেকে ডাকল আতঙ্কিত টিনা।

ওই ডাকে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন থেকে জেগে উঠল জ্যাকো, উপরের ফাঁকা জায়গা দিয়ে উঠে এল ছাতে। ঝপ্ করে বন্ধ করল স্কাইলাইট। মাস্তুলের উপরের আলোয় দেখল, অসংখ্য কণা ছেয়ে ফেলেছে গোটা ডেক। সাগর থেকে উঠছে আরও। কোথাও যাওয়ার নেই ওদের। এমন কী কেবিনের দেয়াল বেয়েও উঠছে

লক্ষ লক্ষ ধূসর কণা ।

দিনারের অবশিষ্ট খাবার আর বেচারী জনসনকে সাবাড় করে দিয়ে এবার ওদের দিকে আসছে নিশ্চিত মৃত্যুর মত!

‘ওদিক দিয়েও উঠছে,’ বেসুরো কণ্ঠে বলে উঠল টিনা ।

‘ভুলেও ছুঁতে যেয়ো না!’

জ্যাকোর দিকের দেয়াল বেয়ে কম উঠেছে গুঁড়ো । কাজে আসবে এমন কিছু খুঁজতে চারপাশে চাইল সে । পায়ের কাছেই ডেক ভেজাবার হোস । ওটা তুলে নিল । সুইচ অন করতেই নয়ল দিয়ে ছটকে বেরোল পানি ।

প্রবল পানির ধারা পিছিয়ে দিল কার্পেটের মত ধূসর কণা । কেবিনের দেয়াল থেকে ঝরে পড়ছে সব ধাতব কাদার মত ।

‘এদিকে!’

টিনার পাশে পৌঁছে নয়ল চালু করল জ্যাকো । জরুরি সুরে বলল, ‘আমার পিছনে থাকো!’ নানান দিকে তাক করছে হোস, পানির ধারার তোড়ে ভেসে যাচ্ছে ধূসর কণা ।

তবে মনে হলো, শেষপর্যন্ত এ যুদ্ধে হারবে প্রেশারাইড পানিই । খুনিগুলো চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলছে জ্যাকো ও টিনাকে । বেশিক্ষণ ঠেকানো যাবে না ।

‘আমাদের বোধহয় লাফিয়ে সাগরে নেমে যাওয়াই উচিত!’ কাঁপা কণ্ঠে বলল টিনা ।

সাগরে চোখ গেল জ্যাকোর । বোটের চারপাশ ভরে গেছে ওই ধূসর জিনিসে ।

‘না, উচিত হবে না,’ জবাবে বলল জ্যাকো । কাজে আসবে এমন কিছু পেতে ডেকে চোখ বোলাল । বোটের পিছনে দেখা গেল অকটেনের দুটো পাঁচ গ্যালনী জেরিক্যান । পুরো প্রেশার খুলে ডেকে হোস তাক করল জ্যাকো ছটকে দিচ্ছে ধূসর কণা । মাঝ দিয়ে তৈরি করে নেবে পথ ।

কয়েক সেকেণ্ড পর হোস ফেলে কেবিনের ছাত থেকে লম্বা লাফে নামল ভেজা ডেকে। পা পিছলে পৌছে গেল পিছনের ট্রানসমে। ততক্ষণে ভীষণ জ্বলতে শুরু করেছে হাত-পা। কাটা ঘায়ে অ্যালকোহল ঢাললে এমন জ্বলুনি হয়। বুঝে গেল জ্যাকো, ওকে পেয়ে গেছে মরণ-কণা। ভীষণ যন্ত্রণা পাত্তা না দিয়ে খুলে ফেলল প্রথম জেরিক্যানের মুখ, গল-গল করে ডেকে ঢালছে অকটেন।

কটু-গন্ধী ধারার সামনে থেমে গেল গালিচার মত বিছিয়ে থাকা ধূসর কণা। মনে হলো পালাতে শুরু করেছে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও এগোতে চাইল অন্য পথে।

কেবিনের ছাতে হোস হাতে একা লড়ছে টিনা অ্যালার্সবি। পানির স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্ছে ঝাঁক-ঝাঁক কণা। কিন্তু ক্রমেই চারপাশ থেকে ঘিরে ধরছে ওগুলো। ছোট হয়ে আসছে বৃত্ত। হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সুন্দরী মেয়েটা। হাত থেকে ফেলে দিয়েছে হোস। দিশেহারা হয়ে উঠতে শুরু করেছে মাস্তুল বেয়ে। দূর থেকে জ্যাকো দেখল, এক দঙ্গল কণা ঢেকে ফেলেছে টিনার সুডৌল, ফর্সা পা।

তীক্ষ্ণ, করুণ চিৎকার ছাড়ল টিনা, মাস্তুলের দণ্ড ছেড়ে ধুপ করে পড়ল নীচের ডেকে। ছটফট করছে অসহ্য জ্বলুনিতে।

‘বাঁচাও, জ্যাকো! উহ্! আ... মাকে বাঁচাও...’

ডেকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে অকটেন ফেলছে জ্যাকো। প্রথম ক্যান ফুরিয়ে যেতেই ওটা সাগরে ফেলে দিয়ে খপ করে তুলে নিল দ্বিতীয়টা। কিন্তু ওটা অনেক হালকা, প্রায় খালি!

ওর বুকে বিঁধল ভয়ের বর্ষা। ঘুরে চাইল টিনার দিকে।

মেয়েটা যেখানে পড়েছে, ওখান থেকে আসছে বিদঘুটে ঘড়-ঘড়ে আওয়াজ। শুধু একটা হাত দেখা যাচ্ছে। অন্য সবই চাপা পড়েছে ধূসর কণার নীচে। এখনও নড়ছে হাতটা, যেখানে থাকার

কথা দেহ, ওখানে মুচড়ে উঠছে কী যেন।

জ্যাকোর নিজের সামনে আবারও দল বেঁধেছে ধূসর কণা।
খুঁজে নিতে চাইছে শুকনো পথ।

সাগরে চোখ বোলাল জ্যাকো।

যত দূর চোখ গেল, তরল ধাতুর মত ভাসছে জিনিসগুলো।
পানি ঢাকা পড়েছে ধূসর চাদরে।

এই প্রথমবারের মত কঠিন বাস্তবতা উপলব্ধি করল জ্যাকো।

না, সত্যিই, বাঁচবার উপায় নেই ওর!

টিনা আর জনসনের মত ভয়ঙ্কর কষ্ট পেয়ে মরতে চায় না ও।

রুঢ় বাস্তব মেনে নিয়েই কঠিন সিদ্ধান্ত নিল।

শেষ কয়েক লিটার অকটেন ঢালল ডেকে।

আবারও পিছিয়ে গেল ধূসর কণা।

অভিমান আর রাগ নিয়ে খালি ক্যান সাগরে ছুঁড়ে ফেলল
জ্যাকো। দেরি না করে প্যান্ট থেকে লাইটার নিয়ে হাঁটু গেড়ে
বসল। এক মুহূর্ত চুপ করে সামলে নিল নিজেকে, তারপর
অকটেনে ভেজা ডেকের খুব কাছে লাইটার ধরে জ্বালল আগুন।

দপ্ করে জ্বলে উঠল নীল শিখা। জোরালো হুইশ্ আওয়াজ
ছেড়ে বোটের পিছন থেকে শুরু করে বো পর্যন্ত বয়ে গেল
আগুনের তীব্র হলকা। সরে যেতে চাইল আক্রমণাত্মক ধূসর
কণা। আগুনে ঝলসে যেতে শুরু করেছে সবই। জ্বলন্ত জ্যাকোকে
ঘিরে নাচছে লেলিহান শিখা।

শেষ কয়েক সেকেণ্ড জ্যাকো সইল নরক-যন্ত্রণা।

অকটেনের আগুনে পুড়ল ফুসফুস। তাই কষ্ট চিরে বেরোল না
আর্তনাদ। টলমল করে পিছাতে গিয়ে রেলিং টপকে ধড়াস্ করে
পড়ল অপেক্ষারত নির্ধূর সাগরে।

চার

‘এত দূরে এসেও শান্তি নেই— বুঝলি? হুকুম দিয়েছে, প্রতিদিন যোগাযোগ করতে হবে। আর ফোন করলেই নিয়মিত গালমন্দ করছে বুড়ো!’ উদাস হয়ে গেল বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অমূল্য রত্ন, সুযোগ্য চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, মাসুদ রানার অন্তরঙ্গ বন্ধু সোহেল আহমেদ। দীর্ঘ চুমুক দিল কার্লসবার্গ বিয়ারে। সন্ধ্যার পর থেকে এটা চলছে ওর সপ্তম ক্যান। ‘আমি ভেগে গেলেই ঠিক তোকে ধরবে বুড়ো। তখন হাড়ে হাড়ে টের পাবি কত ধানে কত...’

চাঁদের রূপালী আলোয় ছাব্বিশটি অ্যাটলের দেশ মালদ্বীপের প্রধান দ্বীপ মালের ধূসর সৈকতে ওর পাশেই বসে বন্ধুর ভ্রাজর ভ্রাজর শুনছে বিসিআই-এর প্রথম সারির এজেন্ট মাসুদ রানা, হাতে মাথা-কাটা মস্ত এক ডাব, পাইপ দিয়ে চোঁ-চোঁ টানছে মিষ্টি পানি। ওর স্যাটালাইট মোবাইল ফোন বেজে উঠতেই থেমে গেল সোহেল। কুঁচকে উঠেছে ভুরু। ‘নে, বুড়ো বোধায় এবার দেশে ফিরতে বলবে।’

ক’দিন আগে ভয়ঙ্কর এক গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করার পর রানাকে ছুটি দিয়েছেন বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। আর ছুটি পাওনা আছে, তার চেয়েও বড় কথা, রানার সঙ্গ পাওয়ার লোভে এ দেশে বেড়াতে এসেছে সোহেল।

বালির খোঁড়লে ডাব পুঁতে রেখে মোবাইল স্ক্রিন দেখে নিয়ে চট করে সোজা হয়ে বসল রানা। 'তোর মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, প্রিয় শ্যালক! সত্যিই বুড়ো!' ও ভাল করেই জানে, মুখে যা খুশি বলুক সোহেল, আর কয়েকটা দিন শুয়ে-বসে কাটাতে হলে মহাবিরক্ত হয়ে উঠবে বিসিআই চিফের উপযুক্ত স্যাঙাৎ।

কল রিসিভ করল রানা, 'জী, স্যর।'

ওদিক থেকে এল মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কাশির খুক-খুক আওয়াজ। সোহেলও যাতে কথাবার্তা সব শুনতে পায় সেজন্যে স্পিকার অন করল রানা সেটের।

'হ্যাঁ, রানা। কেমন আছ তোমরা?'

'ভাল, স্যর। আপনি ভাল আছেন?'

'চলছে। আবারও মৃদু কেশে নিলেন রাহাত খান। 'জরুরি একটা ব্যাপারে ফোন করেছি, রানা। অবশ্য, বিষয়টা এখনও বাংলাদেশ সংশ্লিষ্ট কি না শিওর নই,' চুপ হয়ে গেলেন।

হুৎপিণ্ডে উষ্ম রক্ত ছলাৎ করে উঠেছে রানার, খুব জরুরি আর বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্ট না হলে ফোন করতেন না চিফ। বিপদ-রোমাঞ্চ-শিহরনের লোভে অগ্রাহ নিয়ে অপেক্ষা করল ও।

'তুমি তো চিনতে জ্যাকো কাপুলকে?'

'জী, স্যর। নুমার সঙ্গে আছে।' চিফের কথার সুরে টের পেয়ে গেল রানা, তার খারাপ কিছু হয়েছে।

'জর্জ হ্যামিলটনের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে কাজ করছিল ভারত মহাসাগরে, বললেন চিফ। 'মনে হচ্ছে, বিষয়টা গত দু'বছর শুধু আমাদের দেশ নয়, গোটা উপমহাদেশে বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ার সঙ্গে জড়িত।'

'তবে যে এফুনি তুই বললি বিষয়টা আমাদের দেশ-সংশ্লিষ্ট না-ও হতে পারে?' কড়া ধমক দিল রানা মনে মনে। চুপ করে আছে।

‘হ্যাঁ, জ্যাকো কাপুলের সঙ্গে টিম জনসন আর টিনা অ্যালার্সবি নামের দু’জন ছিল। তুমি ওদেরকে চেনো।’

‘জী, স্যর।’

‘জর্জ আমাকে জানিয়েছে, যেখানে থাকার কথা, সেখান থেকে পঞ্চাশ নটিকাল মাইল দূরে পাওয়া গেছে ওদের ক্যাটাম্যারান। মালদ্বীপ থেকে রওনা হওয়া এক বিমান থেকে সাগরে ওটাকে দেখা গেছে গতকাল দুপুরে। ছবিও তুলেছে। আগুনে পুড়ে গেছে গোটা বোট। ক্রুদের কেউ নেই।’

‘ওখানে কী করছিল ওরা, স্যর?’

‘পানির তাপ, স্যালিনিটি আর অক্সিজেন লেভেল অ্যানালাইজ করছিল। জর্জের ধারণা: ওখানে খারাপ কিছু হয়েছে ওদের। লাইফবোট সঙ্গেই ছিল, সেটাও পুড়ে গেছে। শুনলাম, মার্চেন্ট মেরিনে দশ বছর ছিল টিম জনসন, তারপর যোগ দেয় নুমায়। জ্যাকো আর টিনা কমবয়সী তরুণ-তরুণী, কিন্তু সঠিকভাবেই ট্রেনিং দেয়া হয়েছিল। তিনজন প্রশিক্ষিত নাবিক আগুন লাগার পরেও কেন লাইফবোট সাগরে নামাতে পারল না, সেটা সত্যিই অস্বাভাবিক। তা ছাড়া, তারা ডিসট্রেস কলও পাঠায়নি।’

ভাবছে রানা: যোগাযোগ করেনি কারও সঙ্গে। এমন কিছু ঘটেছিল, যেটা ছিল কল্পনার অতীত।

‘মূল কথা হচ্ছে, ওরা হঠাৎ হারিয়ে গেছে,’ বললেন চিফ। ‘আর আমাদের কাছে সাহায্য চাইছে জর্জ। আমার কাছ থেকে শুনেছে, তোমরা আছ মালদ্বীপে, ছুটিতে।’

‘আমাদেরকে কী করতে হবে, স্যর?’

‘ওখানেই কাজ করছে মালদ্বীপ নেভির স্যালভিজ টিম। বাংলাদেশের বৃষ্টিপাত হ্রাসের সঙ্গে নুমার ওই রিসার্চের সম্পর্ক থাকতে পারে, কাজেই চোখ-কান খোলা রাখবে।’

‘স্যর, সাগরে ওদের জন্যে সার্চ করছে কেউ?’

‘হ্যাঁ। ওই বোট পাওয়ার পর মালদ্বীপ নেভির দুটো পি-৩ সার্চ-অ্যাণ্ড-রেসকিউ এয়ারক্রাফট ঘুরছে ওই এলাকায়। এ ছাড়া, দিল্লির হুকুমে দক্ষিণ-ভারত থেকে পাঠানো হয়েছে এক স্কোয়াড্রন লং-রেঞ্জ বিমান।’

‘তার মানে, স্যর, আমাদের কাজ রেসকিউ মিশনের নয়?’

‘না। তোমরা খুঁজে বের করবে সত্যিই কী করছিল ওরা। আর কেনই বা গায়েব হয়ে গেল তিন-তিনজন বিজ্ঞানী। ধারণা করছি, এসবের ভেতর লুকিয়ে আছে জটিল কোনও রহস্য।’ চুপ হয়ে গেলেন চিফ।

অপেক্ষা করছে রানাও।

কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন রাহাত খান, ‘ঠিক আছে, সোহেল আর তোমার ছুটি আরও পনেরো দিন বাড়িয়ে দেয়া হলো।’

কট্ শব্দে কেটে গেল কল।

‘ছুটি দিয়ে আবার কাজও করিয়ে নেবে,’ মুচকি হাসল রানা।

‘তা হলেই বোঝ?’ চান্সা হয়ে উঠেছে সোহেল। ‘কাল থেকে ফিল্ডে, ঠিক কি না, দোস্ত?’

‘হঁ।’ ডাব হাতে উঠে দাঁড়াল রানা। ওটা ট্র্যাশ ক্যানে ফেলে আড়মোড়া ভেঙে রওনা হয়ে গেল একটু দূরের হোটেলের দিকে।

‘আরে দাঁড়া, শালা!’ ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুর পিছু নিল সোহেল। ‘অত তাড়া কীসের? রাত তো মাত্র শুরু!’

পাঁচ

মধ্য ইয়েমেনের ভয়ঙ্কর রুক্ষ, বিরান মরুভূমির পাথুরে এক অংশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, পরনে সাদা জোব্বা। চোখে বিনকিউলার, কী যেন দেখছে দূরে। তার পোশাকে টান দিচ্ছে জোরালো হাওয়া, কাপড়ে কাপড়ে বাড়ি লেগে আওয়াজ উঠছে: ‘পত্! পত্!’

পিছনে বালির বাঁধের উঁচু জায়গার ওপাশে নেমেছে ঝকঝকে সাদা এক হেলিকপ্টার। গায়ের গোল ইনসিগনিয়ায় সবুজ রঙে আঁকা দুটো খেজুর গাছ ছায়া দিচ্ছে মরুদ্যানকে। নীচে আরবিতে লেখা: ‘মিয়াহা আনবা’। হেলিকপ্টার থেকে সামান্য দূরে একটা গুহার চওড়া প্রবেশ পথ।

সাধারণত ওই গুহার মুখ পাহারা দেয় তিন থেকে চারজন বেদুঈন, কিন্তু আজ অটোমেটিক রাইফেল হাতে তৈরি কমপক্ষে বারোজন। দলের অন্তত আরও বিশজন লুকিয়ে আছে চারপাশে।

দূরে চেয়ে আছে জায়েদ বিন মনযুর। মরুভূমির উঁচু-নিচু টিবি পেরিয়ে এদিকে আসছে তিনটে হামভি। একবার উঠছে টিবির চূড়ায়, আবার হারিয়ে যাচ্ছে খোঁড়লের ভিতর। যেন উন্মত্ত সাগরের বিশাল ঢেউয়ের মাঝ দিয়ে তীরের ফলার মত ফর্মেশন তৈরি করে ছুটছে তিন জিপ।

‘প্রাচীন পথে আসছে,’ একটু পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটাকে বলল জায়েদ বিন মনযুর। ‘আমার বাবার সময়ে ওই পথে আসত

মসলার কাফেলা । আজ আসে শুধু ব্যাংকাররা ।’

চোখ থেকে বিনকিউলার নামিয়ে মুখে দাড়ি ভরা বয়স্ক লোকটাকে দেখল সে । খালিফ বিন আদনান, তার বাবার সবচেয়ে বিশ্বস্ত কর্মী । পরনে খয়েরী জোব্বা, হাতে রেডিয়ো ।

‘আপনি ভাল করেই জানেন ওরা কী চায়,’ বলল বৃদ্ধ । ছোটবেলায় জায়েদকে তুমি করেই বলত, কিন্তু এখন আপনি বলে সম্বোধন করে । ‘আমাদের ব্যাপারে সামান্যতম ভাবনা নেই তাদের । বুঝবেই না এখানে আমরা কত বড় প্রজেক্ট নিয়ে কী কঠোর সংগ্রাম করছি । ওরা এখানে আসছে, কারণ আপনি কথা দিয়েছেন ওদের আরও বড়লোক করে দেবেন । কিন্তু তার আগে সবই গুছিয়ে নিতে হবে ।’

‘ওদের সঙ্গে সেরেংগেরেল আছে?’

আস্তে করে মাথা দোলাল খালিফ । ‘আছে । সে পৌছে গেলে একত্র হবে কনসোর্টিয়ামের সদস্যরা । আমাদের উচিত হবে না বেশি দেরি করা ।’

‘আর মিশরের জেনারেল নাকিস?’ জানতে চাইল জায়েদ । ‘এখনও গৌ ছাড়েনি? ও কিন্তু কথা দিয়েছিল ঠিকই ফাও দেবে ।’

‘বলেছে, তিন দিন পর যোগাযোগ করবে,’ বলল খালিফ । ‘তার আগ পর্যন্ত কিছুই নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না ।’

মরুভূমির শুষ্ক বাতাসে বড় করে দম নিল জায়েদ বিন মনযুর ।

মিশরীয় ব্যবসায়ী সংগঠন আর ইজিপশিয়ান আর্মির তরফ থেকে জায়েদের কনসোর্টিয়ামকে দুই শ’ মিলিয়ন ডলার দেবে বলে কথা দিয়েছিল জেনারেল নাকিস আবিল-বিল । কিন্তু এখন পর্যন্ত ঢিলিমিলি করে সময় পার করছে, দেয়নি ফুটো পয়সাও ।

‘নাকিস আমাদের খেলাতে চাইছে,’ বলল জায়েদ ।

‘যুক্তি দিয়ে লাইনে আনতে হবে, তাতে সময় লাগবে,’ বলল

খালিফ।

‘না, কোনও কথাই পাস্তা দেবে না,’ বলল জায়েদ। ‘ভাল অবস্থানে আছে। অন্তত তা-ই ভাবছে। তার ধারণা: আমাদের নাগালের বাইরে আছে সে। কিছুই করতে পারব না আমরা।’

কৌতূহল নিয়ে জায়েদকে দেখল খালিফ, কিছু বলল না।

‘জীবনের জটিল রহস্য এমনই,’ আবার বলল জায়েদ, ‘টাকা-পয়সা, সহায়-সম্পত্তি, যে-কোনও লোকের দেয়া আশা-ভরসা, এমন কী ভালবাসাও কিছুই নয়। সেদিন যখন সেই দস্যুরা মরুদ্যানের এসে সব দখল করে নিতে যাচ্ছিল, ওসব আমাকে রক্ষা করতে পারেনি। খালিফ, আসল জিনিস: ক্ষমতা। সেটা হতে হবে ভয়ঙ্কর এবং চরম। ওটা যার আছে, তার কথায় চলবে দুনিয়া। যার নেই, ফকিরের মত ধুঁকে ধুঁকে মরবে। জেনারেল নাফিস চাইছে যেন ভিক্ষুকের মত তার কাছে হাত পাতি। কাজেই চরম শাস্তি পেতে হবে তাকে। কিছুদিনের ভেতর আমি এমন এক ক্ষমতার মালিক হতে চলেছি, যেটা আগে কখনও কোনও মানুষের ছিল না। দেবতারও না।’

আস্তে করে মাথা দোলাল খালিফ, হাসতেই ভাঁজ পড়ল গালে। ‘অক্সফোর্ডের কলেজ থেকে অনেক কিছু শিখেছেন আপনি, জায়েদ। এমন কী আমিও ভাবতে পারিনি এত জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। আপনার শিক্ষকদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন।’

নীচে গুহার সামনে এসে গতি কমিয়ে থেমেছে হামভিগুলো।

‘গুরুর দিকে তুমিই কিন্তু ছিলে আমার প্রথম শিক্ষক,’ বলল জায়েদ। ‘তোমার হাতেই তুলে দিয়েছিলেন বাবা আমাকে। তুমি দায়িত্ব পালনে একটুও গাফিলতি করেনি।’

মৃদু কুর্নিশ করল খালিফ। ‘মিষ্টি কথা বললেন, তাই বুকটা ভরে গেল। এবার চলুন, অতিথিদের সঙ্গে দেখা করি।’

কয়েক মিনিট পর গুহার ভিতর উপস্থিত হলো তারা দু’জন,

নেমে এল চতুর্থতলায়। এয়ারকন্ডিশন মেশিনের শীতল হাওয়ায় জুড়িয়ে গেল দেহ। তাপমাত্রা এখানে একাশি ডিগ্রি, মরুভূমিতে বইছে এক শ' দশ ডিগ্রির লু হাওয়া।

বাইরে থেকে পাথরের গুহাটাকে মনে হতে পারে আদিম কালের, কিন্তু ভেতরে কালো কনফারেন্স টেবিল ঘিরে আরামদায়ক চেয়ারে বসেছে অতিথিরা। ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে পাল্টে ফেলা হয়েছে গুহার এ অংশ। মেঝে বা দেয়াল এখানে এবড়োখেবড়ো নয়, প্রকাণ্ড এক আধুনিক হল ঘরের মত এই অফিস। এখানে আছে সভ্য জগতের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা।

টেবিলে সবার সামনে একটা করে ছোট ফ্ল্যাট-স্ক্রিন মনিটর। পাশেই অত্যাধুনিক কমপিউটার। দেয়ালের ওপাশে গোপন কক্ষ। ওখানে রয়েছে স্লিপিং কোয়ার্টার ও র‍্যাক ভরা আধুনিক সব অস্ত্র।

আগে এই গুহা ছিল ধূলিময়, এসে জমায়েত হতো নানা এলাকার বেদুঈনরা। কিন্তু লাখ লাখ ডলার ব্যয় করে পাহাড়ের বুকে সামান্য এই ফাটলকে সত্যিকারের মডার্ন হেডকোয়ার্টারে রূপান্তরিত করেছে জায়েদ। সময় লেগেছে তাতে অনেক। ফলাফল অবিশ্বাস্য! নিজে জায়েদও দুনিয়ার পথে হেঁটেছে অনেক। ওর বংশের সবাই ছিল যাযাবর, ব্যবসা বলতে ছিল উট আর জিনিসপত্রের লেনদেন। কিন্তু সেসব বাদ দিয়ে তিলতিল করে গড়ে তুলেছে জায়েদ নানান ধরনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। সেগুলোর ভিতর আছে টেকনোলজি, তেল কূপ, শিপিং লাইন ইত্যাদি।

শত শত বছরের উট-ব্যবসা আর সবুজ মরুদ্যান বহু আগেই ত্যাগ করেছে জায়েদ বিন মনযুর, টাকা লগ্নি করেছে লাভজনক মস্ত সব আন্তর্জাতিক কোম্পানিতে। সামান্যতম ছাড় দেয়নি কাউকে। মগজে গুন-গুন করেছে বাবার কথা: মানুষ অন্যের সহায়-সম্পদ কেড়ে নিতে চায়। দুর্বলতা মানেই খুন হয়ে যাওয়া,

আর এই পানি বেহাত হলে তৃষ্ণা নিয়ে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে আমাদেরকে ।

বাবার সেই কথা ভোলেনি জায়েদ । কখনও দয়া করেনি কাউকে । খালিফের সহায়তা আর এ গুহায় যারা উপস্থিত, তাদের কাছ থেকে ফাও পেয়ে মস্ত লাফে সামনে বেড়েছে— বাবা ছিল মরুদ্যানের নিয়ন্ত্রক, কিন্তু এবার ক’দিন পর দুনিয়ার অর্ধেক মিষ্টি পানির মালিক হবে জায়েদ ।

এইডদের পিছনে রেখে কনফারেন্স রুমে প্রবেশ করল মিস্টার সেরেংগেরেল বাদসাইখান । মঙ্গোল জাতির মানুষ, তার পরিবার দেড় শ’ বছর ধরেই বাস করেছে চিনে । আর চিনা সরকার মুক্ত-বাজার নীতি গ্রহণ করবার পর গত কয়েক দশকে সেরেংগেরেল বাদসাইখান হয়ে উঠেছে চিনের অন্যতম ধনী ব্যক্তি । জায়েদ বিন মনযুরের সঙ্গে ব্যবসায়িক চুক্তি হওয়ার পর চিন ও মঙ্গোলিয়ায় কিনেছে লক্ষ লক্ষ একর অনাবাদী জমি ।

সেরেংগেরেল ঢুকতেই সালাম দিল খালিফ, হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল তার চেয়ার । এই কনফারেন্সে যোগ দেয়ার জন্য উপস্থিত হয়েছে সব মিলে নয়জন । চিন থেকে সেরেংগেরেল বাদসাইখান, পাকিস্তান থেকে জাফর লালা, শেখ হাকিম আবেদিন সৌদি আরব থেকে, সুদান থেকে লাম্বা আসাহারি, তুরস্ক থেকে আজিজ ভাই; এ ছাড়া ছোট পার্টি বলতে অন্য আরব দেশ ও আফ্রিকার দু’একটি দেশের ব্যবসায়ীরা । শেষের এরা লগ্নি করেছে অনেক কম টাকা । তাদের গুরুত্বও তাই অনেক কম ।

পাকিস্তান ছাড়া অন্য কোনও দেশের সরকার প্রতিনিধি পাঠায়নি । জাফর লালা ছাড়া অন্যরা মস্ত ব্যবসায়ী, জায়েদ বিন মনযুরের পরিকল্পনার ফলে উপকৃত হবে বলেই খরচ করেছে এত টাকা ।

‘মহান আল্লামার ইচ্ছায় আবারও মিলিত হয়েছি আমরা,’

বক্তৃতার ঢঙে শুরু করল জায়েদ।

‘আপনার আল্লাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া না করলেও চলবে,’ রুঢ় কণ্ঠে জায়েদকে থামিয়ে দিল বাদসাইখান। ‘কাজের অগ্রগতি জানান। ডেকেছেন আরও ফাণ্ড চাইতে, কাজেই আগে দেখান কোন্ দিক থেকে বদলেছে পরিবেশ। আমরা এখনও কোনও উন্নতি দেখিনি।’

বেয়াদব-বেয়াক্কেল লোকটার কথায় অত্যন্ত বিরক্ত হলো জায়েদ। ওর মনটা চাইল গুলি করে মারে ব্যাটাকে, কিন্তু গুলি করা তো দূরের কথা, বাস্তবে সামান্য দুর্ব্যবহারও করতে পারবে না। তার কনসোর্টিয়ামের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টার সেরেংগেরেল বাদসাইখান। ইতিমধ্যে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। জানতে চাইতেই পারে এত টাকা দিয়ে কী করছে জায়েদ। যথেষ্ট ধৈর্য ধরেছে ব্যবসায়ীরা। অবশ্য, প্রথম থেকেই অধৈর্য ছিল এই মঙ্গোল লোকটা। আর সত্যিই, এখনও চোখে কোনও মুনাফা দেখেনি সে। এদিকে টাকা দেবে বলেও ঘোরাতে শুরু করেছে মিশরীয় জেনারেল নাফিস আবিল-বিল। কাজেই এই অবস্থায় সেরেংগেরেলের আর্থিক সহায়তা জায়েদের খুবই প্রয়োজন।

‘আপনারা তো জানেন, সঠিক সময়ে টাকা জোগান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন জেনারেল নাফিস।’

‘বুদ্ধিমান লোক, সব বুঝে সটকে পড়েছে,’ বলল মিস্টার বাদসাইখান। ‘আমরা বোকা বলেই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে ফেঁসে আছি। আমি পাঁচ মিলিয়ন একর মঙ্গোল মরুভূমি কিনেছি, কিন্তু ওখানে একটা ফোঁটা বৃষ্টিও পড়েনি গত দুই বছরে। জনাব জায়েদ, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, সব কিছুরই শেষ আছে। আমার ধৈর্যও ফুরিয়ে এসেছে।’

‘ভাববেন না,’ বলল জায়েদ, ‘দু’চার দিনের ভেতর বুঝবেন, টাকা পানিতে গেছে বলে কোনও ক্ষতি হয়নি।’

টেবিলের পাশ থেকে কালো রিমোট কন্ট্রোল নিল সে। প্রতিটি স্তব্ধ ফ্ল্যাট স্ক্রিন ফিরে পেল জীবন। দেয়ালে দেখা গেল অদ্ভুত কিছু ডায়াগ্রাম নিয়ে জ্যোত্স হয়ে উঠেছে মস্ত এক এলএসডি স্ক্রিন। নীল রঙের অংশ আরব সাগর ও ভারত মহাসাগর। লাল-কমলা ও হলদে রঙে নানান তাপমাত্রা। কিছু তীরচিহ্ন দেখাচ্ছে কীভাবে বইছে স্রোত এবং সেগুলোর গতিপথ।

‘ভারত মহাসাগরের গত পঁচিশ বছরের স্রোতের গড় গতিপথ দেখছেন,’ বক্তৃতার ঢঙে নিখুঁত অক্সফোর্ডি উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল জায়েদ। ‘শীত ও গ্রীষ্মের প্যাটার্ন দেখুন। শীতে ঘড়ির কাঁটার মত পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসে এসব স্রোত। তখন হাই-প্রেসার শুকনো হাওয়া আসে ভারত উপমহাদেশ আর চীন থেকে। কিন্তু গ্রীষ্মে একেবারেই পাল্টে যায় প্যাটার্ন। সাগরের চেয়ে অনেক দ্রুত উত্তপ্ত হয় স্থলভূমি। হালকা হয়ে ওঠে বাতাস, আর তখন সাগর থেকে ভারত ও দক্ষিণের দেশগুলোর ওপর হাজির হয় মৌসুমী বায়ু। শুরু হয় বৃষ্টিপাত।’

রিমোট কন্ট্রোলের বাটন টিপে প্যাটার্ন পাল্টে দিল সে।

‘আপনারা তো নিশ্চয়ই জানেন, বাতাসের কারণে পাল্টে যায় তাপমাত্রা আর প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট। আর ওই বাতাস চালিত করে সাগরের স্রোতকে। আসলে দুটো মিলেই তৈরি করে শুষ্ক পরিবেশ অথবা মৌসুমী বৃষ্টিপাত। পরের ক্ষেত্রে ভারত উপমহাদেশ আর এশিয়ার দক্ষিণের দেশগুলোর আকাশে হাজির হয় প্রচুর জলকণা, শুরু হয় মৌসুমী বৃষ্টিপাত। ফসলের মাঠ ভিজে না গেলে কোটি কোটি মানুষের মুখে পৌঁছোত না খাবার।’

স্ক্রিনে নতুন ছবি আনল জায়েদ। ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া আর থাইল্যান্ডের আকাশে দেখা গেল ঘন কালো মেঘ।

‘আগেও আপনার এসব ডেমনস্ট্রেশন দেখেছি,’ বিরক্ত স্বরে

বলল আইএসআই ডেপুটি চিফ ব্রিগেডিয়ার জাফর লালা।
'আশপাশের সব দেশ ফসল তুলছে গোলা ভরে, আর শুকিয়ে
আছে আমাদের দেশের মাটি। আপনাদের নিজেদের মরুভূমিও
তো শুষ্ক। আমরা আপনার বক্তৃতায় মুগ্ধ হতে আসিনি, জানতে
এসেছি আপনি সফল হয়েছেন কি না। সত্যিই কি বদলে যেতে
শুরু করেছে পরিবেশ? আমরা কিন্তু শত শত কোটি টাকা
বিনিয়োগ করেছি।'

'ঠিকই বলেছেন আপনি,' বলল সুদানী ব্যবসায়ী।

'আপনারা কি ভাবছেন যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়াই আপনাদেরকে
এখানে ডেকেছি?' শান্ত স্বরে বলল জায়েদ বিন মনযুর।

'তা হলে সেটা দেখান,' চড়া সুরে বলল বাদসাইখান।

রিমোট কন্ট্রোলার বাটন টিপে অন্য দৃশ্য আনল জায়েদ।

'তিন বছর আগে ভারত মহাসাগরের পূবে বোনা হয়
আমাদের ফসল।'

স্ক্রিনে ত্রিকোণ একটা ছোট জিনিস দেখা গেল।

'আর আপনাদের ফাণ্ড নিয়ে প্রতি বছর মহাসাগরের নতুন সব
সেক্টরে এই জিনিস ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রতি বছর বড় হয়েছে
ওদের পাল। তা-ই হওয়ার কথা। ওরা নিজেরাই তৈরি করে
নিজেদের ডুপ্লিকেট অসংখ্য কণা, তার থেকে তৈরি হয় আরও।
দু'বছর আগে টার্গেট এরিয়ার মাত্র দশ পার্সেন্ট জায়গায় ছিল।'

স্ক্রিনে দেখা দিল সাগরের স্রোত। সেখানে রয়েছে অসংখ্য
ধূসর কণা।

'এক বছর আগে দখল করে টার্গেট এরিয়ার ত্রিশ পার্সেন্ট
এলাকা।'

আরেক ক্লিকে স্ক্রিনে এল নতুন ডায়াগ্রাম।

দেখা গেল দুটো স্রোত।

ভারত মহাসাগরের দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়ছে ধূসর কণা।

‘আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, গত বছর কম বৃষ্টি পড়েছে ভারত উপমহাদেশ সহ দক্ষিণের দেশগুলোয়। গত বছর খুব কম ফসল পেয়েছে কৃষকরা। আর এ বছর আকাশের দিকে চেয়ে আছে তারা। কিন্তু দেখবে, আকাশে কোনও মেঘ নেই।’

আরেকবার রিমোটের বাটন টিপল জায়েদ।

দেখা গেল, ওসব দেশের আকাশে অনেক হালকা মেঘ। ভারত মহাসাগরের মাঝের আকাশ হয়ে উঠছে কালো। সাগরের স্রোত এবং জায়েদের কণার কৌশলে দেখা দিয়েছে ঘন মেঘ, আর ওই এলাকার নাম দিয়েছে ওশনোগ্রাফাররা জায়ার। ওখানে সাগরের পানির তাপ পাল্টে গেলে ভয়ঙ্কর প্রভাব পড়বে চারপাশের পরিবেশে।

‘কমছে সাগরের জলের তাপমাত্রা, কিন্তু আকাশের তাপমাত্রা বাড়ছে— জমিতে সহজেই এটা দেখা যায়,’ বলল জায়েদ। ‘বায়ু পাল্টে নিতে শুরু করেছে কোর্স, তাই পাল্টে যাচ্ছে সাগর ও পরিবেশ। হয়তো খেয়াল করেছেন, ইথিওপিয়া আর সুদানের উপরের অংশে শুরু হয়েছে প্রচুর বৃষ্টিপাত। বেশ কয়েক বছর পর প্রথমবারের মত ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে মিশরের লেক নাসের।’

ব্যবসায়ীদের চেহারায়ে সন্তুষ্টি, খুশি আইএসআই ডেপুটি চিফ জাফর লালা, কিন্তু গলে যাওয়ার পাত্র নয় সেরেংগেরেল বাদসাইখান।

‘ওই এলাকায় দুর্ভিক্ষ হলে আমাদের বিশেষ কোনও লাভ নেই,’ বলল সে। ‘শুধু খুশি হতে পারে জাফর লালা। ওদের শত্রু দেশের মানুষ না খেয়ে মরছে। কিন্তু আমাদের মূল উদ্দেশ্য কিন্তু অন্য। আমরা ফসল বিক্রি করতে চাই ওদের কাছে। তা করতে হলে আগে চাই আমাদের দেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত।’

‘ঠিকই বলেছেন,’ বলল জায়েদ, ‘কিন্তু প্রথমে পরিবেশ পাল্টে

না দিলে ফসল পাবেন না। আগে চাই আপনাদের দেশে যথেষ্ট বৃষ্টিপাত। শুকনো জমি কখনও ফসল দেবে না। সে বৃষ্টি আমি দেব। আর আপনারা ফসল তুলে বিক্রি করবেন বিলিয়ন বিলিয়ন ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে।’

চেয়ারে পিঠ ঠেকিয়ে বসল বাদসাইখান। বুকের উপর ভাঁজ করা দুই হাত। তাকে মোটেও খুশি মনে হলো না।

‘বিজ্ঞান আসলে সহজ,’ বলল জায়েদ। ‘আজ থেকে ছয় হাজার বছর আগে এই মিডল ইস্ট, আরব পেনিনসুলা আর উত্তর আফ্রিকা ছিল সবুজ; মাটি ছিল উর্বর। ছিল ঘাস জমি, সাভানা বা গাছে ভরা প্রকাণ্ড সব অরণ্য। তারপর পাল্টে গেল পরিবেশ। সব হয়ে গেল মরুভূমি। আর এসবই হলো সাগরের স্রোত আর তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্ট পাল্টে যাওয়ায়। ক্লাস টেনের বিজ্ঞানের ছাত্রও এ কথা জানাতে পারবে। কিন্তু আমরা এবার নতুন করে পাল্টে দেব পরিবেশ। আবারও এদিকের জমি হয়ে উঠবে উর্বর। গত বছর প্রথমবারের মত আলামত দেখা দিয়েছে। আর এ বছর কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে এদিকে পড়ছে বৃষ্টি।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল বাদসাইখান, হাত তুলে তাকে নিবৃত্ত করল জায়েদ।

‘মঙ্গোলিয়ায় বৃষ্টি কোথায়— তাই তো জানতে চাইছেন? আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে চিনের বিশাল ভূখণ্ডের উত্তরে আপনার মঙ্গোলিয়া। প্রশান্ত মহাসাগরের উপযুক্ত জায়গায় ছাড়া হয়েছে কোটি কোটি ন্যানোবট। চিনকে মরুভূমি বানিয়ে আপনার কাছে পৌঁছতে কিছু সময় নিচ্ছে, এই যা। এ বছরের শেষ দিকে অথবা আগামী বছরের প্রথম দিকেই পেয়ে যাবেন আপনার বৃষ্টি।’

সৌদি আরবের শেখ হাকিম আবেদিন বলল, ‘জানতে পারি, কী কারণে আপনার ওই কণা এড়িয়ে গেল সবার চোখ? লাখে লাখে ওই জিনিস তো স্যাটালাইটে ধরা পড়ার কথা।’

‘লাখ নয়, লক্ষ কোটি... দিনে ওরা থাকে সাগর-সমতল থেকে নীচে। সূর্যের তাপ যেতে দেয় না সাগরের গভীরে। আর রাত হলেই ওই তাপ উল্টো ছড়িয়ে দেয় আকাশে। চাইলেও ওগুলোকে দেখতে পাবে না কেউ। সাধারণ স্যাটালাইট বড়জোর দেখাবে সাগরের স্রোত। আর থার্মাল ইমেজ ব্যবহার করলে ধরা পড়বে মৃদু রেডিয়েশন।’

‘পানির স্যাম্পল নিলে?’ জানতে চাইল বাদসাইখান।

‘ওই বিশাল পাল সবচেয়ে আক্রমণাত্মক মোডে থাকলেও খালি চোখে দেখা যাবে না। মনে হবে পানি কিছুটা ঘোলাটে লাগছে। যে কেউ ভেবে নেবে, কোনও কারণে ওই পানি খুবই পলিউটেড হয়ে গেছে। অত্যন্ত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের নীচে দেখলে তখন বুঝবে, এসব কণার প্রতিটি আসলে ক্ষুদ্র রোবট বা ন্যানোবট। কাজেই ভয়ের কোনও কারণ নেই। তবুও ওই এলাকার রিসার্চ ভেসেলগুলোর ওপর চোখ রাখছি আমরা। দরকার পড়লে ওই এলাকা থেকে ন্যানোবট সরিয়ে নেয়া হবে।’

‘সব সরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়, তা এখন জানি আমি,’ বলল বাদসাইখান।

পলকের জন্য থতমত খেল জায়েদ। বাদসাইখান যে সাগরের ওই দুর্ঘটনার কথা জানে, ভাবতেও পারেনি সে। মনে মনে তার প্রশংসা করল। এমনি এমনি এত উপরে ওঠেনি চেঙ্গিসের নাতী ওই মঙ্গোল ব্যাটা। দরকার পড়লে নাড়ির খবরও জোগাড় করতে পারে।

‘উনি কী বললেন?’ জানতে চাইল জাফর লালা।

‘আমাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল একটা রিসার্চ ভেসেল,’ বলল জায়েদ। ‘ওটা আমেরিকানদের। দেরি না করে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।’

আস্তে করে মাথা নাড়ল সেরেংগেরেল। ‘আপনি শুধু বলেছেন

ওই রিসার্চ ভেসেল আমেরিকানদের। পুরো সমস্যা আমাদের খুলে বলেননি। ওই সংগঠনের নাম নুমা। ন্যাশনাল আগারওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি।’

গুঞ্জন শুরু হয়েছে ব্যবসায়ীদের মাঝে।

জায়েদ বুঝে গেল, এখনই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে পরিস্থিতি, নইলে বিপদে পড়বে। ফাগুর পরের ইন্সটলেশন পাওয়া ওর জন্য খুবই জরুরি। নইলে মুখ খুবড়ে পড়বে গোটা অপারেশন।

‘ওই ছোট রিসার্চ ভেসেলে হামলা না করে উপায় ছিল না,’ স্বাভাবিক স্বরে বলল জায়েদ, ‘আমরা ভাবতেও পারিনি তিনজন নাবিকের সেইল বোট আসলে রিসার্চ ভেসেল হতে পারে। তারা যে ওখানে উপস্থিত হবে, তাও আগে কোথাও জানায়নি। আমরা যখন বুঝলাম, ন্যানোবট আবিষ্কারের খুব কাছে পৌঁছে গেছে তারা। ভারত মহাসাগরের তাপমাত্রার ডেটাও পাঠিয়ে দিয়েছে হেডকোয়ার্টারে।’

‘তারপর কী করলেন?’ জানতে চাইল সৌদি শেখ।

‘ন্যানোবট খেয়ে ফেলল তাদেরকে।’

‘খেয়ে ফেলল মানে?’

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল জায়েদ বিন মনযুর। ‘খাওয়ার মোডে রাখলে ওরা যে-কোনও কিছু খেয়ে নিতে পারে। প্রোথ্রামের অংশ ওটা। রিপ্ৰোডাকশনের সময় বা নিজেদের রক্ষার সময় ওই প্রোথ্রাম চালু রাখি আমরা। এখান থেকেই নির্দেশ দিই আমি।’

কথাটা শুনে যেন আরও রেগে গেল সেরেংগেরেল। ‘আপনি একটা গাধা, জায়েদ।’

‘লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জায়েদ বিন মনযুর। ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘ল্যাংগোয়েজ, প্রিয়!’

এই ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখে কয়েক সেকেন্ড স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল সেরেংগেরেল বাদসাইখান, তারপর গলা নামিয়ে বলল,

‘আই অ্যাঁম সরি। যা বলছিলাম, আসলে প্রতিটা ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকে। ধরে নিতে পারেন তদন্ত করবে নুমা। নিজেদের লোক মারা গেছে, কাজেই সহজে হাল ছাড়বে না। খুঁজে বের করবে কী হয়েছে। আপনি আসলে ঘুমন্ত একটা পাগলা কুত্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন।’

রেগে আছে জায়েদ, কথা শুনে ফাঁৎ করে জ্বলে উঠল, ‘আমাদের কোনও উপায় ছিল না। ন্যানোবটের পাল ঘনভাবে ভাসছে সাগরে। এই অবস্থায় ওগুলো যে-কোনও সময়ে বিপদে পড়তে পারে। আমেরিকানরা খুঁজে পাবে ওদের, এমন তো হতেই পারে। যদিও সম্ভাবনা খুবই কম। যাই হোক, প্ল্যান অনুযায়ী আসল কাজ শুরু করার খুব কাছে চলে এসেছি আমরা। শুরু হয়েছে নতুন মৌসুম। এখন যদি হাল ছেড়ে দিই, পানিতে যাবে সবার সব টাকা, আর পণ্ড হবে আমার সমস্ত পরিশ্রম।’

‘ভবিষ্যতে যেন এমন না হয়, সেজন্যে কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?’

বড় করে দম নিল জায়েদ। ‘একবার পরিবেশ পাল্টে দিলে আবারও তলিয়ে যেতে পারবে ন্যানোবট। রিপ্রোডাকশন করবে সাগরের নীচে বসে। ধীরে ধীরে এত বড় পাল তৈরি হবে, দুনিয়ার কোনও শক্তি ওগুলোকে ঠেকাতে পারবে না। কারও সাধ্য থাকবে না ওদের ধ্বংস করার।’

‘কোথায় যাবে ওগুলো?’ জানতে চাইল জাফর লাল।

‘ছড়িয়ে পড়বে দুনিয়ার সব সাগরে,’ বলল জায়েদ। ‘আমরা শুধু আমাদের মহাদেশ নিয়ন্ত্রণ করব না, দুনিয়ার সব দেশ চলে আসবে আমাদের পায়ের নীচে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। প্রতিটি দেশ চাঁদা দেবে আমাদেরকে। নইলে বন্ধ হয়ে যাবে ওদের বৃষ্টি।’

‘আর সব দেশ দল বেঁধে ন্যানোবট ধ্বংস করতে শুরু করলে?’ জানতে চাইল বাদসাইখান।

‘ওগুলোকে সাময়িক ধ্বংস করতে চাইলে সাগরের ওপর তেল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে, নইলে ক্ষতি হবে না ওগুলোর। সাগরে যদি আগুন ধরিয়ে দেয়, তবু তো রক্ষা নেই। জঙ্গলে দাবানল হলেও পরে যেভাবে আবারও জন্ম নেয় নতুন গাছ, ভরে যায় ফাঁকা জায়গা, সেভাবেই ন্যানোবট জন্ম দেবে নিজের মত বা তার চেয়েও মারাত্মক নতুন ন্যানোবট।’

পরস্পরের দিকে চাইছে ব্যবসায়ীরা। বুঝে গেছে, এই অস্ত্রের জোর কোথায়। জায়েদ বিন মনযুরের হাতে এমন এক মারণাস্ত্র রয়েছে, যেটা ঠেকাতে পারবে না কেউ।

‘ঠিক কাজই করেছেন, জায়েদ,’ আরব ভাইয়ের পক্ষ নিল শেখ হাকিম আবেদিন।

‘আমারও তা-ই মনে হয়,’ বলল আইএসআই ডেপুটি চিফ, বিগেডিয়ার জাফর লালা।

অসম্ভব সেরেংগেরেল বাদসাইখান কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘দেখা যাক কী হয়। আমার ভুল না হয়ে থাকলে, নুমার লোক পৌঁছে গেছে মালে দ্বীপে। তদন্ত করে দেখবে তারা। আর ন্যানোবটের পাল যদি এখনও নাজুক অবস্থায় থাকে, সেক্ষেত্রে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ারই চেষ্টা করবে।’

‘এখন সেটা অসম্ভব,’ আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল জায়েদ। ‘চিন্তা করবেন না। আমরা জানি ওই ক্যাটাম্যারানে কারা ছিল। আর এ-ও জানি, মালে দ্বীপে কাদের দেয়া হয়েছে তদন্তের দায়িত্ব। সঠিক সময়ে তাদেরকে মোকাবিলা করব আমি।’

ছয়

ষোলো শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পনেরো বছরের জন্য মালদ্বীপ দখল করে নিয়েছিল পর্তুগিজরা। সত্তেরো শতাব্দীতে চার মাসের জন্য ওটা দখল করেছিল ডাচ কলোনিস্টরা। আর উনিশ শতাব্দীর শেষে এসে তুমুল লড়াই শুরু হবে, এমন সময় আঠারো শ' সাতাশি সালে এ দেশের শাসন নিজেদের হাতে তুলে নেয় ব্রিটিশ সরকার। এসব দ্বীপ নিজেদের প্রোটেক্টোরেট বলে ঘোষণা করে। এরপর অনেক সংগ্রামের পর উনিশ শ' পঁয়ষাট সালে স্বাধীনতা ফিরে পায় মালদ্বীপ।

এই দ্বীপরাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল দ্বীপ হচ্ছে মালে। আগে এটা ছিল রাজার ব্যক্তিগত দ্বীপ। দুই শ' বর্গমাইল বিস্তৃত সাগরের আর সব দ্বীপে থাকত তাঁর প্রজারা। আজ আর ক্ষমতা নেই কোনও রাজার, দেশের রাজধানী হয়ে উঠেছে-মালে। ছোট্ট এই দ্বীপ মাত্র তিন বর্গমাইল জুড়ে, আর এখানে গাদাগাদি করে বাস করছে এক লক্ষাধিক নাগরিক।

মালদ্বীপের কোনও দ্বীপই হাওয়াই বা তাহিতির মত আগ্নেয়শিলা দিয়ে তৈরি নয়, কোথাও নেই কোনও চূড়া বা পাথুরে এলাকা। মালের সবচেয়ে উঁচু জায়গা সাগর-সমতল থেকে মাত্র সাত ফুট উপরে। সাগরের তীরেই ছড়িয়ে আছে বহুতল সব অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। মালে এতই ছোট যে এখানে কোনও এয়ারপোর্টও নেই। পাশের দ্বীপ হালহলে দেখতে এয়ারক্রাফট

ক্যারিয়ারের মত, ওখানেই অবতরণ করে বিমান। ওই দ্বীপের কাস্টমস্ অফিসারদের হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার পর লাগেজ নিয়ে উঠতে হয় সি ট্যাক্সিতে, ওগুলোই পৌঁছে দেয় প্যাসেঞ্জারদের অন্যসব দ্বীপে। তাতে খরচও খুব বেশি হয় না।

অবশ্য, এখন কোনও দ্বীপে যাওয়ার সামান্যতম ইচ্ছা নেই রানা বা সোহেলের। প্রতিদিনের ব্যায়ামটা না করলেই নয়, কাজেই ভোরে ঘুম থেকে উঠেই হোটেল ত্যাগ করে সাগর-তীর ঘেঁষে পুরো এক চক্কর ঘুরে এসেছে এই দ্বীপ। আবারও ফিরেছে হোটেলের কাছেই সৈকতে। সামান্য হাঁপিয়ে গেছে সোহেল।

গতকাল সন্ধ্যায় যে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে ডাব কিনেছিল রানা, তার কাছ থেকেই দুটো ডাব নিল ও। একটা ধরিয়ে দিল সোহেলের হাতে। ‘যে-কোনও বিয়ারের চেয়ে অনেক ভাল।’

‘কচু! সত্যিকারের বন্ধু হলে গোটা পাঁচেক কার্লসবার্গ...’

‘চোপ!’

ওর মতই একই বর্ণের ত্বক, কিন্তু অন্য ভাষা বলছে, তাই জানতে চাইল ডাবওয়ালা, ‘আপনারা বিদেশি বুঝি?’

‘বাংলাদেশি,’ বলল সোহেল।

‘বেড়াতে এসেছেন বুঝি?’

‘শুরুতে বেড়াতেই এসেছিলাম, এখন কাজ চেপে গেছে,’ বলল সোহেল। সরু পাইপ মুখে তুলে চোঁ-চাঁ টান দিল ডাবের বুকো।

‘তাই নাকি, স্যর? কী কাজ?’ জানতে চাইল ডাবওয়ালা।

‘আমরা সমস্যা দূর করি।’

‘তা হলে, স্যর, আপনারা জুল জায়গায় চলে এসেছেন। মালদ্বীপ আসলে স্বর্গ। এখানে কোনও সমস্যা নেই।’

চুপ করে আছে সোহেল।

রানা ভাবল, লোকটার কথা ঠিক হলেই ভাল হতো।

আরেক টুরিস্ট ডাকতেই ডাব নিয়ে ছুটল লোকটা ।

একবার সৈকত দেখল রানা ।

সূর্য উঠতেই হাজির হয়েছে টুরিস্টরা । খুলে গেছে সাগর-
তীরের সব দোকান । একদল লোক উজ্জ্বল, চকচকে কমলা ভেস্ট
পরে মেরামত করছে কংক্রিটের ডকের একাংশ । মাঝে মাঝে
কাজ বন্ধ করে কোদালে হেলান দিয়ে দেখছে সুন্দরী এক
মেয়েকে । মনে হলো মেয়েটা পলিনেশিয়ান । লোভনীয় ভঙ্গিতে
বুক ফুলিয়ে হাঁটছে । কিছু দূর গিয়ে ফিরে আসছে আবারও ।

লোকগুলোর কোনোই দোষ নেই, মনে মনে বলল রানা । পিঠ
বেয়ে কোমরে নেমেছে মেয়ের কুচকুচে কালো চুল । সূর্যের
সোনালী আলোয় চিকচিক করছে কমলাকোয়া ঠোঁটের ওপর
ঘামের বিন্দু । পরনে স্লিভলেস সাদা ব্লাউস । পাতলা কালো প্যান্ট
আড়াল করেনি সুগঠিত উরু ।

মেয়েটা ঢুকে গেল গহনার একটা দোকানে । হতাশ হয়ে
নিজেদের কাজে মন দিল লোকগুলো ।

‘কী রে, হাঁ করে ওদিকে কী দেখছিস?’ ডাব শেষ সোহেলের ।

‘তোর ভাবীকে । তবে দেখতে পাবি না । এখন ঢুকে পড়েছে
দোকানে ।’

‘তুমি শালা কোনোদিন বিয়ে করবে না,’ মতামত জানিয়ে
দিল সোহেল ।

ডকের দিকে চেয়ে হাঁটতে শুরু করেছে রানা ।

ট্র্যাশক্যানে ডাব ফেলে পিছু নিল সোহেল ।

ডকে এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পরিচিত দু’জন মানুষ ।

আসিফ ও তানিয়া । দু’জনেই সুদর্শন । বয়স সবে তিরিশ ।
আসিফের মাথায় কালো চুলের গোছা, নেমে এসেছে ঘাড় ।
ওদিকে স্বামীর চেয়ে অনেক ছোট তানিয়ার চুল, পুরুষালি
কায়দায় ছোট করে ছাঁটা । চুল ছোটই হোক কিংবা বড়, দেখে

মনে হয় আঁচড়ানোর সময় নেই ওদের। লাইব্রেরিতে বইয়ে মুখ গুঁজে থাকার চেয়ে বাইরে প্র্যাকটিক্যাল ওঅর্কই ওদের বেশি পছন্দ।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই মেরিন সায়েন্সের সঙ্গে জড়িত। আসিফ ডিপ-ওশন জিয়োলজিস্ট, তানিয়া পেশায় মেরিন বায়োলজিস্ট। ওরা তিন বছরের চুক্তিতে ন্যাশনাল আগুরওঅটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সি, মানে নুমা-য় কাজ করছে। মস্ত সুযোগ, আর সেটা লাভ করার জন্য মাসুদ রানার কাছে কৃতজ্ঞ ওরা। রানার কলেজ জীবনের বন্ধু আসিফ রেজা। নিজ নিজ ফিল্ডে রেজা-দম্পতি কতটা দক্ষ, তা খুব ভাল করেই জানে ও। মেধার জোরেই আমেরিকায় স্কলারশিপ পেয়েছিল ওরা, কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছে বিখ্যাত দুই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ফিল্ড রিসার্চের জন্য ভাল প্রতিষ্ঠান খুঁজছিল, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা বলে নুমায় কাজ করবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে রানা।

‘খুশি হলাম দেখা হলো এই স্বর্গে,’ রানা সামনে গিয়ে থামতেই বলল তানিয়া রেজা।

‘কী রে?’ হাসল আসিফ রেজা। ‘খবর কী?’

‘তোরা বউ আজ দ্বিতীয়জন যে এই দ্বীপকে স্বর্গ বলেছে,’ জানাল রানা। ‘কখন পৌঁছুলি তোরা?’

‘সি ট্যাক্সিতে করে তিন মিনিট আগে নামিয়ে দিয়ে গেছে,’ জবাবটা দিল তানিয়া। ‘আর ব্রোশিয়ারে এই দ্বীপ সম্পর্কে তাই লিখেছে।’

রানা ও সোহেলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক না করে কোলাকুলি করে নিল আসিফ রেজা। বলল, ‘থাইল্যাণ্ডে ছিলাম। দুনিয়ার সেরা খাবার ওখানেই পাওয়া যায়। পেট পুরে তুমুলভাবে খেয়ে চলেছি, এমন সময় নুমা থেকে নির্দেশ এল, দেরি না করে চলে আসতে হবে এখানে।’

‘হোটেলের রুম বুক করা আছে,’ বলল তানিয়া।

‘চল, আগে হোটেলে ব্যাগ রেখে আসি, পরে অন্য কাজ,’ বলল আসিফ।

আপত্তি তুলল না রানা-সোহেল। একই হোটেলে রুম নেয়া হয়েছে ওদের জন্যে। দশ মিনিট পর হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ওরা চারজন, হাঁটতে শুরু করল দূরের ডক লক্ষ্য করে।

ক্যাটাম্যারান দেখবার জন্য আগ্রহী প্রত্যেকে।

‘এয়ারপোর্টে গুনলাম একটু আগে মালদ্বীপের এনডিএফ, মানে, ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্সের একটা বোট ওটাকে ডকে এনেছে,’ বলল আসিফ। ‘কোয়ারেন্টিনও করেছে নুমার অনুরোধে।’

‘ভাল করেছে,’ বলল রানা।

হোটেলের সামনের ডকে নেই ওই ক্যাটাম্যারান। একটু দূরের আরেক ডকে আছে। পাশেই নোঙর করা দুটো দ্রুতগামী প্যাট্রল বোট। দূর থেকেই দেখা গেল, পুড়ে কালো হয়ে গেছে সাদা ক্যাটাম্যারান।

ছোট খুপরি মত কিঅস্কে থেমে ফর্ম পূরণ করতে হলো। রানা ও সোহেলের জন্য আনা নুমার আইডি-র কপি তরুণ গার্ডের হাতে দিল আসিফ। নিজেদের দুটোও দিয়েছে। চারজনের পাসপোর্টও দেখাতে হলো।

ওই ডকে প্রবেশের জন্য স্ট্যাম্প অভ অ্যাপ্রভালের জন্য অপেক্ষা করতে গিয়ে ডকের দিকে চাইল রানা। সামান্য কুঁচকে গেল ভুরু। দু’মিনিট পর পরিচয়পত্র ও অন্যান্য কাগজ বুঝে নেয়ার সময় ইউনিফর্মড্ গার্ডকে বলল, ‘একটা মেয়ে বোধহয় আমাদের পিছু নিয়েছে। ওয়াকওয়ে থেকে চেয়ে আছে এদিকে।’

আরও ভালভাবে দেখতে গিয়ে ঘাড় ঘোরাতে শুরু করেছে গার্ড। হ্যাঁ, ওই মেয়ে সত্যিই সুন্দরী।

‘সরাসরি ওদিকে তাকাবেন না,’ সতর্ক করল সোহেল।

সাবধান হয়ে গেল গার্ড। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘হ্যাঁ, দেখেছি। কোনও ঝামেলা হবে ভাবছেন?’

‘কে না জানে, রূপসী মেয়ে পিছু নিলে তা খারাপ নয়,’ বলল রানা, ‘কিন্তু আপনি কি আমাদের হয়ে ওর ওপর চৌখ রাখবেন?’

‘খুশি মনে!’ চওড়া হাসি দিল গার্ড।

কিঅস্ব থেকে বেরিয়ে পায়ে হেঁটে ডকের দিকে চলল ওরা, ক্যাটাম্যারানে উঠে পড়ল।

‘ভয়ঙ্কর আগুনে বারোটা বেজে গেছে দামি সেইল বোটের,’ মন্তব্য করল তানিয়া।

সত্যিই সর্বনাশ হয়ে গেছে ক্যাটাম্যারানের। খোল পুড়ে কালো। ফেটে গেছে অনেক জায়গায়। তাপ যেখানে বেশি ছিল, গলে গেছে ফাইবারগ্লাস। চারপাশে ছিটিয়ে আছে ইকুইপমেন্ট ও সাপ্লাই।

‘আমরা আসলে কী খুঁজছি?’ জানতে চাইল আসিফ রেজা।

‘অস্বাভাবিক কিছু, যেটা দেখে বুঝব এই বোটে কী ঘটেছিল,’ বলল রানা। ‘জটিল কোনও সমস্যা ছিল, না হঠাৎ করেই গোলমাল শুরু হয়েছে— তা জানতে হবে।’

‘আমি লগবুক আর জিপিএস ইউনিট খুঁজব,’ বলল আসিফ।

‘আমি তা হলে দেখি কেবিনগুলো,’ বলল তানিয়া।

ড্রাইভার সিটের সামনে থেমে কয়েকটা সুইচ অন-অফ করল সোহেল। ‘পাওয়ার বলতে কিছুই নেই।’

চারপাশে চোখ বোলাতে শুরু করেছে রানা। ক্যাটাম্যারানের ছাতে দুটো সোলার প্যানেল, সেগুলো অক্ষত। এ ছাড়া, মাস্তুলের অনেক উপরে ঘুরছে ছোট একটা উইন্ডমিল।

‘রানা, কেবুলগুলো চেক করে দ্যাখ,’ বলল সোহেল।

কেবিনের ছাতে উঠল রানা, কয়েক সেকেন্ড পরেই নেমে এল

আবার। ‘কেবল পুড়ে গেছে আগুনে।’

চারপাশে চোখ বোলাচ্ছে সোহেল। ওর মতই চোখে সন্দেহ নিয়ে প্রতিটি জিনিস দেখতে লাগল রানা। থামল গিয়ে লাইফ-রাফট ক্যানিস্টারের পাশে। একটা বোটও সরানো হয়নি।

‘পানির নীচে খোলের অবস্থা কী?’ গলা উঁচু করল রানা। ভাবছে, বড় কোনও ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে ক্রুদের। কিন্তু তেমন হলে আগুনের কোনও ব্যাখ্যা নেই।

‘না, এদিকে সব শুকনো,’ নীচের ক্রু কোয়ার্টার থেকে জানাল তানিয়া।

প্রায় বসে পড়ে আগুনের পোড়া দাগ দেখল রানা। কোথাও কোথাও পড়ে আছে পুরু, থকথকে কী যেন।

ইমার্জেন্সি বা বাতাসহীন সময়ে চলবার জন্য রয়েছে সেইল বোটের অগযিলারি ইঞ্জিন। ওটা আছে বোটের পিছনে, ডেকের নীচে। ডেক কভার তুলে ওটা দেখল রানা।

‘ইঞ্জিন বে-তে আগুনের কোনও চিহ্ন নেই,’ জানিয়ে দিল। কাউলিং খুলে ওটার উপর অংশ দেখল।

অনেক কাছে চলে এসেছে পলিনেশিয়ান সুন্দরী। প্রধান ওয়াকওয়ের পাশে ছোট একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। ডক থেকে সামান্য দূরে। এমন ভঙ্গিতে ফোন ধরেছে, মনে হলো ছবি তুলছে পোড়া ক্যাটাম্যারানের, অথবা সেল্ফিতে নিজের ছবি তুলছে।

মেয়েটা রিপোর্টার নাকি?

পোড়া বোট দেখে আগ্রহী হবে না কেউ, যদি না অন্য কিছু জানে।

এই মেয়ে কি তেমন কিছু জানতে পেরেছে?

নীচের ডেক থেকে উঠে এল তানিয়া রেজা।

‘কিছু পাওয়া গেল?’ জানতে চাইল রানা।

তানিয়ার হাতে টুকটাক কয়েকটা জিনিস। ‘টিনার ডায়েরি,’ বলল। ‘এ ছাড়া, আছে জনসনের কয়েকটা নোট আর একটা ল্যাপটপ।’

‘অস্বাভাবিক কিছু নেই?’

‘না। তবে মেইন কেবিনের টেবিলটা ভাঙা। একই অবস্থা বাসন আর তশতরির। কাবার্ড বন্ধ। ধারণা করছি: খেতে বসেছিল ওরা, এমন সময় কিছু ঘটে। প্যাণ্ডির খাবার উধাও। আছে শুধু ক্যানের খাবার।’

মুহূর্তের জন্য রানার মনে হলো, খুঁজে পাবে মানুষ তিনজনকে। হয়তো জরুরি কারণে সরে যেতে হয়েছে তাদেরকে। সঙ্গে নিয়েছে শুধু খাবার।

কিন্তু তাই বা কেন হবে?

সেক্ষেত্রে ক্যানের খাবারও নিয়ে যেত।

ক্যাটাম্যারানের বো থেকে ফিরল আসিফ। হাতে জিপিএস ইউনিট ও স্যাম্পলিং টুল্‌স। ‘বোটের সামনে এমন কিছু নেই যে মনে হবে, বিশেষ কোনও কারণে বোট ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। শুধু নর্মাল না একটা ব্যাপার। ডেক হোস ছিল অন পযিশনে।’

‘হয়তো আশুন নেভাতে কাজে লাগিয়েছিল,’ বলল তানিয়া।

চুপ করে রইল রানা। বোটের দু’পাশের ক্ল্যাম্প দুটো লাল ফায়ার এক্সটিংগুইশার, ছুঁয়েও দেখা হয়নি। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘সেক্ষেত্রে ফায়ার এক্সটিংগুইশার ব্যবহার করত।’

এরপর আর কোনও যুক্তি চলে না।

তানিয়ার দিকে চাইল রানা। ‘শুনেছি, তুমি ফরেনসিকের ক্লাস করেছে।’

মাথা দোলাল তানিয়া। ‘হ্যাঁ। গত বছর ডক্টর স্যাম্পসনের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি, ছোট ছোট অনেক বিষয় থেকে বহু কিছুই জানা যায়, তাই একটা কোর্স করেছি।’

‘আঁচ করতে পারো এখানে কী ঘটেছে?’ বলল রানা, ‘কিছু বাল্ক গুডস হারিয়ে গেছে বলেই ধরে নিতে পারি না, জলদস্যুর হামলা হয়েছে। সরিয়ে নেয়া হয়নি কোনও কমপিউটার। ভাঙা বাসন থেকে মনে হতে পারে, ওখানে লড়াই হয়েছে। কিন্তু তার মানেই এমন নয়, ওরা নিজেদের স্তোত্র মারামারি করে খুন হয়ে গেছে। সত্যিকারের বিপদ বলতে ওই আগুন। কিন্তু ওটার বিরুদ্ধে যদি লড়াই হয়, তো ওরা ভুলে গেল কেন ফায়ার এক্সটিংগুইশারের কথা!’

‘হয়তো আগুনের কারণে ওগুলোর কাছে যেতেই পারেনি,’ বলল আসিফ। ‘হয়তো রাতে আগুন ধরে? অথবা, টব্লিক ফিউম ছড়িয়ে পড়েছিল, বাধ্য হয়ে বোট ত্যাগ করতে হয়।’

অসম্ভব নয়, ভাবল রানা।

সেক্ষেত্রে আগুনের চিহ্নের জায়গায় পোড়া জিনিসগুলোর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ওগুলো থকথকে কাদার মত। হয়তো কোনও ধরনের জেল ছিল। কিন্তু জিনিসটা বোটে এল কোথেকে?

‘ইঞ্জিন বে-তে আগুন ধরেনি। অন্য কোনও কারণে আগুন ধরেছে,’ বলল সোহেল।

‘আগুনের কারণে ডেকে যে থকথকে জিনিসটা দেখেছি, ওটা দিয়েই তদন্ত শুরু করা যেতে পারে,’ বলল রানা।

‘বেশ, খানিকটা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করব,’ জানাল তানিয়া।

‘বোটের ইলেকট্রিকাল পাওয়ার ফিরিয়ে আনার কাজটা আমি নিলাম,’ বলল সোহেল।

‘গুড,’ মৃদু হাসল রানা। ‘আমার তো কোনও কাজ নেই, যাই ওই সুন্দরী মেয়েটার সঙ্গে গিয়ে পরিচিত হই।’

‘শালা বেঈমান,’ বিড়বিড় করল সোহেল। ‘প্রাণের বন্ধুকে রুঠা মরুভূমিতে একা ফেলে...’

উদাস ভঙ্গি নিয়ে ক্যাটাম্যারান ছেড়ে নেমে পড়ল রানা।

সাত

ডকের একমাথার দিকে হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটার ওপর চোখ রেখেছে রানা। নিজের কিঅঙ্কের ভিতর ঢুকে পড়ছে গার্ড। তার দিকেই চলেছে, এমন ভাব দেখিয়ে খুপরি পেরিয়ে গেল রানা। পলকের জন্য চোখাচোখি হলো মেয়েটার সঙ্গে। হাঁটবার গতি আরও বাড়াল রানা। সরাসরি চলেছে মেয়েটার দিকেই।

সম্ভবত ভয় পেল মেয়েটা। পিছিয়ে গেল কয়েক পা। তারপর ঘুরেই ছুট দিল রাস্তার দিকে। পৌছেও গেল ফুটপাথে, আর তখনই দ্রুতগতিতে হাজির হলো এক ডেলিভারি ভ্যান।

ওই মেয়ের সঙ্গীরা সাহায্য করতে এসেছে, ভাবল রানা।

কিন্তু ডেলিভারি ভ্যান দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে রূপসী। দ্বিধা ফুটে উঠল চেহারায়। চট করে একবার রানাকে দেখেই আবারও চাইল ভ্যানের দিকে।

কয়েক ফুট দূরে কড়া ব্রেক কষে থেমেছে ভ্যান। দড়াম করে খুলে গেল বামদিকের দরজা, লাফ দিয়ে নেমে এল দুই লোক।

ঘুরেই ছুটতে চাইল মেয়েটা। চোখে-মুখে আতঙ্ক।

রানা জানে না, আসলে কী ঘটছে। কিন্তু কু ডাকল ওর মন। নিজেও দৌড়াতে শুরু করেছে। ধমকের সুরে বলল, ‘অ্যাই, এখানে কী হচ্ছে!’

মেয়েটা দৌড়াতে শুরু করবার আগেই ওকে জাপ্টে ধরেছে ডানদিকের লোকটা, কাঁধে তুলে নিয়েই খোলা দরজা দিয়ে ছুঁড়ে

ফেলল ভ্যানের ভিতর। লাফিয়ে ভ্যানে চাপল লোকদুটো। রানা রাস্তা পর্যন্ত যাওয়ার আগেই চাকার কর্কশ আওয়াজ তুলে রওনা হয়ে গেল ভ্যান।

রানার পিছনে কিঅস্ক থেকে বেরিয়ে 'এসেছে গার্ড, গাল ফুলিয়ে বাজাতে শুরু করেছে স্টিলের হুইসেল।

ওই হুইসেলে কোনও কাজ হবে না, বুঝে গেছে রানা। থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কোনও গাড়ি আছে?'

'স্কুটার আছে,' বলল গার্ড। ব্যস্ত হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে বের করল চাবি। আঙুল তাক করে দেখিয়ে দিল সবুজ ভেসপা।

চিলের মত ছোঁ দিয়ে চাবি নিয়েই এক দৌড়ে ভেসপার পাশে হাজির হলো রানা। ওটা নিয়েই ধাওয়া করবে, ঠিক করেছে। এক লাফে চেপে বসল সিটে, দুই পা দু'দিকে। ইগনিশনে চাবি মুচড়ে দিতেই খির-খির আওয়াজ তুলল পঞ্চাশ সিসির ইঞ্জিন। মনে হলো চালু করা হয়েছে বাথরুমের ফ্যান।

এক উল্টো লাথিতে স্ট্যাণ্ড তুলে নিল ও, মুচড়ে ধরল থ্রটল। রওনা হয়ে গিয়ে জানতে চাইল, 'ওই ভ্যান কোন্ পথে যেতে পারে?'

'আমাদের দ্বীপ দুই মাইল লম্বা, বড় রাস্তা মাত্র কয়েকটা,' পাল্টা জানাল গার্ড।

থ্রটল পুরো খুলে ছুটতে শুরু করেছে রানা। খির-খির ইঞ্জিনের আওয়াজ তুলে চলল ভেসপা। যেন ঘাস ছাঁটার মেশিন। ধীরে গতি তুলছে, দূরে দেখা গেল ভ্যান।

একটু আগেই ওই মেয়েকে রিপোর্টার ভেবেছিলাম, ভাবল রানা। সন্দেহজনক চরিত্র বলেও মনে হয়েছিল। কিন্তু এখন কিডন্যাপারদের হাত থেকে ওকে রক্ষা করা ওর কর্তব্যে দাঁড়িয়ে গেছে। আজকের সকালটা সত্যিই অদ্ভুত।

দুই শ' গজ দূরে তুমুল গতি তুলেছে ভ্যান। পিছনে প্রায়

সাইকেলের মত ভেসপা নিয়ে ধাওয়া করছে রানা। হঠাৎ ব্রেক লাইট জ্বলে উঠল ভ্যানের পিছনে, বামের রাস্তায় বাঁক নিয়ে ছুটল দ্বীপের মাঝ বরাবর।

রানা নিজে বাঁক নিতে গিয়ে সামুদ্রিক মাছের এক দোকানের সামনে সাইকেল হাতে দাঁড়ানো এক লোককে ধাক্কা মারতে যাচ্ছিল, শেষ সময়ে ভেসপা উঠিয়ে দিল ফুটপাথে। তিন সেকেন্ড পর আবারও নেমে এল সরু রাস্তায়।

কিন্তু এসব করতে গিয়ে কমিয়ে আনতে হয়েছে গতি, বাঁক নিয়ে দেখল অনেকটা দূরে চলে গেছে ভ্যান। মন দমে গেল রানার। বুঝতে পেরেছে, এই স্কুটারে চেপে কোনোমতেই ধরতে পারবে না কিডন্যাপারদের। ‘ধ্যাৎ!’ বিড়বিড় করল। মুখে এসে পড়ছে অসংখ্য উড়ন্ত পোকা। ‘শালার সিনেমার পর্দায় জেমস বণ্ড কী গাড়ি চালায়, আর আমি কী?’

অ্যারোডাইনামিক হতে আরও কুঁজো হয়ে বসল রানা। মনে মনে বলল, কপাল ভাল যে স্কুটার পেয়েছিস, নইলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষতি। আর কপাল ভাল যে ভেসপার সামনে কোনও বাস্কেট নেই। তা হলে ধেড়ে ডাইনী মত দেখাত ওকে।

সামনে রাস্তা পেরোতে শুরু করেছে পথযাত্রীরা।

দূর থেকেই হর্ন টিপে ধরল রানা।

যন্ত্রটা থেকে তীক্ষ্ণ আওয়াজ বেরোল: মিপ-মিপ!

বিরজিকর আওয়াজ। ঘুরে চাইল পথযাত্রীরা। ততক্ষণে প্রায় তাদের ঘাড়ের চাপার জোগাড় করেছে রানা। মস্ত সব লাফে সরে গেল সবাই। আর উন্মাদের মত দাঁতে দাঁত চেপে তাদের মাঝ দিয়ে বেরিয়ে গেল রানা। চোখ ভ্যানের ওপর।

দ্বীপের গভীরে চলেছে ভ্যান।

দু’পাশে সারি-সারি সব দোকান। একেকটার মস্ত সব নাম, তিরিশটা অক্ষরের আগে থামতে পারেনি দোকান-মালিক, ওসব

নাম উচ্চারণ করবার সাধ্য রানার কোনোদিন হবে না। কাজেই মনেও রাখতে চাইল না কিছু। এখন ওর একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে ভ্যানের কাছে পৌঁছানো।

আশপাশের অন্য স্কুটারগুলোর সর্বোচ্চ গতি কত, রানা জানে না। কিন্তু ওরটা চলছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। একটু পর প্রায় হাল ছেড়ে দিল ও, আর তখনই নতুন করে খুলল কপাল।

সামনের সরু রাস্তায় একের পর এক গাড়ি। জ্যাম বেধেছে। ফুটপাথে অনেক পথযাত্রী। রাস্তা হয়ে উঠেছে অবস্ট্যাকল রেসের কোর্সের মত।

দুটো সেডানের মাঝ দিয়ে এগোল রানা। ভ্যানের সঙ্গে কমিয়ে আনল দূরত্ব। ব্যস্ত এক ইন্টারসেকশনের ভিড়ে ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে ভ্যান।

ধীর গতির দুটো গাড়ির মাঝে ঢুকে ‘মিপ-মিপ!’ আওয়াজ তুলল রানা, পেরিয়েও গেল অনায়াসে।

সামনে জোরালো হর্ন ব্যবহার করছে ভ্যানের ড্রাইভার। পরের মোড়ে ডানদিকে বাঁক নিল।

রানা নিজেও ঠিকভাবেই বাঁক নিল, ধেমে যাওয়া দুটো গাড়ির মাঝ দিয়ে এগোতে চাইল। মনে মনে আশা করল, ড্রাইভাররা এখন দরজা না খুললেই হয়।

রাস্তা গেছে পশ্চিমে। ভ্যান অনেক কাছে চলে এসেছে। হঠাৎ দূরে আবারও দেখা দিয়েছে সাগর। দ্বীপের আরেক প্রান্তে পৌঁছে গেছে ওরা!

গতি তুলে কমার্শিয়াল হার্বারে ঢুকে পড়ল ভ্যান। দু’পাশে কন্টেইনার ও ইকুইপমেন্টের বড় সব বাক্স। কয়েক সেকেন্ড পর থামল একটা স্পিডব্রেকের কাছে। খুলে গেল বামদিকের দরজা। এক লোক টেনে হিঁচড়ে বের করল মেয়েটাকে। দ্বিতীয়জন নেমে পড়ে তাকে সাহায্য করল। মেয়েটাকে প্রায় বালির বস্তার মত বয়ে

নিয়ে চলেছে দু'জন। ছুটছে স্পিডবোট লক্ষ্য করে। ড্রাইভারও বসে নেই, বামদিকের দরজা খুলে করে বন্ধ করে দিয়ে রওনা হয়ে গেল। দেখতে না দেখতে ভ্যান উধাও হলো সামনের বাঁক পেরিয়ে।

ভ্যানের পিছু না নিয়ে পলিনেশিয়ান মেয়েটার দিকে চলল রানা। পৌছে গেল দুই কিডন্যাপারের একেবারে পিছনে, পরক্ষণে ভেসপা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের পিঠে। আরোহী নেই বলে কংক্রিটের শানের উপর পড়ে ছ্যার-ছ্যার আওয়াজে ছেঁচড়ে কিছুদূর চলে গেল ভেসপা।

পিছুলা শানের উপর তিনজনকে নিয়ে ধড়াস্ করে পড়ল রানা, গোল পাকিয়ে গেল চারজন। রানা টের পেল, ছড়ে গেছে ওর হাঁটুর চামড়া, কোমরের হাড়ে কনকনে ব্যথা। এসব পাত্তা না দিয়ে লাফিয়ে উঠে তেড়ে গেল লোকদুটোর দিকে।

তাদের একজন ঘুরেই ছুট দিল স্পিডবোটের উদ্দেশে। অন্যজন সড়াং করে হাঁটুর পাশ থেকে বের করল ছোরা। পিছাতে শুরু করেছে। তেড়ে আসা রানার বুক লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারল ছোরা।

থমকে দাঁড়িয়ে ছোরার গতিপথ থেকে লাফিয়ে সরে গেল রানা, তাতে ব্যয় হলো মূল্যবান কয়েকটি সেকেন্ড। এই সুযোগে প্রথমজনের পিছু নিয়েছে দ্বিতীয় লোকটা। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল স্পিডবোটে। জোর আওয়াজে গর্জে উঠল আউটবোর্ড ইঞ্জিন, রওনা হয়ে গেল ইউটিলিটি বোট। গতি তুলছে দ্রুত। ওটার কোথাও আইডেন্টিফিকেশন নম্বর দেখল না রানা। থেমে দাঁড়িয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। আশপাশে কোনও বোট নেই যে পিছু নেবে।

এতক্ষণে মেয়েটার দিকে মনোযোগ দিল রানা।

ইটু গেড়ে বসে পড়েছে সে। ছিলে গেছে ডান কনুই,

বেরোতে শুরু করেছে রক্ত। মুখে ব্যথার ছাপ।

সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। শান্ত স্বরে বলল, ‘তুমি ঠিক আছ তো?’

মুখ তুলে চাইল মেয়েটা। চোখ থেকে দরদর করে ঝরছে অশ্রু। আস্তে করে মাথা দোলাল। অবশ্য, বাম হাত দিয়ে ধরে রেখেছে ডান কনুই। কাঁপা কণ্ঠে ইংরেজিতে বলল, ‘মনে হয় হাড় ভেঙে গেছে।’

একটু আগে গুপ্তচরের মত ওদের উপর চোখ রেখেছিল এই মেয়ে, ছবিও তুলছিল ক্যাটাম্যারানের। কিন্তু নরম স্বরে বলল রানা, ‘তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব। কিন্তু তার আগে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও: তুমি কে? আমাদের পিছু নিয়েছিলে কেন? পুড়ে যাওয়া ক্যাটাম্যারানের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?’

‘আপনি মাসুদ রানা,’ নিশ্চিত কণ্ঠে বলল মেয়েটা। ‘কখনও কখনও নুমার হয়ে কাজ করেন।’

‘হ্যাঁ,’ স্বীকার করল রানা। পরস্পরে জানতে চাইল, ‘কিন্তু এ তথ্য কোথা থেকে জানলে?’

‘আমি জ্যাসিন্টা কাপুল,’ বলল মেয়েটা।

চট করে অনেক কিছুই বুঝে ফেলল রানা।

‘আমি জ্যাকো কাপুলের বোন। আমার ভাই ওই বোটে ছিল।’

আট

মালে দ্বীপ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে চিনের শাংহাই

প্রভিন্সে মিলিত হয়েছে মিস্টার সেরেংগেরেল বাদসাইখান ও পাকিস্তানের আইএসআই ডেপুটি চিফ ব্রিগেডিয়ার জাফর লالا। এই সাক্ষাতের জন্য বুলেট ট্রেনের গোটা একটা প্রাইভেট কার ভাড়া নিয়েছে মঙ্গোল ব্যবসায়ী। শাংহাই প্রভিন্স থেকে বেইজিংয়ের দিকে ছুটছে ট্রেন।

সেরেংগেরেল বাদসাইখানের পরনে কালো সুট, জাফর লালার পরনে পাঞ্জাবিদের কুর্তা ও পায়জামা। বগির শেষ মাথায় ওদের থেকে দূরে বসেছে মঙ্গোল লোকটার এইডরা। তাদের মুখোমুখি সিটে বসেছে আইএসআই-এর কয়েকজন এজেন্ট।

আজকের গুরুত্বপূর্ণ এই মিটিঙে স্থির হবে কী করবে এই দুই পক্ষ।

মসৃণভাবে ছুটে চলেছে বুলেট ট্রেন। আর এই বগি দুনিয়ার সেরা। রীতিমত রাজকীয় বললেও ভুল হবে না। মৃদু আলো জ্বলছে ছাতে। চামড়া মোড়া সিট আরামদায়ক। আরও ভালভাবে আরামে বসতে দেয়ার জন্য রয়েছে স্পঞ্জের কুশন। নিঃশব্দে চলছে এয়ারকন্ডিশনার। সরিয়ে ফেলা হচ্ছে ব্যবহৃত অক্সিজেন, আসছে পিউরিফায়ার থেকে মিষ্টি সুবাসিত তাজা বাতাস। তাপমাত্রা চুয়াত্তর ডিগ্রি ফারেনহাইট।

প্রত্যেকের টেবিলে চিনা ও পাকিস্তানি সেরা সব শেফদের রান্না করা খাবার। জাফর লালার ধর্মের কথা ভেবে রাখা হয়নি কোনও মদ বা পর্ক। তবে চা, কোক বা স্টেক ইত্যাদির অভাব নেই।

আতিথেয়তায় খুঁত নেই, কিন্তু আজকের এই সাক্ষাৎ আসলে ব্যবসায়িক মিটিং।

‘জাফর, আপনাকে বুঝতে হবে আপনাদের অবস্থান কেমন হওয়া উচিত,’ জোর দিয়েই বলল বাদসাইখান।

‘আপনি বরং বলুন আপনার ব্যক্তিগত অবস্থান,’ বলল

জাফর।

মৃদু মাথা নাড়ল বাদসাইখান। ‘আমাদের সবার অবস্থানই বুঝে নেয়া উচিত। আমরা এরই ভেতর বুঝে গেছি, কী করা সম্ভব ওই অস্ত্র দিয়ে। জায়েদের হাতের ওই টেকনোলজি কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে উঠবে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র। নতুন করে বদলে দেয়া সম্ভব এই দুনিয়া। কিন্তু, তাতে মনে করি না আমাদের বিশেষ কোনও লাভ হবে। আমরা শুধু কনসোর্টিয়ামের সামান্য সদস্য। যখন-তখন কাঁচকলা দেখিয়ে দেবে জায়েদ। অথচ, আমাদের সবার টাকা দিয়েই তৈরি হয়েছে ওই মেশিনারি। একবার ভেবেছেন, ওটার কারণেই পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে উঠবে জায়েদ? তার চেয়েও বড় কথা, আমরা রয়ে যাব তার সাধারণ ক্রেতা। ব্যাপারটা এভাবে দেখুন: আপনি ইউটিলিটি কোম্পানি থেকে ইলেকট্রিকাল সাপ্লাই নিলেন, কিন্তু নিজে তৈরি করলেন না পাওয়ার প্লান্ট।’

‘আমাদের কী দরকার জায়েদের টেকনোলজির?’ আপত্তির সুরে বলল জাফর লالا। ‘আমার দেশে এমন কোনও বিজ্ঞানী নেই যে ওই টেকনোলজি কাজে লাগাতে পারবে। আমাদের যা দরকার, তা ঠিকভাবে জায়েদ দিলেই হলো। আর আইএসআই যত দিন থাকবে, ওয়াদা রাখতে হবে তাকে। নইলে পৃথিবীর কোথাও গিয়ে লুকিয়ে বাঁচতে পারবে না। ...আর সত্যিই যদি সে ইণ্ডিয়া থেকে মৌসুমী জলকণা সরিয়ে পাকিস্তানে বৃষ্টি নামায়, আর কী চাই! আবহাওয়া সবসময়েই গড়তে পারে নতুন কোনও সাম্রাজ্য, অথবা ধ্বংস করতে পারে যে-কোনও দেশ বা সভ্যতা। আমার কর্তৃপক্ষ চাইছেন, একই সঙ্গে দুটো কাজই হোক। ধ্বংস হোক ইণ্ডিয়া আর বাংলাদেশ, আর সমৃদ্ধ হোক পাকিস্তান।’

জাফর লালার কথা শেষ হওয়ার পর বাদসাইখানের চেহারা দেখে মনে হলো, সে আসলে ক্ষমাশীল কোনও সম্রাট। ভাল

করেই জানে, জাফর লالا চতুর লোক, কিন্তু জায়েদ আর সে একই ধর্মের লোক বলে চোখ এড়িয়ে গেছে অন্ধের সহজ কিছু হিসাব। লোকটা প্রতিশোধ নিতে পারবে জেনে সুখের সাগরে ভাসছে। চিরশত্রু ইণ্ডিয়া আর ওদের বজ্রমুঠি গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বাংলাদেশ এবার উচিত শিক্ষা পাবে। খুশিতে ডগমগ গোটা পাকিস্তান। অল্প দিনের মধ্যেই অনেক আশা পূরণ হতে চলেছে ওদের।

‘কিন্তু একটা কথা কি ভেবেছেন?’ নরম সুরে বলল বাদসাইখান, ‘চিরকালের জন্যে বদলে যাচ্ছে না আবহাওয়া। এটা কোনও চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়। এই প্রাপ্তি আসছে জায়েদ বিন মনযুরের অনুগ্রহে। তার খেয়াল-খুশির ওপর নির্ভর করতে হবে আমাদের সবাইকে। আর একবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করলে তার হাতে জিম্মি হয়ে পড়ব আমরা। ভারত বা বাংলাদেশ এখন হাঁ করে আকাশ দেখছে, যদি বৃষ্টি পড়ে! পরে আমাদেরও তো ওই একই অবস্থা হবে। আর একবার যদি মত পাণ্টে নেয় মনযুর, তখন কে ঠেকাবে তাকে? বৃষ্টি যদি অন্য কোনও দেশে ফেলে সে?’

কথার গুরুত্ব বুঝতে দেয়ার জন্য বিরতি নিল বাদসাইখান। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘জায়েদ বিন মনযুর ইচ্ছে করলে সরিয়ে নিতে পারে বৃষ্টিপাত। ধরুন, নিলাম ডাকল সে। সবচেয়ে ধনী দেশ যথেষ্ট টাকা খরচ করে কিনল বৃষ্টি। কিন্তু নিলামে দরিদ্র, অশিক্ষিত, ধর্মাত্ম পাকিস্তান কি টিকবে অন্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়?’

অপমানের ছাপ পড়ল আইএসআই ডেপুটি চিফের মুখে। ঠোঁটের কাছে চায়ের কাপ তুলেছিল, আস্তে করে নামিয়ে ফেলল হাত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল, ‘হ্যাঁ, আমার দেশের চেয়ে ধনী ইণ্ডিয়া।’

মাথা দোলাল বাদসাইখান। ‘এমন কী, বাংলাদেশও। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে নিলামে বৃষ্টি কিনতে পারবেন আপনারা?’

থমথম করছে জাফর লালার মুখ। ‘জায়েদ আরব জাতির লোক, তা ছাড়া সে আমাদের মতই মুসলিম— সে কখনও আমাদের বদলে শিখ বা হিন্দুদের পানি দেবে না।’

‘আপনি কি নিশ্চিত?’ মৃদু হাসল বাদসাইখান। ‘আপনিই না বলেছিলেন, জায়েদের পরিবারের সবাইকে বলা হতো মরুভূমির শেয়াল? কী করে এত বিস্তৃতিবোধ এল জায়েদের কাছে? বহু মানুষের সম্পদ ও প্রাণ কেড়ে নিয়েই আজ এই পর্যায়ে এসেছে সে, ঠিক কি না?’

মঞ্জোল লোকটার কথা গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছে জাফর লালা। তশতরিতে নামিয়ে রাখল কাপ। তিজুতা নিয়ে চাইল সুস্বাদু খাবারের দিকে, টের পেল মরে গেছে খিদে।

‘আপনার কথাই বোধহয় ঠিক,’ পুরো এক মিনিট পর বলল। ‘আর বৃষ্টির ব্যাপারে ভাল করেই ভেবে দেখেছে জায়েদ বিন মনযুর। নইলে ওর ওই ছোট্ট দেশে অত বড় ফ্যাসিলিটি রাখবে কেন?’

‘তা হলে আমরা একমত হলাম, জায়েদের কথা বা প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করা ঠিক হবে না,’ বলল বাদসাইখান। ‘তার চেয়েও বড় কথা, কোনোভাবেই তাকে প্রতিজ্ঞা পূরণে বাধ্য করতে পারব না আমরা। বলতে পারেন, বাজে পরিস্থিতির ভেতর পড়েছি সবাই, ঠিক?’

‘আমার মত অতটা খারাপ অবস্থায় আপনি পড়েননি,’ বলল জাফর লালা। ‘প্রথম থেকেই এই প্রজেক্টের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিল সরকার। এখন যদি মস্ত কোনও ভুল হয়, সমস্ত দায়-দায়িত্ব এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। আমাদের দেশের বিলাসিতা করার টাকা নেই। আপনারা বুলেট ট্রেনে চাপতে পারেন, আর

আমাদের শহরগুলোকে বস্তি বললেও ভুল হবে না। ফরেন রিয়ার্ড বলতে কিছুই নেই। মস্ত কোনও বিপদে বাধ্য হয়ে আমেরিকান রাজনীতিকদের পা ধরতে হবে।' চুপ হয়ে গেল সে।

'কিন্তু আপনাদের জরুরি একটা জিনিস আছে, যেটা চিন বা মঙ্গোলিয়ার নেই,' বলল বাদসাইখান।

'সেটা কী?'

'আপনারা'বহুকাল ধরেই জায়েদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। একই ধর্মের লোক বলে আপনাদেরকে হয়তো বিশ্বাসও করে সে। আমাকে বা অন্য কাউকে সামান্যতম পাত্তা দেবে না।'

'হতে পারে, কিন্তু তার টেকনোলজির ধারে-কাছে কাউকে ভিড়তে দেবে না,' বলল জাফর লালা।

মৃদু হাসল বাদসাইখান। 'এখনই যে আমাদের হাতে ওই টেকনোলজি আসতে হবে, এমনও নয়।'

'আপনার কথা বুঝতে পারলাম না,' তিজু কণ্ঠে বলল আইএসআই ডেপুটি চিফ।

'আমাদের শুধু বন্ধ করতে হবে জায়েদের কর্তৃত্ব। সোজা কথায়: সরিয়ে দিতে হবে তাকে। আমাদের হাতে নিতে হবে বৃষ্টিপাতের ক্ষমতা। জায়েদ যদি নতুন করে পাল্টে দিতে না পারে আবহাওয়া, নিজের কাজ করতেই থাকবে ন্যানোবটগুলো। আর চিরকালের জন্যে নিয়মিত বৃষ্টি পড়তেই থাকবে আমাদের দেশে।'

সামান্য নড়ে উঠল জাফর লালার গৌফের দুই প্রান্ত। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। হঠাৎ করেই অনেক কিছু বুঝে ফেলেছে। 'আপনি কী করতে বলেন? আমি কিন্তু কোনও কথা দেব না। চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

আস্তে করে মাথা দোলাল সেরেংগেরেল বাদসাইখান। আকারে ইঙ্গিতে জাফর লালাকে যে কাজ করতে বলা হয়েছে, সে

ব্যাপারে কথা দিতে পারবে না কেউই।

‘জায়েদ বিন মনযুর মারা গেলে ব্যক্তিগতভাবে আপনি পাবেন বিশ মিলিয়ন ডলার,’ বলল মন্সোল ব্যবসায়ী। ‘আর আমার হাতে কমাও কোড পৌঁছে গেলে আপনাকে দেব আশি মিলিয়ন ডলার।’

প্রায় হাসি-হাসি হয়ে গেল জাফর লালার মুখ। চকচক করছে চোখ। কিন্তু বুকের ভিতর টের পেল শীতল অনুভূতি। ওই হিম নিভিয়ে দিতে চাইছে লোভের আগুন।

‘গান্ধারি করলে কাউকে ছাড়ে না জায়েদ বিন মনযুর,’ নিচু স্বরে বলল, ‘যারাই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাদের শুকনো হাড় এখন পড়ে আছে মরুভূমির বুকে।’

আরাম করে হেলান দিয়ে বসল বাদসাইখান। বুঝে গেছে, লোভের খাঁচায় বন্দি করা গেছে আইএসআই ডেপুটি চিফকে। এখন শুধু চাই কিছুটা উৎসাহ। একটু খুঁচিয়েও দিতে হবে। ‘ঝুঁকি না নিলে কখনও পুরস্কার পাওয়া যায় না, জাফর। আপনি যদি জায়েদ বিন মনযুরের হাতের পুতুল হয়ে রয়ে যেতে চান, আমার কোনও আপত্তি নেই।’

বড় করে দম নিল জাফর লালা, কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘আমরা কাজে নামছি। অবশ্য অ্যাডভান্স দিতে হবে দশ মিলিয়ন ডলার।’

সামান্য মাথা দোলাল সেরেংগেরেল বাদসাইখান। এই ইশারার জন্য অপেক্ষা করছিল তার এক এইড। উঠে এল সে, হাতে মাঝারি আকারের কালো সুটকেস। ওটা নামিয়ে রাখল আইএসআই ডেপুটি চিফের পায়ের পাশে।

আস্তে করে টাকার সুটকেসের হ্যাণ্ডেল স্পর্শ করে দেখল জাফর লালা।

আবারও বলে উঠল বাদসাইখান, ‘তবে একটা কথা মনে

রাখবেন, জাফর, আমার দেশের মরুভূমিতেও পড়ে আছে লাখে লাখে মানুষের হাড়। যদি বেঈমানি করেন, আমার হাতও অনেক লম্বা, লুকাতে পারবেন না কোথাও।’

নয়

মালদ্বীপের পুলিশ বড় কোনও ঝামেলা না করে দশ মিনিটে ছেড়ে দিতেই জ্যাসিস্টাকে দ্বীপের প্রধান হাসপাতালে নিয়ে গেল রানা। আধুনিক হাসপাতাল, নামকরণ করা হয়েছে গান্ধীজির নামে। ডাক্তার দেখাবার একটু পরেই এক্সরে করা হলো জ্যাসিস্টা কাপুলের কনুই। এ সময়ে ফোনে সোহেলের সঙ্গে কথা বলল রানা। জানিয়ে দিল, ভেসপা নিয়ে ধাওয়া করবার পর কী ঘটেছে।

ওদিকের কথা শুনবার পর ফোন রেখে জ্যাসিস্টার দিকে ফিরে বলল রানা, ‘জানতে পারি, কী কারণে তুমি এ দেশে?’

মেয়েটার হাত স্লিঙে ঝুলিয়ে দিয়েছে ডাক্তার। কপালে সিঁচ করাও শেষ। এবার আয়োডিন ভেজা তুলা চেপে ধরল কপালে।

মুখ কুঁচকে গেল জ্যাসিস্টার। ব্যথাক্লিষ্ট স্বরে বলল, ‘আমি এসেছি আমার ভাইকে খুঁজে বের করতে।’

বুঝলাম, মনে মনে বলল রানা। কিন্তু অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন বলেছিলেন, এখনও জ্যাকো, টিনা বা জনসনের পরিবারকে কিছু জানানো হয়নি। ‘তুমি জানলে কী করে, এখানে বিপদে পড়েছে তোমার ভাই?’

‘আমার ভাই স্রোত নিয়ে গবেষণা করছিল,’ বিষণ্ণ মনে হলো মেয়েটাকে। ‘ই-মেইলে প্রতিদিন দু’বার যোগাযোগ হতো। আমাকে লিখেছিল, গত কয়েক দিন হলো সাগরে অদ্ভুত তাপমাত্রা আর অক্সিজেনের রিডিং পাচ্ছে ওরা। জানতে চেয়েছিল, এসবের কারণে কী প্রভাব পড়বে স্থানীয় সাগরে। আরও লিখেছিল, এ জন্যে অনেক কমে যাবে ক্রিল, প্ল্যাঙ্কটন আর মাছ। ঠাণ্ডা আর প্রাণহীন, বিরান হয়ে উঠতে পারে সাগর।’

রানা জানে, শেষ রিপোর্টে এই একই কথা লিখেছে জনসন।

‘আমার ভাইয়ের ই-মেইল বন্ধ হতেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম,’ বলল জ্যাসিন্টা। ‘আর স্যাটালাইট ফোনেও যখন কথা বলতে পারলাম না ওর সঙ্গে, কল করলাম নুমা হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু মুখ বুজে থাকল সবাই। সন্দেহ বাড়ল আমার। তারপর আর দেরি না করে চলে এলাম এখানে। কথা বললাম হার্বারমাস্টারের সঙ্গে। সে বলল, জ্যাকোর ক্যাটাম্যারান স্যালভিজ করা হয়েছে। আর নুমার লোক আসছে তদন্ত করতে। ভেবেছিলাম আপনারা সার্চ পার্টির লোক, কিন্তু যখন দেখলাম ওই পোড়া বোট...’

চুপ হয়ে গেল জ্যাসিন্টা। মেঝের দিকে চোখ।

চোখে অশ্রু দেখবে ভেবেছিল রানা, কিন্তু মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়েছে মেয়েটা।

‘আপনারা কি জানেন, কী হয়েছে আমার ভাইয়ের?’ কয়েক মুহূর্ত পর জানতে চাইল।

জবাব দিল না রানা।

‘মিস্টার রানা, আমাদের বাবা-মা মারা গেছেন। আত্মীয় বলতেও তেমন কেউ নেই। ছিলাম শুধু দুই ভাই-বোন।’

‘আমরা এখনও কিছুই নিশ্চিত নই,’ নরম সুরে বলল রানা। ‘সব জানতেই কাজে নেমেছি। ...তোমার কোনও ধারণা আছে ওই লোকগুলো কারা ছিল?’

‘না, চিনি না তাদের,’ মাথা নাড়ল জ্যাসিণ্টা, ‘আপনি চেনেন?’

‘আমি এখনও অন্ধকারে,’ স্বীকার করল রানা। বুঝে গেছে, জটিল কোনও রহস্যের দিকে ইঙ্গিত করছে ওই পোড়া ক্যাটাম্যারান। ‘শেষ কখন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল জ্যাকো?’

মেঝের দিকে চেয়ে রইল জ্যাসিণ্টা কাপুল। ‘তিন দিন আগে, সকালে।’

মাঝারি আকারের ইমার্জেন্সি রুমের চারপাশে চোখ বোলল রানা। স্টাফরা ব্যস্ত। অপেক্ষা করছে রোগী। মাঝে মাঝে ইলেকট্রনিক আওয়াজ উঠছে নানান মেশিন থেকে। হাসপাতালে নীরবে নিয়ম ধরে কাজ করছে ডাক্তার, নার্স ও আর্দালিরা। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। তবুও বুকের গভীরে বিপদ-সঙ্কেত টের পেল রানা।

‘জানা জরুরি কী কারণে তোমাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল তারা। আগে আমাদের ধারণা ছিল, তেমন কিছুই হয়নি ক্যাটাম্যারানে; কিন্তু এখন জানি, ব্যাপারটা তা নয়। তুমি যদি আমাদের চেয়ে বেশি না জেনে থাকো, তা হলে...’

‘আমার কাছে শুধু বেস ডেটা পাঠিয়েছিল জ্যাকো। ওটা আপনাদের কাছেও থাকার কথা। আর না থাকলেই বা কী, ওটার জন্যে কেন আমাকে কিডন্যাপ করবে কেউ?’

ঠিক কথাই বলেছে মেয়েটা। ওই ডেটার জন্য হামলা করবার কথা নয় কারও।

‘আপনি কি চাইছেন লোকগুলোকে খুঁজে বের করতে?’

‘পুলিশও খুঁজছে,’ বলল রানা। ‘তবে মনে করি না আশপাশে থাকবে তারা। আমার দায়িত্ব ক্যাটাম্যারান আর ওটার ত্রুদের বিষয়ে তথ্য জোগাড় করা। নিশ্চয়ই এমন কোনও তথ্য ওদের

কাছে ছিল, যেটা গোপন করতে চেয়েছে কেউ। বিষয়টা টেম্পারেচার অ্যানোমালির চেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ। যারা তোমাকে কিডন্যাপ করতে চেয়েছে, তাদেরকে ধরতে পারলে হয়তো জরুরি সূত্র পাব।’

‘আমাকে সাহায্য করতে দিন,’ অনুরোধের সুরে বলল জ্যাসিস্টা।

এ কথা বলবে মেয়েটা, আগেই ধারণা করেছে রানা। আশ্তে করে মাথা নাড়ল। ‘সম্ভব নয়। এটা সাধারণ কোনও সায়েন্স প্রজেক্ট নয়। মস্ত কোনও বিপদ হতে পারে।’

টোঁট মুড়িয়ে কী যেন ভাবছে মেয়েটা। মনে হলো কেঁদে ফেলবে। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড পর শান্ত স্বরে বলল, ‘আমার ভাই হারিয়ে গেছে, মিস্টার রানা। হয়তো চিরকালের জন্যেই। আপনি বা আমি এটা জানি। ...আপনি কি কখনও হাওয়াই দ্বীপে গেছেন? চারপাশে সাগর। অপূর্ব সুন্দর, তেমনি ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। আর আগেও প্রিয় মানুষকে হারিয়ে যেতে দেখেছি। সার্ফিং করতে গিয়ে, সেইলিং করতে গিয়ে, বা ডাইভিং করতে গিয়ে। সাগর যদি জ্যাকোকে নিজের বুকে লুকিয়ে ফেলে থাকে, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু কোনও লোক যদি ওকে খুন করে থাকে, অনেক বেশি কষ্ট পাব। সেটা মেনে নিতে পারব না। আর সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নিতে চাইব। সেটা করতে গিয়ে খুন হতেও দ্বিধা নেই।’

‘বুঝতে পারছি, মানসিক চাপের মধ্যে আছ তুমি,’ বলল রানা। ‘আর এ-ও বুঝছি, পরিস্থিতি ভাল হওয়ার আগে আরও অনেক খারাপ হতে পারে।’

‘সেজন্যেই কিছু না কিছু করতে হবে আমাকে,’ ভিখারিনীর মত শোনাৎল মেয়েটার অনুরোধ, ‘আমাকে সঙ্গে রাখুন।’

বাধ্য হয়েই এবার একটু কঠোর হলো রানা। ‘আমার অভিজ্ঞতা বলছে, এই মুহূর্তে অস্থিতিশীল মানসিক অবস্থায় আছ

ভূমি। কী করবে বা কী করা উচিত, ভাল করে বুঝ না। তোমার প্রভাব পড়বে দলের সবার ওপর। বড় কোনও ভুলে মারাও পড়তে পারো, কিংবা তোমার কারণে আমরাও। সরি, জ্যাসিস্টা, তোমাকে আমাদের দলে নিতে পারব না।’

‘বেশ,’ সহজ সুরে বলল মেয়েটা। ‘তবে মনে রাখবেন, আমি নিজেই তদন্ত করব। বসে বসে চোখের পানি ফেলার ইচ্ছে আমার নেই। যা করার নিজেই করব।’

‘কী করবে ভাবছ?’

‘আপনি যদি সঙ্গে নিতে না চান, ভাল কথা। কিন্তু কোনও ধরনের বাধা দিতে চাইলে, উল্টো আমিও ঝামেলা করব। আর আমার তদন্তের কারণে যদি আপনাদের কোনও সমস্যা হয়, তার দায় আপনাদেরকেই নিতে হবে।’

বড় করে দম নিল রানা। যে-মেয়ের একমাত্র ভাই দু’এক দিন আগে হারিয়ে গেছে সাগরে, তাকে কড়া কথা বলা কঠিন। তবে বাধ্য হলে তাই করবে, ঠিক করল ও। এই মেয়ে যা বলেছে, প্রতিটা কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে। সমস্যা হচ্ছে: এ জানেই না ডুব দিতে চাইছে কত বড় বিপদে।

এক রোগীকে ছেড়ে দিয়ে এক্সরে ফিল্ম দেখল ডাক্তার। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, ‘আপনার বড় কোনও আঘাত নেই, মিস কাপুল। ত্বক ছড়ে গেছে, কিন্তু হাড় ভাঙেনি। কয়েক দিনের ভেতর ঠিক হয়ে যাবে সব।’

‘বুঝতে পারলেন?’ রানার দিকে চাইল জ্যাসিস্টা। উত্তরটা নিজেই দিল, ‘আমি লাজুক লতা নই যে টোকা পড়লেই শেষ হয়ে যাব।’

‘কপালটাও ভাল ছিল,’ বিরক্ত সুরে বলল রানা।

‘কপাল ভাল থাকা মোটেই মন্দ নয়।’

অবাক হয়ে দু’জনকে দেখছে ডাক্তার। বুঝতে পারছে না এরা

কী নিয়ে কথা বলছে। সামান্য দ্বিধা করে বলল, ‘কপাল ভাল থাকা সত্যিই খুব জরুরি।’

‘আপনি দেখছি আমার কাজ আরও কঠিন করে তুলছেন, ডাক্তার,’ মনে মনে বলল রানা। বুঝে গেছে, এ মেয়েকে ঘাড় থেকে নামানো সহজ হবে না। এমন তো নয় যে ঘরে তালা মেরে রেখে নিশ্চিত হবে। একে বিপদ থেকে বাঁচাতে গিয়ে বিমানেও তুলে দেয়া যাবে না। ফোঁস করে আপত্তি তুলবে বনবিড়ালীর মত। শেষে মালদ্বীপের কর্তৃপক্ষের কাছেও ওদের নামে নালিশ করে বসতে পারে।

বিরক্তি চেপে মুখে বলল রানা, ‘বেশ, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারো।’

‘আমি কোনও ঝামেলা করব না,’ কথা দিল মেয়েটা।

‘শুরু থেকে যদিও তা-ই করছ,’ বিড়বিড় করল রানা।

সাত মিনিট পর হাসপাতালের লোকজনের চোখের সামনে ভাঙা ভেসপায় মেয়েটাকে চাপিয়ে দিল রানা, নিজে সামনে বসে রওনা হয়ে গেল দূরের ডক লক্ষ্য করে। এখন চলেছে অনেক ধীর গতিতে।

প্রায় অক্ষত শরীর নিয়েই ফিরল ডকে।

প্রিয় ভেসপার অবস্থা দেখে হায়-হায় করে উঠল গার্ড।

বেচারি যে-কোনও সময়ে কেঁদে ফেলবে দেখে রানা কথা দিল, মেরামত করে দেয়া হবে তার দ্বি-চক্রযান। যদি আগের মত ঠিক না হয়, নতুন ভেসপা কিনে দেবে নুমা।

গার্ডের সন্দেহ দূর করতে ওকে দিয়ে দিল রানা দামি হাতঘড়িটা। ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর ওটা ফেরত পাবে।

সন্দেহ নিয়ে হাতঘড়ির দিকে চাইল গার্ড।

রানার মন চাইল ধমক দিতে, মনে মনে বলল, আরে, ব্যাটা, ওটার দাম তোর ভেসপার দশ গুণ। গত জন্মদিনে বিসিআই চিফ

দিয়েছিলেন ওই গোল্ড প্লেটেড রোলেক্স ।

জ্যাসিষ্টাকে নিয়ে আবারও ক্যাটাম্যারানে উঠে রেজাদের সঙ্গে মেয়েটার পরিচয় করিয়ে দিল রানা ।

কয়েক সেকেন্ড পর নীচ থেকে উঠে এল সোহেল । ওর সম্পর্কে রানা বলল, ‘ইনি সোহেল আহমেদ । আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং সহকর্মী । তোমার নিত্যসঙ্গী হতে চলেছে ।’

জ্যাসিষ্টার সঙ্গে হাত মেলান সোহেল । ভুরু কুঁচকে বলল, ‘জ্যাকোর বোনকে দলে নিতে আপত্তি নেই আমার । কিন্তু ওর নিত্যসঙ্গী হলাম কী করে?’

‘তোর নতুন ডিউটি ওকে আগলে রাখা,’ বিরস মুখে বলল রানা । “‘নিত্যসঙ্গী” শব্দটা ব্যবহার করলাম “দেহরক্ষী”র পরিবর্তে । বুঝেছিস? আসল কথা, ও যাতে আমাদের কাউকে ঝামেলায় ফেলতে না পারে, সেটা দেখবি তুই ।’

‘ও । আগে কখনও প্রথম পরিচয়ে কারও নিত্যসঙ্গী হইনি,’ বিড়বিড় করল সোহেল ।

‘প্রথম ঋলে একটা কথা আছে না?’ বলল রানা । ‘এবার কাজের কথায় আসা যাক । আরও কী জানা গেল?’

‘আমার তরফ থেকে তেমন কিছুই না,’ বলল সোহেল । ‘বোটের পাওয়ার ঠিক করেছি । যদিও ব্যাটারির জোর নেই বললেই চলে । সোলার প্যানেল আর উইণ্ডমিলের জোরে কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে ।’

‘নতুন আর কিছুই জানা যায়নি?’

‘সোহেল যখন এসব কাজে ব্যস্ত, তখন জিপিএস-এর ট্র্যাকিং মোড আবারও অ্যাক্সেস করতে পেরেছি,’ জানাল আসিফ । ‘পশ্চিমে ভেসে যাচ্ছিল বোট । পরে মালদ্বীপ থেকে রওনা হওয়া বিমান ওটাকে দেখতে পেয়েছে । ক্যাটাম্যারানের কোর্স বা গতি মাতালের মত ছিল ।’

‘আঁচ করতে পারিস, কেন এমন হয়েছিল?’

‘খেতে বসেছে, তখনই সমস্যা শুরু হয়,’ বলল আসিফ।
‘আগুনে পুড়ে গেছে পালের এক অংশ। আর ওই আগুনের
কারণেই নষ্ট হয়েছে বোটের খোল। গতিও অন্যরকম হয়ে গেছে।
তারপর থেকে ভেসে গেছে নিজে থেকেই।’

‘সে সময় কোথায় ছিল ওরা?’

‘এখান থেকে চার শ’ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে।’

‘আর কিছু?’

‘বোটের লগে সবই ঠিক-ঠাক। বিশেষ কোনও জরুরি নোট
বা কমপিউটারের ফাইলেও নতুন কিছু নেই।’ কাঁধ ঝাঁকাল
আসিফ। ‘কিন্তু তানিয়া একটা জিনিস পেয়েছে। ওটা তোকে
আগ্রহী করে তুলতে পারে।’

তানিয়ার দিকে চাইল রানা।

উঁচু করে কাঁচের একটা বিকার দেখাল আসিফের বউ।
ভিতরে কয়লার মত কালো রঙের পানি।

‘আগুনের পর এই জিনিস পাওয়া গেছে। আপনিই কালচে
আঠালো জিনিসটা পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন। ডিসটিল্ড
ওঅটরের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছি। আগুনে পোড়া জিনিসে
সাধারণত কার্বন থাকে। এখানেও তাই হয়েছে। এই জিনিসের
ভেতর বেশ কয়েকটা ধাতু আছে। টিন, লোহা, রূপা এমন কী
সামান্য পরিমাণে সোনাও। একই সঙ্গে এত ধাতু আসলে পাওয়া
যায় না কোনও কিছুতে।’

কাছ থেকে বিকারের পানি দেখল রানা। পানিতে কী যেন
আছে, একটু চকচক করছে।

‘জিনিসটা কী?’

‘আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ নেই, থাকলে
হয়তো বুঝতাম,’ বলল তানিয়া। ‘সোহেল ভাই পাওয়ার ফিরিয়ে

আনার পর ছবি তুলেছি। জিনিসটা যা-ই হোক, নড়ছে আপনা-আপনি।’

‘আপনা-আপনি নড়ছে মানে?’ জানতে চাইল রানা।

‘ওগুলোর যেন প্রাণ আছে,’ বলল তানিয়া। ‘কার্বন আর পোড়া অংশ ঠিক আছে, কিন্তু জিনিসগুলোকে জীবিত বলেই মনে হচ্ছে। যা-ই হোক, এতই ছোট, আমাদের মাইক্রোস্কোপে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না।’

কথাটা শুনে কেমন যেন অস্বস্তির ভিতর পড়ে গেল জ্যাসিস্টা কাপুল। ওর ভাবান্তর খেয়াল করেছে রানা, ঠিক করল পরে এ নিয়ে কথা বলবে। আগেই তো চুক্তি হয়েছে, ভাইয়ের হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ের সঙ্গে জড়িত অনেক অস্বস্তিকর কথা শুনতে হবে তাকে। এখনও সময় আছে, নিজেকে সরিয়ে নিতে পারে।

‘তুমি কি কোনও ব্যাকটেরিয়া বা কোনও মাইক্রোঅর্গানিজম নিয়ে ভাবছ?’ জানতে চাইল রানা।

‘তেমন কিছু হতে পারে,’ বলল তানিয়া। ‘তবে ভালভাবে না দেখে কিছুই বলা উচিত হবে না।’

চুপ হয়ে গেল রানা। ভাবতে শুরু করেছে: অদ্ভুত কাণ্ড! কিছুই জানতে পারেনি সোহেল, আসিফ বা তানিয়া। শুধু জানে, পোড়া বোটে পেয়েছে সামান্য কিছু স্যাম্পল। জিনিসটা কী, তাও জানা নেই কারও।

‘ওটা যা-ই হোক, অদ্ভুত কিছু হবে,’ বলল রানা। তানিয়ার দিকে চাইল, ‘ওটার কারণে আগুন ধরে থাকতে পারে?’

‘আমি পোড়াতে চেষ্টা করেছি,’ বলল তানিয়া। ‘দাহ্য কিছু না। সব অক্সিডাইজ কার্বন আর ধাতু।’

‘এসবের জন্য যদি আগুন না ধরে থাকে, তো বোট পুড়ল কী কারণে?’

আসিফের দিকে চাইল তানিয়া। আসিফ আবার চাইল

সোহেলের দিকে। ওরা কেউ যেন জানাতে চাইছে না খারাপ সংবাদ।

কয়েক সেকেণ্ড পর মুখ খুলল সোহেল, ‘অকটেনের কারণে আগুন ধরেছে বোটে। পাঁচ গ্যালনের দুটো অকটেন ট্যাঙ্ক ছিল মেনিফেস্টে, কিন্তু ও দুটো কোথাও পাইনি আমরা।’

চট করে হিসাব মিলিয়ে ফেলল রানা।

‘ক্লুদের কেউ আগুন জ্বেলে দিয়েছে।’

আস্তে করে মাথা দোলাল সোহেল। ‘আমরাও তা-ই ভাবছি।’

ঘুরে জ্যাসিণ্টার দিকে চাইল তানিয়া। বুঝতে চাইছে, এই খবর সামলে নিতে পারবে কি না মেয়েটা। নিচু স্বরে বলল, ‘আমরা সত্যিই দুঃখিত, জ্যাসিণ্টা।’

‘না, ঠিক আছে,’ শুকনো কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

‘কিন্তু কী কারণে নিজেদের বোটে আগুন ধরিয়ে দেবে?’ প্রশ্ন তুলল রানা।

‘মাত্র দুটো কারণ ভাবতে পেরেছি আমরা,’ বলল তানিয়া। ‘হয় ব্যাপারটা ছিল অ্যাক্সিডেন্ট, অথবা বোটে এমন কিছু ছিল, যেটা আগুনের চেয়েও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল।’

‘ওই পোড়া অবশিষ্ট জিনিস,’ বলল রানা, ‘অথবা ওগুলোর ভেতরের কিছুর জন্যে আগুন দিতে হয়েছে বোটে। তোমাদের কি মনে হয়, জিনিসগুলোর হাত থেকে বাঁচতেই...’

‘আমরা আসলে জানি না,’ বলল তানিয়া। ‘আগে বুঝতে হবে জিনিসগুলো কী।’

‘মেনে নেয়া কঠিন যে এসব পোড়া জিনিস ঘনিয়ে এনেছে বিপদ,’ বলল আসিফ। ‘কিন্তু তানিয়া আর আমি এখানকার ইউনিভার্সিটির এক প্রফেসরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। আধঘণ্টা পর দেখা করব তাঁর সঙ্গে। তিনি হয়তো বলতে পারবেন এসব স্যাম্পল আসলে কী।’

‘বুঝলাম,’ বলল রানা। বাম হাত উপরে তুলল সময় দেখতে, পর মুহূর্তে মনে পড়ল বেহাত হয়ে গেছে ঘড়ি।

‘কয়টা বাজে?’

‘সোয়া একটা,’ বলল আসিফ।

‘ঠিক আছে, জ্যাসিটাকে নিয়ে হোটеле ফিরব সোহেল আর আমি। আলাপ করব আমাদের বস আর নুমা চিফের সঙ্গে। তোরা দেখা করে আয় প্রফেসরের সঙ্গে। হয়তো জরুরি কিছু জানা যাবে। ...আর একটা কথা, খুব সাবধান থাকিস তোরা।’

দশ

সৈকতের কাছ থেকে বাসে উঠে কিছুক্ষণের ভিতর মালদ্বীপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছে পৌঁছে গেল তানিয়া আর আসিফ রেজা। বাসের শেষ স্টপেজ বিলাবং স্টেশন। ওখানে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে নেমে পড়ল ওরা। কয়েকজনের আলাপ শুনল, ছেলেগুলো ভাবছে দিনের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অব্যাহতি নিয়ে ভর্তি হবে রাতের শিফটে।

‘আবারও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলে কেমন লাগত তোমার?’ স্বামীর কাছে জিজ্ঞেস করল তানিয়া, হাসছে।

‘রাজি আছি, যদি তুমিও আমার সঙ্গে ভর্তি হও,’ বলল আসিফ।

‘ভর্তি হয়েও যেতে পারি।’

ইউনিভার্সিটির ফটক পেরিয়ে একটু হেঁটে দালানে ঢুকে পড়ল

ওরা। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বরগ্রাম থেকে শুরু করে শরিয়া আইন হোক বা ইঞ্জিনিয়ারিং, স্থাপত্য বা হেলথ কেয়ার— সব ধরনের শিক্ষাই দেয়া হয়। ম্যারিটাইম ইঞ্জিনিয়ারিং রীতিমত বিশ্বমানের। এর কারণ বোধহয়, গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য সাগরে ডুবতে শুরু করেছে তাদের দেশ। ভাবছে, হয়তো কোনও পথে রক্ষা করা যাবে মালদ্বীপকে।

ম্যারিটাইম স্কুলের এক কলিগ ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। ভাল করেই নুমার কাজ সম্পর্কে জানে সে। পরিচয় করিয়ে দিল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের এক প্রফেসরের সঙ্গে।

লাল শাড়ি পরেছেন মহিলা। নাম ডক্টর আরিফা খাতুন।

‘আমাদের সময় দিলেন বলে ধন্যবাদ,’ বলল তানিয়া।

ওর দুই হাত নিজের হাতে নিলেন প্রফেসর। মিষ্টি করে হেসে বললেন, ‘সাগর আর মরুভূমিতে অতিথিকে কখনও ফিরিয়ে দেয়া হয় না। আর সত্যিই যদি মালে দ্বীপের কোনও বিপদ হতে পারে ভেবে থাকেন, সেক্ষেত্রে স্বার্থপরের মত বিপদকে উড়িয়ে দেয়া হতো আমার মস্ত বড় ভুল।’

‘বিপদ হবে কি না, তা আমরা এখনও নিশ্চিত নই,’ বলল তানিয়া। ‘তবে বুঝতে পারছি, বড় ধরনের সমস্যা আছে কোথাও। আর আপনি হয়তো তা শনাক্ত করতে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন।’

ডক্টর খাতুন বললেন, ‘তো চলুন, দেরি না করে কাজে নামা যাক।’

ওদেরকে একটা ল্যাবোরেটরিতে নিয়ে এলেন মহিলা। প্রস্তুত করে নেয়া হলো স্ক্যানিং মাইক্রোস্কোপ। সবুজ একটা প্যানেল দেখিয়ে দিল প্রতিটি সিস্টেম ঠিকভাবে কাজ করছে।

‘জিনিসটা দিন,’ বললেন প্রফেসর।

স্যাম্পলের ভায়াল তাঁর হাতে দিল তানিয়া। খুব সতর্কভাবে

জিনিসটা বিশেষ ট্রে-তে রাখলেন প্রফেসর। ঢুকিয়ে দিলেন স্ক্যানিং কমপার্টমেন্টের ভিতর।

যে ইমেজ এল, তা বিদঘুটে। থমকে গেলেন প্রফেসর। একই সমান অবাক হয়েছে তানিয়া-আসিফ। ভুরু কুঁচকে জিনিসটা আবারও দেখল তানিয়া। হাঁ হয়ে গেছে আসিফ। নিজের হাই পাওয়ারের চশমা ঠিক-ঠাক করে নিলেন প্রফেসর আরিফা খাতুন। আরও গভীর মনোযোগে জিনিসটা দেখলেন।

‘এসব আসলে কী?’ মনিটরের দিকে চেয়ে জানতে চাইল আসিফ।

‘ধুলোর পোকা বলে মনে হচ্ছে,’ বলল তানিয়া, ‘সাধারণ ডাস্ট মাইট।’

‘এখনও নিশ্চিত নই,’ বললেন ডক্টর খাতুন, ‘ম্যাগনিফিকেশন বাড়িয়ে দেখি কী পাওয়া যায়।’

ভারী শরীরের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ সামান্য খর-খর আওয়াজ তুলল, নতুন করে আরেকটা স্ক্যান করেছে। মনিটরে এবারের দৃশ্য দেখে আরও বিস্মিত হলো ওরা।

আসিফ ও তানিয়ার দিকে ঘুরলেন প্রফেসর। ‘জানি না কী বলা উচিত,’ ধীর ভঙ্গিতে বললেন, ‘বাবার জন্মেও এমন জিনিস দেখিনি।’

আসিফ-তানিয়াকে ইউনিভার্সিটির দিকে রওনা করিয়ে দিয়ে সোহেল আর জ্যাসিন্টাকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েছে রানা, বিদায় নিয়ে ঢুকে পড়েছে নিজের ঘরে। দেরি না করে হারিয়ে যাওয়া ড্রুদের ব্যক্তিগত জিনিস ঘাঁটতে শুরু করেছে। খচখচ করছে মন। অন্যের জিনিস ঘাঁটা অনেকটা কবর থেকে মানুষের হাড় চুরি করবার মত। তবে যা কর্তব্য তা করতেই হবে। কোথাও হয়তো রয়ে গেছে জরুরি কুঁ।

একঘণ্টা পর প্রায় হাল ছেড়ে দিল রানা। কোনও সূত্র নেই যে এগোতে পারবে। অবশ্য, এমন একটা জিনিস পাওয়া গেল, যেটার মূল্য জ্যাসিন্টার কাছে অনেক। ওটা ত্রুদের একটা ছবি। মাঝে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকো কাপুল। খুশি হয়ে হাসছে। খেয়ালই নেই কোনও দিকে।

জিনিসগুলো সরিয়ে রেখে শুধু ছবিটা হাতে করিডরে বেরিয়ে এল রানা, পৌছে গেল পরের দরজার কাছে। পাশাপাশি দুই ঘরের ওই সুইটে উঠেছে জ্যাসিন্টা। ওকে পাহারা দিচ্ছে সোহেল।

দরজায় নক করল রানা।

পাঁচ সেকেন্ড পর ঘুরতে লাগল নব, দরজা খুলে গেল, কিন্তু সামনে কেউ নেই। কবাটের আড়াল থেকে উঁকি দিল সোহেল, হাতে পিস্তল। অন্য কেউ নয়, রানাই এসেছে তা নিশ্চিত হয়ে কোমরে গুঁজল অস্ত্র। ঠোঁটে আঙুল রাখল। নিচু স্বরে বলল, ‘মেয়েটা ধ্যানে বসেছে। এভাবেই নাকি দুনিয়ার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রাখে।’

ঘরে ঢুকল রানা। ‘ভাল, তুই নিজে তো জীবনেও কোনও কিছুর ভারসাম্য রাখতে পারলি না।’

পান্তা দিল না সোহেল। ‘কয়েক মিনিট পর পর নাকি খামোকা রেগে উঠছে। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। নিজেকে পাগল পাগল লাগছে-।’

‘শেষের কথাটা আমি বলিনি,’ ওদিকের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে জ্যাসিন্টা।

ওকে শান্ত বলেই মনে হলো রানার।

খুক-খুক করে কাশল সোহেল, উদাস।

‘আগের চেয়ে অনেক স্থির করে নিয়েছি মন,’ বলল জ্যাসিন্টা। ‘আসলে কী হয়েছে জানলে স্ফোভও কমবে। আমাকে সঙ্গে রাখছেন তাই আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ...পেলেন

কোনও সূত্র?’

‘এখনও না,’ বলল রানা। ‘কিন্তু কিছু ব্যাপার মিলছে না।’

‘সেগুলো কী ধরনের?’

‘জ্যাকো আর অন্যরা টেম্পারেচার অ্যানোমালির দিকে মনোযোগ দিয়েছিল,’ বলল রানা। ‘তাপমাত্রার অস্বাভাবিকতা ওরা ধরতে পেরেছিল, কিন্তু আবিষ্কার করতে পারেনি তার কারণ। আসলে পুরো পৃথিবীর সাগরের তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করেছে। কিন্তু ওরা জেনেছিল, মৌসুমী বায়ু আর সাগরের স্রোতের কারণে কমে গিয়েছিল ওখানে তাপমাত্রা। ওই তথ্য বড় একটা রহস্য।’

‘আর কী পেয়েছিল ওরা?’

‘সাগরের তাপ কমে যাওয়া সবার জন্যেই ভাল। শীতল তাপমাত্রার কারণে সাগরে বেশি মেশে অক্সিজেন। অনেক বেশি জন্মায় জলচর প্রাণী। ক্যারাবিয়ান সাগরের মত গরম আর অগভীর অঞ্চলে মাছ বা অন্যসব প্রাণী কম থাকে। অথচ, অঙ্ককার আর শীতল অ্যাটলান্টিকে মেলে লাখে লাখে মাছ। মৎস্য-শিকারি জাহাজের মাধ্যমে সাগর থেকেই দেশগুলো মিটিয়ে নিতে পারে তাদের প্রোটিনের চাহিদা।’

মাথা দোলাল জ্যাসিন্টা।

রানা বুঝে গেল, অতি সাধারণ ডেটা দিচ্ছে। এসব ভাল করেই জানে মেয়েটা। কিন্তু এর বেশি কিছু বলারও নেই। কোনও সূত্র নেই।

‘কিন্তু জ্যাকো বলেছিল, ওরা দেখেছে সাগরের ওদিকে অনেক কমে গেছে অক্সিজেন,’ বলল জ্যাসিন্টা। ‘আর তাপমাত্রা কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্লভ হয়ে ওঠে ত্রিল, প্ল্যাঙ্কটন বা মাছ।’

‘তা-ই আসলে,’ বলল রানা। ‘উল্টো ঘটনা ঘটছে ওখানে। অবশ্য, অন্য ব্যাপারও হতে পারে। কিছু হয়তো শুঁষে নিচ্ছে তাপ। আর অক্সিজেন।’

‘জিনিসটা কী হতে পারে, ভেবেছেন?’ জানতে চাইল জ্যাসিণ্টা। ‘টেক্সিক আরজনা? কোনও অ্যান্যারোবিক কম্পাউণ্ড?’

ডেটা দেখবার পর থেকেই মাথা খাটাতে শুরু করেছে রানা। জানে না কী জন্য কমছে তাপমাত্রা। ভলক্যানিক অ্যাক্টিভিটি, রেড টাইড, অ্যালগি ব্লুম্— এসবের কারণে হ্রাস পেতে পারে অক্সিজেন। কিন্তু ব্যাখ্যা নেই তাপমাত্রা কমে যাওয়ার। কখনও কখনও সাগরের গভীর থেকে উঠে আসে ঠাণ্ডা পানি, কিন্তু তার ভিতর থাকে প্রচুর অক্সিজেন। নতুন করে জেগে ওঠে সাগরের প্রাণিকুল।

এই রহস্য সত্যি জটিল, আর তা উদ্ঘাটন করতে চেয়েছিল বলেই হয়তো প্রাণ দিতে হয়েছে জ্যাকো, টিনা আর জনসনকে। কোনোভাবেই তাপমাত্রা হ্রাসের সঙ্গে ওদের হারিয়ে যাওয়ার সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

‘আসলে কী ঘটেছে, এখনও জানি না,’ স্বীকার করল রানা। ‘ওদের পাঠানো প্রতিটি ডেটা খুঁটিয়ে দেখেছি। সরি, তোমাকে পাঠানো ই-মেইলও বাদ দিইনি। কিন্তু সব শেষে এখনও খাতার পাতা সাদা।’

ফ্যাকাসে হয়ে গেছে জ্যাসিণ্টা। জানতে চাইল, ‘আপনি আমার ই-মেইলও ঘেঁটেছেন?’

‘উপায় ছিল না,’ বলল রানা। ‘হয়তো ওগুলোর ভেতর পেয়ে যেতাম জরুরি তথ্য।’

‘পেয়েছেন কিছু?’

‘না। পাব এমনও ভাবিনি। কিন্তু প্রতিটি পাথর উল্টে দেখতে হচ্ছে আমাকে।’

বড় করে দম নিল জ্যাসিণ্টা, ঝুঁকে গেল দুই কাঁধ। ‘আমরা হয়তো ভুল করছি। আন্তর্জাতিক কোনও সংগঠনের হাতে তদন্তের দায়িত্ব তুলে দেয়া উচিত।’

‘দুই ঘণ্টা আগেও কিন্তু দৃঢ় ছিলে তুমি,’ বলল রানা।

‘আমি রেগে গিয়েছিলাম। এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছি। অনুরোধ করলে হয়তো তদন্ত করবে ইউএন বা মালদ্বীপ ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোর্স। আর সেক্ষেত্রে যার যার বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল। আপনাদের সবার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর, এখন মনে হচ্ছে, আরও মানুষ হারিয়ে যাবে, তা সহ্য করতে পারব না।’

‘তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না,’ বলল রানা। ‘নুমা নিজেদের তদন্ত নিজেরাই করে। অবশ্য, তুমি চাইলে ফিরে যেতে পারো। তাতে খুশিই হব আমরা। বিপদ কমবে তাতে।’

কিছু বলতে চাইল জ্যাসিন্টা, কিন্তু তখনই বেজে উঠল রানার মোবাইল ফোন। পকেট থেকে বের করে কল রিসিভ করল রানা।

যোগাযোগ করেছে তানিয়া রেজা।

‘কিছু জানলে?’ জানতে চাইল রানা।

‘খানিকটা,’ বলল মেয়েটা।

‘বলো শুন?’

‘আমি একটা ছবি পাঠিয়েছি ই-মেইলে,’ বলল তানিয়া। ‘মাইক্রোস্কোপের স্ল্যাপশট। ওটা দেখার পর আবারও আলাপ করব আমরা।’

বাটন টিপে মোবাইল ফোনের মেসেজ মোডে গেল রানা, খুলল তানিয়ার পাঠানো ছবি। সাদা-কালো ছবি, কিন্তু ঝকঝক করে পরিষ্কার। জিনিসটাকে কোনও কীট বলে মনে হলো। একই সঙ্গে যান্ত্রিকও লাগছে। কোনাগুলো ধারালো, কোনও খুঁত নেই।

ভুরু কুঁচকে মনোযোগ দিল রানা ছবির দিকে। জিনিসটা ছয় পা-ওয়ালা মাকড়সা যেন। লম্বা ছয়টা বাহু, পিছন অংশ তিমি মাছের লেজের মত। দেহটা থেকে বেরিয়ে আসা বাহুগুলোর শেষ মাথায় কয়েক রকমের থাবা। পিঠে শিরদাঁড়ার মত লম্বা রেখা। সেটার উপরে উঁচু-নিচু কী যেন। শিরদাঁড়ার চেয়ে বেশি মিল

আছে কাঁটা তারের সঙ্গে। অথবা, জিনিসটা যেন তারের প্রিন্ট করা মাইক্রোচিপ।

ভালভাবে দেখলে যে কেউ বলবে, জিনিসটা মেকানিকাল।

‘আসলে কী এটা?’ জানতে চাইল রানা।

‘মাইক্রোনিক রোবট,’ বলল তানিয়া।

‘কী বললে?’

‘জিনিসটা ডাস্ট মাইটের মতই ছোট হলেও আসলে রোবট,’ বলল তানিয়া, ‘অর্গানিক নয়, মেকানিকাল। মাইক্রোমেশিন বা ন্যানোবট। আর আমার স্যাম্পল অনুযায়ী, আগুনে পুড়ে গেছে লাখে লাখে এসব রোবট।’

ছবিটার দিকে চেয়ে রইল রানা। বুঝতে শুরু করেছে কী বলেছে তানিয়া রেজা। মোবাইল ফোন কাত করে ছবিটা দেখাল জ্যাসিন্টাকে।

বোকা-বোকা কণ্ঠে বলল মেয়েটা, ‘এগুলো উঠে পড়েছিল ক্যাটাম্যারানে।’

কথাটা শুনতে পেয়ে বলল তানিয়া, ‘কোটি কোটি।’

ক্যাটাম্যারানে ওদের বলা কথাগুলো মনে পড়ল রানার। ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েই বাধ্য হয়ে নিজেদের বোটে আগুন দিয়েছিল জুরা। রক্ষা পেতে চেয়েছিল ন্যানোবটের কবল থেকে। আগুনে পুড়ে মরাকেও ঢের ভাল বলে মনে হয়েছে ওদের কাছে।

পাশ থেকে ছবিটা দেখল সোহেল। ‘তার মানে বোটে উঠেছিল এরা,’ আনমনে বলল, ‘তাই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেদের শেষ করে দিয়েছে জুরা।’

‘প্রশ্ন হচ্ছে: এগুলো বোটে উঠল কী করে?’ জানতে চাইল রানা।

‘জানি না আমরা,’ বলল তানিয়া।

‘কী কাজ এগুলোর?’ প্রশ্ন তুলল রানা, ‘কী ধরনের কাজ

করে?’

‘তা-ও আমাদের জানা নেই।’

‘এগুলো যদি যন্ত্রই হয়, কেউ না কেউ তৈরি করেছে,’ মন্তব্য করল সোহেল।

‘আমরাও একই কথা ভাবছি,’ বলল তানিয়া। ‘আর সম্ভবত, আমরা জানি কে তৈরি করেছে।’

টিং! আওয়াজ তুলল রানার মোবাইল ফোন। আরেকটা ছবি এসেছে। ওটা খুলল ও। স্ক্রিন জুড়ে এল একটা ম্যাগাযিনের প্রচ্ছদ। ওখানে দেখা গেল বয়স্ক এক লোককে। নেমে আসছে লাল রোলস-রয়েস গাড়ি থেকে। কাঁচা-পাকা চুল পনি টেইল করেছে। চেহারাটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে দাড়ি-গোঁফ। পরনের সুট নেভি ব্লু আরমানি বলেই মনে হলো। অথবা ডাবল-ভেস্টেড ইটালিয়ান কোনও কাট।

‘কে এই লোক?’ জানতে চাইল সোহেল।

তানিয়া ওদিক থেকে বলবার আগেই বলল রানা, ‘রবার্তো ম্যানিনি।’

‘বিলিওনেয়ার,’ তথ্য দিল তানিয়া। ‘ইলেকট্রনিক জিনিয়াস। সবাই বলতে শুরু করেছিল, তিনিই বর্তমান পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানী। মাঝবয়েসে ছিলেন অক্সফোর্ডে ফিজিক্সের অধ্যাপক। তারপর চাকরি ছেড়ে শুরু করেন ব্যবসা। তিনিই প্রথমবার মাইক্রোচিপে প্রিন্ট করেন সার্কিট। আজকাল সবার কাজে আসে এসব। মোবাইল ফোন হোক বা কমপিউটার বা বিমান— এই জিনিস ছাড়া আধুনিক হতে পারত না মানবজাতি। তাঁকে বলা হয় ন্যানোটেকনোলজির ফাদার। সাত বছর আগে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে সব কাজ করবে ন্যানোবট। রক্তনালীর ভেতরের কোলেস্টেরল সরানো থেকে শুরু করে সোনার খনিতে খনন বা সাগরের পানি থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করা— সবই

করবে সেসব ন্যানোবট।’

‘তুমি নিশ্চিত এগুলো মাইক্রোবট বা ন্যানোবট?’ জানতে চাইল রানা।

‘একটু বড় ধরনের,’ বলল তানিয়া। ‘ন্যানোবট কিন্তু ছোটই হয়। এই জিনিস দিয়ে আস্ত পাহাড়ের মাটি বা পাথর সরিয়ে ফেলা যাবে। মাইক্রোস্কোপিক, কিন্তু আমরা যেগুলো দেখছি, প্রতিটা সাধারণগুলোর চেয়ে কয়েক শ’ গুণ বড়।’

ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখছে জ্যাসিস্টা। চাপা স্বরে বলল, ‘তা হলে এই লোকের জন্যেই সমস্যা দেখা দিয়েছে?’

কয়েক সেকেন্ড পর বলল রানা, ‘এসব ন্যানোবট ওই লোকের, কীভাবে প্রমাণ করা যাবে?’

এবার জবাব দিল আসিফ, ‘ইন্টারন্যাশনাল পেটেন্ট ফাইল অনুযায়ী, তাঁর ডিযাইন করা জিনিস এসব ন্যানোবটের মতই।’

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। খেয়াল করল, দুই হাত কচলাতে শুরু করেছে জ্যাসিস্টা।

‘কী ধরনের কাজে ব্যবহার করছে?’ জানতে চাইল রানা। ‘এক্সপেরিমেন্ট?’

‘তেমন কিছু শুনিনি।’

‘সাগরে এল কী করে?’ জানতে চাইল রানা। ‘তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, ওগুলো ক্যাটাম্যারানে উঠল কী করে?’

সামান্য দ্বিধা নিয়ে বলল আসিফ, ‘হয়তো বেরিয়ে গেছে ল্যাব থেকে। চল্লিশ বছর আগে খুনি মৌমাছি নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে এমনই হয়েছিল আমেরিকায়। রবার্তো ম্যানিনি হয়তো অন্য কোনও কাজে লাগিয়েছিলেন। দুনিয়ার কেউ জানত না কী কারণে।’

‘ওই লোকের সঙ্গে দেখা করব আমরা,’ বলল রানা।

‘কিন্তু তিনি বাস করেন ব্যক্তিগত এক দ্বীপে,’ বলল আসিফ।

‘তাতে অসুবিধে নেই, কোথায় থাকে সে?’
‘সেখানেই তো সমস্যা,’ বলল তানিয়া।
একটু অবাক হলো রানা। ‘কেউ জানে না সে কোথায়?’
‘না, কেউ জানে না,’ বলল তানিয়া। ‘কোথায় আছেন কেউ
বলতে পারে না।’

বিস্ময় আরও বাড়ল রানার। ‘কী বলছ, তানিয়া!’
‘মস্ত একটা নকল দ্বীপ তৈরি করে নিয়েছেন ম্যানিনি,’ বলল
আসিফ। ‘নাম দিয়েছেন *দি আইল্যান্ড*। গত বছর ওই দ্বীপ সাগরে
ভাসিয়ে উধাও হয়েছেন। কোনও দেশ যাতে তাঁর কাছ থেকে
ইনকাম ট্যাক্স নিতে না পারে, তাই থাকেন সাগরে।’

‘আমিও এমন কিছুই শুনেছিলাম,’ বলল সোহেল। ‘মনে
হয়েছিল পাবলিসিটি স্টান্ট।’

‘না, তা নয়,’ মাথা নাড়ল জ্যাসিস্টা। ‘সত্যিই সাগরে ঘুরে
বেড়ায়। ছয় মাস আগে একটা পত্রিকায় পড়েছি, ওই দ্বীপ নোঙর
করেছিল মালে দ্বীপের কাছেই কোথাও। জ্যাকো ওটা দেখতে
চেয়েছিল। সুযোগ থাকলে নিশ্চয়ই উঠত।’

‘ঠিক আছে,’ বলল রানা, ‘আসিফ-তানিয়া, তোরা ন্যানোবট
সম্পর্কে খোঁজ-খবর শুরু কর। আমি যোগাযোগ করব আমাদের
বস আর নুমা চিফের সঙ্গে। আগে খুঁজে বের করতে হবে রবার্তো
ম্যানিনির। যাব তার ওখানে। ভাসমান দ্বীপ খুঁজে নিতে খুব
সমস্যা হওয়ার কথা নয়।’

এগারো

চাঁদের রূপালী আলোয় মরুভূমির বুকে হাঁটছে জায়েদ বিন মনযুর।

পাশে হাঁটছে বিশ্বস্ত সঙ্গী খালিফ। সেই ছোটবেলা থেকেই পায়ের নীচের চকচকে এই বালি দেখছে জায়েদ, এখনও ওদিকে চাইলে মনে পড়ে সে-রাতের কথা। হঠাৎ করেই দস্যুরা ওদের মরুদ্যানে এসে খুন করেছিল ওর পরিবারের প্রায় সবাইকে।

কত বছর আগের কথা?

চল্লিশ বছরেরও বেশি।

সে-রাতে অতিথি হয়ে এসে সর্বনাশ করেছিল খুনিগুলো। মা, বোন, ভাই, চাচাত ভাই— কাউকে ছাড়েনি তারা। ওই গাদ্দারি মস্ত একটা শিক্ষা দিয়েছিল ওকে। কখনও বিশ্বাস করতে নেই কাউকে। আর আজ এত বছর পর, আবারও গাদ্দারি করতে চাইছে এক লোক। হুমকি দিয়েছে: বেশি বাড়াবাড়ি করতে এসো না, মিশরের সেরা কমাণ্ডো দল পাঠিয়ে শেষ করে দেব তোমাকে।

ওর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে মিশরের আর্মি চিফ, জেনারেল নাফিস আবিল-বিলের, তবে তা জানে না খালিফ।

‘নাফিস আর যোগাযোগ করেছিল?’ জানতে চাইল জায়েদ। লোকটা কথা দিয়েছিল, ওর প্ল্যান বাস্তবায়নে বিনিয়োগ করবে প্রয়োজনীয় অর্থ।

শীতল রাত, ঝিরঝির করে বইছে হাওয়া।

শান্ত স্বরে বলল খালিফ, ‘আপনি ঠিকই ধারণা করেছেন। নাফিস প্রতিজ্ঞা রাখছে না। এমনতেই তো সব পাবে। আমাদের টাকা দিতে যাবে কেন?’

বহু দূরে পলকের জন্য দেখা গেল আলোর ঝিলিক। ওটা দিগন্তে। উপকূলের কাছে। একের পর এক বজ্রপাত হচ্ছে। কিন্তু এখনও বৃষ্টি বরছে না মরুভূমির উপর। ঠিকই আসবে ওই ঝড়-বৃষ্টি, ভিজিয়ে দেবে মরুভূমি। আর ওটাই প্রমাণ করবে জায়েদের প্ল্যানের কার্যকারিতা। বিজয়ের খুব কাছে পৌঁছে গেছে জায়েদ, অথচ পর্যাপ্ত টাকা না পেলে এখনও সব হাতের নাগালের বাইরে চলে যেতে পারে।

‘নাফিস একটা গান্দার,’ মন্তব্য করল জায়েদ।

‘ওর স্বার্থ অন্য,’ বলল খালিফ। ‘বুঝতে পেরেছে, একটা পয়সা খরচ না করলেও সবই পাবে। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ঠিকই নিয়েছে, তারপর সব পাঠিয়ে দিয়েছে সুইস ব্যাঙ্কে নিজের অ্যাকাউন্টে। তাকে ঠেকাবে কে? ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত অপমান ভাববেন না, জায়েদ।’

‘যারা শপথ ভেঙেছে, তাদের কোমর ভেঙে দিয়েছি আমি,’ শান্ত স্বরে বলল জায়েদ, ‘কী কারণে টাকা দেবে না, বলেছে?’

‘রাজনৈতিক সমস্যার কথা বলেছে,’ বলল খালিফ। ‘পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই দেশের প্রায় সবই দখল করে রেখেছে আর্মি। সব ধরনের বড় ব্যবসা তাদেরই। কিন্তু আপনি তো জানেন, আর্মির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে একদল লোক—মুসলিম ব্রাদারহুড। ক্ষমতা চাই তাদেরও। এ মুহূর্তে আর্মির উচিত হবে না অন্য দেশের কাউকে কোটি কোটি ডলার দেয়া। মার পড়তে পারে সব।’

‘অথচ, আমাদের পরিকল্পনা সফল হলে নানাভাবে উপকৃত হবে তারা,’ তিঙ্ক সুরে বলল জায়েদ। ‘তাদের মরুভূমি হয়ে

উঠবে সবুজ। লক্ষ লক্ষ একর জমি পাবে চাষের জন্যে।’

‘তা ঠিক,’ সায় দিল খালিফ। ‘কিন্তু ওই বৃষ্টি না এলেও খুব ক্ষতি নেই তাদের। নাসের হুদের ওপাশে আসওয়ান ড্যাম, ওটার কারণে যথেষ্ট সেচ দিতে পারছে নিজেদের ক্ষেতে। অন্যদের মত বৃষ্টি পাওয়ার জন্য অতটা আগ্রহী নয় তারা। তা ছাড়া, নার্সিস আবিল-বিল সহজ লোক না। সবই জানা আছে তার। আপনি বৃষ্টি ঝরাতে পারেন। আবার চাইলে বন্ধও করে দিতে পারেন। কিন্তু অন্যদের জন্যে ঝরালে, তার দেশেও পড়বে বৃষ্টি।’

আসলেই এর ব্যত্যয় ঘটাবার উপায় নেই।

‘ও ঠিকই ধরেছে,’ বলল জায়েদ। ‘কিন্তু ওর জানা নেই, এবার ওর গোড়ালি ভেঙে দেব আমি। তখন ছুটে এসে আমার পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে।’

‘সে কিন্তু সত্যিই খুনি কমাণ্ডো বাহিনী পাঠাতে পারে,’ সতর্ক করার ভঙ্গিতে বলল খালিফ। ‘এখন যা-ই করি না কেন, আর ফিরিয়ে আনতে পারব না আমরা তাকে। কোনোভাবেই টাকা দেবে না।’

‘সেক্ষেত্রে প্রতিশোধ নেব আমি।’

অখুশি মনে হলো খালিফকে। ‘আমার মনে হয়, এখন নতুন করে শত্রু তৈরি করা ঠিক হবে না। আগে আমেরিকানদের ঝামেলাটা দূর হোক, তারপর অন্যদিকে নজর দেয়া যাবে। আপনি তো ভাল করেই জানেন, ওই পোড়া সেইল বোটে তারা ন্যানোবটের চিহ্ন পেয়েছে।’

‘হ্যাঁ, তা পেয়েছে,’ বিরক্ত কণ্ঠে বলল জায়েদ, ‘এখন রবার্টো ম্যানিনির পিছু নিয়েছে। তাকেই সন্দেহ করছে।’

‘সহজেই তাকে পেয়ে যাবে,’ বলল খালিফ। ‘শুনেছি নুমার লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর বিশেষ করে বিসিআই থেকে যারা গেছে, তারা কঠিন লোক বলেই ধারণা করছি।’

‘বিজ্ঞানীকে ধরুক গিয়ে, আমাদের কী?’ মৃদু হাসল জায়েদ।

এক সময়ে ওই রবার্টো ম্যানিনি ছিল অক্সফোর্ডে তার প্রফেসর। অনেক কিছুই শিখেছে সে ওই গুণী লোকটার কাছ থেকে। ইচ্ছা ছিল আরও শিখবে, কিন্তু পাগলাটে লোকটা অধ্যাপনা ছেড়ে চলে গেল ব্যবসা করতে। তখন থেকে তার উপর চোখ রেখেছে ও।

জায়েদের কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেছে খালিফ। ‘তাদেরকে ছোট করে দেখা কিন্তু ঠিক হবে না।’

‘ভেবো না, আমাদের দিকে সন্দেহের আঙুল তাক করবে না কেউ। তার চেয়েও বড় কথা, ম্যানিনিকে পাওয়ার পর নিজেরাই শেষ হয়ে যাবে। আপাতত কেউ জানবে না আমরা কী করছি। আর যখন বুঝবে, অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন। এবার অন্য বিষয়ে মনোযোগ দেয়া যাক।’

সামনে দু’জন লোককে দাঁড় করিয়ে রেখেছে জায়েদ বিন মনযুরের একদল লোক। যারা বন্দি, তারা নিজেদেরই লোক ছিল। এখন দড়ি দিয়ে পিঠা-পিঠি করে তাদেরকে বেঁধে রাখা হয়েছে। পাশেই পরিত্যক্ত পুরনো কূপ। হাঁ হয়ে আছে কালো মুখ। ওটাকে ঘিরে এক ফুট উঁচু পোড়া মাটির দেয়াল। উপরে উঁচু A-ফ্রেম। এক সময়ে ওখানে ছিল পুলিশসহ ক্রসবার, দড়িতে ঝুলিয়ে বালতি নামিয়ে দেয়া হতো কূপে।

ভীত দৃষ্টিতে জায়েদের দিকে চাইল দুই বন্দি, মৃদু কাঁপছে হাঁটু। চোখে টলমল করছে অশ্রু।

‘ওরা স্বীকার করেছে ওদের দোষ?’

প্রহরীদের নেতা মাথা নাড়ল।

‘না। বলছে নির্দেশ মত সবই করেছে।’

‘আপনি তুলে আনতে বলেছিলেন মেয়েটাকে,’ কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল একজন। ‘আমরা চেষ্টা করেছি।’

‘তোমাদের বলা হয়েছিল, ওই মেয়ের কারণে যেন পিছু নেয় মাসুদ রানা। আর তখন লোকটাকে তুলে আনতে হবে। কিন্তু তোমরা তা করেনি। উল্টো হুঁদুরের মত তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছ। বার-বার সতর্ক করেছি, কাজটা সারতে হবে গোপনে। কিন্তু কী করলে তোমরা? ডক এলাকার প্রতিটা সিকিউরিটি ক্যামেরা ছবি তুলে রেখেছে তোমাদের। সহজ একটা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছ তোমরা। সেজন্য পেতে হবে কঠোর শাস্তি।’

‘ওই দ্বীপ এতই ছোট, কোথাও লুকানোর জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছে।’

‘এইমাত্র স্বীকার করলে পালিয়ে এসেছ,’ বলল জায়েদ। ‘কাপুরুষের কাজ। এই কাজ যে কেউ করতে পারে। কিন্তু আমার দলে স্থান নেই কোনও কাপুরুষের।’

‘এ কথা ঠিক নয়,’ ভাঙা গলায় বলল লোকটা। ‘শপথ করে বলতে পারি, জায়েদ বিন মনযুর, আমরা কাপুরুষ নই। ফাঁদে পা দেয়নি লোকটা। গায়ের জোরে হেরে গেছি। কাছে পিস্তলও ছিল না।’

‘তার কাছেও ছিল না। আর তোমরা ছিলে দু’জন।’

খালিফের দিকে চাইল জায়েদ। ‘তুমি কী করতে বলো?’

বন্দিদের দিকে চাইল খালিফ।

সবাইকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জায়েদের বিশ্বস্ত অনুচররা।

‘ওদেরকে পঞ্চাশটা করে দোররা মারা হোক,’ বলল খালিফ। ‘তারপর কাল সকালে শরীরে মধু মাখিয়ে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হোক। সারাদিন যদি প্রচণ্ড রোদ আর পিঁপড়ের অত্যাচার সহ্য করে টিকে থাকতে পারে, মাফ পাবে।’

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত ভাবল জায়েদ বিন মনযুর। এই শাস্তি হলে হয়তো খুশি হবে অনেকে, কিন্তু উল্টো ক্ষতিও হতে পারে। কেউ হয়তো ধরে নেবে, দুর্বল হয়ে গেছে জায়েদ।

‘না,’ দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে, ‘মাফের উপায় নেই। ওরা কাপুরুষের মত আমাদেরকে ফেলে দিয়েছে বিপদের মুখে। ক্ষমার প্রশ্নই ওঠে না। তা হলে অন্যরাও গাফিলতি করবে।’

লোকদুটোর কাছাকাছি পৌঁছে গেল জায়েদ। ‘তোমাদের পরিবারের সব দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। আশা করি, তারা তোমাদের মত ভুল করবে না।’

এক পা পিছিয়ে গেল জায়েদ, পরক্ষণে পা তুলে প্রচণ্ড লাথি দিল ডানদিকের লোকটার বুকে। কাত হয়ে কূপের দেয়াল পেরিয়ে গেল লোকটার কোমর। প্রাণের ভয়ে দুই হাতে খামচে ধরতে চাইল পোড়া মাটির দেয়াল। এখনও বুলছে শুধু সঙ্গীর ওজনের কারণে।

দ্বিতীয়জন আর্তি জানাল, ‘না, জায়েদ বিন মনযুর!’ গলা ভেঙে গেল তার, ‘দয়া করুন! মাফ করুন, মালিক!’

দড়াম করে তার মুখে লাথি বসিয়ে দিল জায়েদ।

লোকটার থুতু ও রক্তের সঙ্গে ছিটকে বেরোল ভাঙা দাঁত। হোঁচট খেয়ে পিছনের দেয়াল ডিঙিয়ে পড়ে গেল কূপে। দু’জনই রওনা হলো নীচের দিকে। গভীর, গোলাকার, বদ্ধ জায়গায় শোনা গেল আর্ত চিৎকার। কয়েক সেকেণ্ড পর হাড় ভাঙার মড়াৎ আওয়াজ এল। স্তব্ধ হয়ে গেছে ওদের কণ্ঠ। থমথম করছে চারপাশ।

দলের লোকগুলোর দিকে চাইল জায়েদ, মুখে রাগের ছাপ।

‘এটা কয়তে বাধ্য করেছে ওরা আমাকে,’ বলল গম্ভীর কণ্ঠে, ‘সবাই এ থেকে শিক্ষা নাও। সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করবে। এরপর যে ব্যর্থ হবে, তাকে মরতে হবে খুব ধীরে ধীরে।’

জায়েদের রাগ আর ক্ষমতার দাপট দেখে ভয়ের ছাপ পড়েছে লোকগুলোর মুখে। নতুন করে উপলব্ধি করছে, জায়েদ বিন মনযুর কে, আর কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সে মুহূর্তে।

কঠোর চোখে সবার ওপর নজর বোলাল জায়েদ, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল।

পাশেই খালিফ। তাল রাখতে গিয়ে প্রায় দৌড়াতে হচ্ছে তাকে।

‘আমার মনে হয়, এমন না করে...’

‘আমার কথার উপর দিয়ে কথা বলবে না, খালিফ!’

‘আমি শুধু পরামর্শ দিতে পারি,’ নরম সুরে বলল বৃদ্ধ। ‘নিজের লোকের প্রতি দয়া করুন। ক্রোধ থাকুক শত্রুর প্রতি।’

ক্ষোভ চেপে বলল জায়েদ, ‘যারা আমার লোকসান করবে, তারা আমার শত্রু। আর যারা গান্ধারি করবে, বা আবিল-বিলের মত ভঙ্গ করবে প্রতিশ্রুতি, তাদের রেহাই নেই। মিশরীয় জেনারেল টাকা না দেয়ায় বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা। বাধ্য হয়ে মঙ্গোল ব্যবসায়ী আর সৌদি শেখের কাছ থেকে হাত পেতে চাইতে হয়েছে ফাণ্ড। এই অপমান আমি ভুলব না। এমন ব্যবস্থা নেব, যাতে আবিল-বিল বুঝতে পারে কী ভুল করেছে।’

‘সেক্ষেত্রে কী করতে চান, জায়েদ?’

‘আবিল-বিলের দর্প শুধু আসওয়ান ড্যামের কারণে,’ বলল জায়েদ বিন মনযুর। ‘ওটা যদি না থাকে, নিজেদের পেট ভরাতে পারবে না মিশর। অন্যদের মতই আমাদের দেয়া বৃষ্টি কিনবে তারা। এমন ব্যবস্থা নেব, যাতে ভেঙে পড়ে ওই বাঁধ।’

চুপ করে ভাবছে খালিফ। ঠিকই বলেছে জায়েদ। হিসাবে কোনও ভুল নেই। ভুরু কুঁচকে বলল সে, ‘কী ব্যবস্থা নেবেন?’

‘দেরি করব না,’ বলল জায়েদ, ‘যাক ভেঙে ওই বাঁধ।’

দূরে মরুভূমির বুকে বজ্রপাত হলো। আকাশে ঝিলিক দিল নীলচে আলো। জায়েদের মন বলল, ওই আলো স্টার, তাকেই ইশারা করা হয়েছে আকাশ থেকে।

ওই বিজলি দেখেছে খালিফও। চিন্তিত হয়ে পড়েছে। কয়েক

মুহূর্ত পর বলল, ‘লাখে লাখে মানুষ মরবে। মিশরের বেশিরভাগ লোক বাস করে নীল নদের তীরে।’

‘আবিল-বিলের গাদ্দারির কারণে তাদেরকে পৌছে যেতে হবে বেহেস্তে,’ বলল জায়েদ, ‘জেনারেলের দোষে।’

‘আপনি যা ভাল বোঝেন,’ মাথা দোলাল খালিফ।

বারো

বেল জেট রেঞ্জার হেলিকপ্টারের প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে চুপ করে বসে আছে মাসুদ রানা, সোহেল আহমেদ আর জ্যাসিন্টা কাপুল। পাঁচ হাজার ফুট নীচে ঝিলমিল করছে ভারত মহাসাগর। কপ্টার দ্রুত চললেও স্থির হয়ে আছে পানির বিস্তৃতি। এত উপর থেকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে না বড় ঢেউ, বুঝবার উপায় নেই কিছু নড়ছে। রানার মনে হলো, চকচকে কোনও আয়না দেখছে।

‘খিদে লেগেছে আমার,’ নালিশের সুরে বলল সোহেল। ‘আকাশে উঠলেই পেট চোঁ-চোঁ করে।’

‘ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস কর,’ পরামর্শ দিল রানা, ‘তা হলে নাস্তা করে আসতে পারতি।’

অন্যদের অনেক পরে ঘুম থেকে উঠেছে সোহেল। ততক্ষণে সবার নাস্তা খাওয়া শেষ। পরের দশ মিনিটে ওরা দৌড়ে এসে উঠেছে আমেরিকান নেভির পাইলট জন ব্র্যাডলির হেলিকপ্টারে।

‘কেউ আমাকে ঘুম থেকে তুলে দেয়নি,’ আপত্তির সুরে বলল সোহেল।

‘চেপ্টা করেছিলাম,’ বলল রানা। ‘তুই পাশ ফিরে আবারও ঘুমিয়ে গেলি।’

জানালা দিয়ে নীচে চেয়ে রইল সোহেল।

সময় পার করতে খুনসুটি করছে সোহেল, জানে রানা। ওরা কমাণ্ডো ট্রেনিং পাওয়া দক্ষ সোলজার; কখনও এমনও হয়েছে, পর পর তিন দিন না খেয়ে কাটাতে হয়েছে শত্রু এলাকায়। চোখ ফেরাল রানা। ‘ওই দ্যাখ দূরে, দি আইল্যান্ড।’

পাঁচ মাইল দূর থেকেও ওটাকে দেখা গেল পরিষ্কার।

প্রকাণ্ড অয়েল রিগ যেন। অবশ্য, আরও কাছে যাওয়ার পর রানা বুঝল, বহু যত্ন নিয়ে তৈরি করেছে রবার্তো ম্যানিনি তার দ্বীপ। প্রস্থে দুই হাজার, আর দৈর্ঘ্যে পাঁচ হাজার ফুট। বিখ্যাত লেখকরা কল্পনা করেছেন তাঁদের দ্বীপ গোলাকার, কিন্তু ম্যানিনির দ্বীপ অশ্রুর ফোঁটার মত; সামনের দিক সরু, প্রায় গোল হয়েছে পিছনে গিয়ে।

‘অকল্পনীয়,’ বিড়বিড় করে বলল জ্যাসিটা।

‘বিশাল জাহাজ,’ বলল পাইলট ব্র্যাডলি।

‘ওখানে নিশ্চই খাবার আছে,’ হাই চাপল সোহেল।

জ্যাসিটা কাপুলের দিকে চাইল রানা। মেয়েটাকে বিষণ্ণ আর ভীত বলে মনে হলো ওর। জানতে চাইল, ‘ঠিক আছ তো?’

আস্তে করে মাথা দোলাল জ্যাসিটা।

মুখের ভাব দেখে মনে হলো লড়াইয়ের জন্য তৈরি হচ্ছে।

অদ্ভুত দ্বীপের বিষয়ে তথ্য দিয়ে তাকে ভোলাতে চাইল রানা।

‘দ্বীপের সামনের দিকের ওই রিং দেখেছ?’

‘হ্যাঁ।’

‘ওটা ব্রেকওঅটর, স্টিল আর কংক্রিট দিয়ে তৈরি। ওগুলোর পেছনে আছে শক্তিশালী হাইড্রলিক পিস্টন। ম্যাগাযিনে পড়েছি, বড় চেউ এলে পিছিয়ে আসে ব্রেকওঅটর। শক অ্যাবসর্বারের মত

সমস্ত চাপ সহ্য করে নেয় পিস্টন। টেউ পিছিয়ে গেলে আবারও সামনে বেড়ে ঠিক জায়গায় থামে।’

‘দূরে ওগুলো কী?’ আঙুল তুলে দেখাল জ্যাসিস্টা।

আঙুল অনুসরণ করে ওদিকে চাইল রানা।

একপাশে অর্ধচন্দ্রাকৃতি একটা নকল সৈকত। ওদিকের ব্রেকওঅটর টপকে সৈকতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে টেউ। জেটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে কয়েকটা টুইন ইঞ্জিন সি-প্লেন আর কয়েকটা ছোট বোট।

‘ইনলেট মনে হচ্ছে,’ বলল রানা।

‘প্রতিটা দ্বীপে হাবার থাকে,’ মন্তব্য করল সোহেল। ‘হয়তো ওখানেও সৈকতের কাছে রেস্টুরেন্ট আছে।’

‘আমি তো একটাও দেখছি না,’ বলল রানা।

বাঁক নিয়ে নামছে হেলিকপ্টার।

রেডিয়োতে এয়ার কন্ট্রোলারের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেছে পাইলট ব্র্যাডলি।

চট্ করে দ্বীপের দিকে চাইল রানা।

বেশিরভাগ জায়গা এখনও নির্মাণাধীন, বেরিয়ে আছে চকচকে স্টিল। কোনও কোনও জায়গার কাজ প্রায় শেষ। অবশ্য, একেবারে পিছনের দিকের কাজ কমপ্লিট। ওখানে দশতলা পিরামিডের মত দালান। অনেক উপরে ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে হেলিপ্যাড আকৃতির একটা জায়গা। ওটা ব্রিজও হতে পারে।

‘হয়তো এই দ্বীপের জন্যেই খুন হয়ে গেছে জ্যাকো,’ আনমনে বলল জ্যাসিস্টা।

‘অসম্ভব নয়,’ বলল রানা।

‘কিন্তু কোনও কিছুই তো অভাব নেই ম্যানিনির,’ রাগী গলায় বলল জ্যাসিস্টা। ‘এত বড় ভয়ঙ্কর অপরাধ করবে কেন?’

‘সেটাই জানতে চাই আমরা।’

মৃদু মাথা দোলাল জ্যাসিস্টা।

জানালা দিয়ে আবারও চাইল রানা।

ধীরে ধীরে নামছে হেলিকপ্টার। পিছনে পড়ল দ্বীপের অশ্রু
আকৃতির অংশ, ওদিকটাই সবচেয়ে চওড়া। সাগরের দিকে দুটো
জায়গা দেখতে ঠিক তিমি মাছের সাদা লেজের মত, উপরের
দিকে উঠেছে, প্রকাণ্ড ৭৪৭ বিমানের ডানার মত।

ওদিকে চেয়ে রানা বুঝল, ওগুলো আসলে এয়ারফয়েল বা
যান্ত্রিক পাল। বাতাস ধরবে। খেয়াল করল, তখনই সামান্য সরে
গেল ওগুলো।

দ্বীপের মাঝে চারকোনা বড় একটা জায়গা সবুজ। ওখানে
আছে নানান গাছ, ঘাস ও ছোট টিলা। দেখতে নিউ ইয়র্কের
সেন্ট্রাল পার্কের মত, যদিও আকারে অনেক ছোট। চারপাশে
বোনা হয়েছে ফসল।

সামনের দিকে একের পর এক সোলার প্যানেল। চকচক
করছে সূর্যের আলোয়। একটু দূরেই বড়সড় কয়েকটা উইণ্ডমিল,
মৃদু হাওয়ায় ঘুরছে পাখা।

পাইলট ব্র্যাডলি ঘুরে চাইল রানার দিকে।

‘ওরা বলছে নামতে দেবে না।’

এ ধরনের বাধা আসতে পারে, আগেই ভেবেছে রানা।
সেজন্যে ব্যবস্থাও করেছে। ব্যাগ থেকে লম্বা একটা ক্যানিস্টার
বের করে কপ্টারের লেজের কাছে গিয়ে টিপে দিল টিউবের
সুইচ। কপ্টার থেকে গলগল করে বেরোতে লাগল কালো ধোঁয়া।

রানা ভাল করেই জানে, একবার নীচে নামলেই ধরা পড়বে
এই কৌশল। তবে তাতে বড় কোনও ক্ষতিও হবে না।

‘ল্যাণ্ড না করে উপায় নেই, এটা ইমার্জেন্সি,’ গম্ভীর কণ্ঠে
বলল রানা। ‘ওদের বলুন, নামতে না দিলে ক্র্যাশ করব ওদের

দ্বীপের ওপর ।’

রানার বক্তব্য অক্ষরে অক্ষরে এয়ার কন্ট্রোলারকে জানিয়ে
দিল পাইলট ।

অবাক হয়ে রানার দিকে চেয়ে আছে জ্যাসিস্টা ।

‘জানতাম, নামতে দিতে চাইবে না,’ কাঁধ ঝাঁকাল রানা ।

‘আপনি একটা না একটা পথ খুঁজেই নেন, না?’ বলল
জ্যাসিস্টা ।

‘ওকে পুরো চিনলে অবাক হবে,’ বলল সোহেল, ‘সত্যিকারের
ধড়িবাজ লোক ।’

লেজে ধোঁয়া নিয়ে মসৃণভাবে হেলিপ্যাডে নামতে শুরু করেছে
কন্ট্রোলার ।

‘এত ভাল ল্যান্ডিং চাই না,’ পাইলটকে বলল রানা । ‘ঝাঁকি
খেয়ে নামুন ।’

মাথা দোলাল ব্র্যাডলি, নাড়ছে জয়স্টিক । এদিক-ওদিক
দুলতে শুরু করেছে কন্ট্রোলার । সন্দেহ কী, জটিল সমস্যা, নইলে
এভাবে হোঁচট খেয়ে নামে কোনও যান্ত্রিক ফড়িং?

অবশ্য হেলিপ্যাডে ল্যান্ড করার একটু আগে সেরে গেল
ব্যারাম, নিরাপদেই নামল এইচ লেখা হলদে অক্ষরের ওপর ।

হেডসেট খুলে দরজা হাট করে নেমে পড়ল রানা মেঝেতে ।
স্ট্রেচিং করে দূর করতে চাইল পায়ের আড়ষ্টতা । তারই মাঝে
দেখে নিল চারপাশ ।

এদিকটা কোনও দামি রেস্টুরেন্টের ছাতের মত । দূরে দেখা
গেল ভারত মহাসাগর ।

দ্বীপের ডানা বা পাল উঠেছে অন্তত এক শ’ ফুট উপরে ।
গায়ে পুরু ফিতার মত নীল রঙে লেখা: দি আইল্যান্ড ।

বাতাসে কাটা ঘাসের গন্ধ পেল রানা । আরেকটা জিনিস
দেখল, যেটা এখানে দেখবে ভাবতেও পারেনি ।

সবুজ শার্ট, কমলা আলখেল্লা আর বেগুনী প্যান্ট পরে হেঁটে আসছে এক বয়স্ক লোক। পোশাকে ছাপা হলুদ ও লাল ফুল। তাকে রবার্তো ম্যানিনি বলেই মনে হলো। হাঁটবার ভঙ্গিটা নৃত্যরত ময়ূরের মত। নাভি ছুঁয়ে দিয়েছে দীর্ঘ দাড়ি। চোখে লাল সানগ্লাস। সঙ্গে আসছে মাঝবয়সী এক লোক। দেখতে ঠিক ঘাস ফড়িঙের মতই, টিংটিঙে।

‘পাগলা জাদুকরের অদ্ভুত দেশে আরেক পাগল মাসুদ মস্তান,’
বিড়বিড় করল রানা।

টিংটিঙে লোকটার চুল সোনালী, বেণী করে রেখেছে। পরনে কালো, দামি সুট। কাছে এসে অসম্ভব সুরে বলল, ‘প্রফেসর ম্যানিনি, দয়া করে এদেরকে পাস্তা দেবেন না। এদের কোনও অধিকার নেই এখানে আমার।’

রবার্তো ম্যাননিকে একবার দেখে নিয়ে ঘাস ফড়িঙের দিকে চাইল রানা। ‘ইঞ্জিন সমস্যার কারণে এখানে নামতে বাধ্য হয়েছি আমরা।’

প্রফেসর ম্যানিনির পাশ থেকে বলল লোকটা, ‘একেবারে ঠিক সময় বুঝে ইঞ্জিনটা নষ্ট হয়েছে, না?’

‘কপাল ভাল যে এখানে ছিল এই দ্বীপ,’ মধুর হাসি দিল রানা।

‘মিথ্যা বলছে এই লোক,’ কুচুটে সুরে বলল ফড়িং। ‘স্যর, এরা গুপ্তচর। অডিট করতে এসেছে।’

মাথা নাড়লেন প্রফেসর, ঘুরে হাত রাখলেন সঙ্গীর কাঁধে। ‘ছিহ্, এসব বলতে হয় না। উকিল বলেই কি তোমার ওপর যা খুশি তাই বলবার অধিকার বর্তেছে?’ আবার মাথা নাড়লেন পাগলা বিজ্ঞানী। ‘এরা বিপদে পড়ে এসেছে।’ রানার দিকে ফিরলেন। ‘আসলে ইটালিয়ান সরকারের নীচ লোকগুলো... মানে ইনকাম ট্যাক্সের ওই অফিসাররা আতঙ্কিত করে রেখেছে

আমাদের। কিছু হলে প্রথমেই ওদের কথা মনে পড়ে। আমরা ভুলে যেতে শুরু করেছি, সত্যি সত্যি বিপদে পড়তে পারে কেউ। আর সেক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।’

সহকারীর দিকে আবারও ঘুরলেন। ‘এই লোক সেই নরপিশাচ নয়, ফিল হ্যাভেলা। ওই খুনি লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুট। এই লোকই যদি সেই লোক হবে, তো বাড়তি ছয় ইঞ্চি পেল কোথা থেকে? ...তা ছাড়া, ওই বদমাস টাকা আদায় করতে আসবে বোট আর জাহাজে চেপে। ব্যাটার সঙ্গে থাকবে অস্ত্র। লেজে করে আনবে তোমার মত ঝগড়াটে, প্যাঁচালো মনের উকিল আর গোটা দুই খুঁতখুঁতে পিশাচ হিসাবরক্ষক।’

চট করে বিজ্ঞানীকে একবার দেখে নিল উকিল।

জ্যাসিণ্টা কণ্টার থেকে নামতেই ওদিকে মনোযোগ চলে গেল বিজ্ঞানীর।

‘এক্সকিউজ মি,’ বলল রানা, ‘আপনি আসলে কী বিষয়ে আলাপ করছেন?’

‘আর কাদের কথা বলব?’ করুণ চেহারা করলেন ম্যানিনি। ‘আইআরএস টাইপের সংগঠনের লোক তারা! ইউরোপিয়ান ইনকাম ট্যাক্সের অফিসারগুলোর মতই। সব ক’টা কঠিন পাষণ।’

‘একটু খুলে বলুন,’ বলল রানা।

‘দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটা দেশের ইনকাম ট্যাক্স অফিসার তারা,’ বললেন ম্যানিনি। ‘দ্বীপটা নিয়ে ওদিক দিয়ে গেছি বলে সব ক’টা লেগে গেছে আমার পিছনে। আমার সব টাকা কেড়ে নিতে চায়।’

‘ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস?’ নিশ্চিত হতে চাইল রানা, ‘তাদের সঙ্গে আপনার কী?’

‘আমিও তো তাই বলি,’ বললেন বিজ্ঞানী। ‘আমি তো তাদের দুনিয়াতেই নেই। আছি সাগরে, আন্তর্জাতিক পানিতে। ওদের

কোনও সার্ভিস নিই নাকি আমি যে...!’

রানার কাঁধে হাত চাপিয়ে দিলেন ম্যানিনি, এগোতে শুরু করলেন। বাধ্য হয়ে সঙ্গে চলল রানা।

‘এটা আমার রাজ্য। তৈরি করতে খরচ হয়েছে আমার পুরো দুই বিলিয়ন ডলার, কাজ শেষ করতে আরও এক বিলিয়ন লাগবে মনে হচ্ছে। আমি এখানে রাজা। এখানে আমার ওপর দিয়ে কথা বলতে পারে না কেউ। কিন্তু ওই ইনকাম ট্যাক্সের লোকগুলো ট্যারিফ চাইছে। তারা আমাকে বোঝাতে চাইছে, দ্বীপের ওদিকের ওটা আসলে একটা বো। কাজেই এটা আসলে একটা জাহাজ। আমি ওদের পরিষ্কার বলেছি, এটা একটা দ্বীপ। এখানে কোনও দেশের মাতব্বরি চলবে না।’

‘চাইলে বলতে পারেন এটা মঙ্গল গ্রহের অংশ, আপনাকে ঠেকাচ্ছে কে,’ বিরক্ত হয়ে উঠেছে রানা। ‘না, মিস্টার ম্যানিনি, আমি আইআরএস বা অন্য কোনও সংগঠন থেকে আসিনি। কোনও ট্যাক্সও চাই না। আপনার রাজ্যের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বা আপনার ক্ষুরধার মগজের সমস্যা নিয়ে মাথা-ব্যথা নেই আমার। আমরা আছি মস্ত বিপদে, আর সেই বিপদটা তৈরি করেছেন স্বয়ং আপনি।’

থেমে হতভম্ব চোখে রানার দিকে চাইলেন প্রফেসর। ‘আমি? সমস্যা করেছি? এ কী বলছেন!’

‘হ্যাঁ, আপনি,’ জোর দিয়ে বলল রানা।

‘কী ধরনের সমস্যা, বলুন তো?’ বিলিওনেয়ারের প্রশ্ন।

বুক পকেট থেকে ভায়াল বের করে দেখাল রানা। ওটার ভিতর কালচে পানি, মৃদু ছলাৎ আওয়াজ তুলল। ওই মাইক্রোবট ভরা পানি পেয়েছে তানিয়ার কাছ থেকে।

‘খুব ছোট সব মেশিন। আপনিই তৈরি করেছেন এসব। আর এগুলোর কারণে আগুনে পুড়ে গেছে একটা বোট। বোধহয় মারা

পড়েছে কয়েকজন ত্রু ।’

লাল সানগ্লাস খুলে রানার হাত থেকে ভায়াল নিলেন
বিজ্ঞানী । ‘মেশিন? কীসের মেশিন?’

‘ন্যানোবট,’ বলল রানা ।

‘এই ভায়ালের ভেতর?’

মাথা দোলাল রানা । ‘অন্য কেউ আপনার নামে পেটেন্ট না
করে থাকলে এটা আপনার ডিযাইন করা জিনিস ।’

‘হতেই পারে না ।’

অবাক মনে হচ্ছে লোকটাকে দেখে ।

রানা বুঝে গেল, প্রমাণ দিতে হবে ওকে ।

‘এই জিনিস দেখার মত শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপ আছে
আপনার দ্বীপে?’

মাথা দোলালেন রবার্তো ম্যানিনি । ‘কত শক্তিশালী চান?’

‘তা হলে চলুন, আগে আপনার সন্দেহ দূর করি ।’

পাঁচ মিনিট পর বিজ্ঞানীর সঙ্গে এলিভেটরে করে নেমে এল
রানা, সোহেল আর জ্যাসিস্টা ।

সমতল স্তরের নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানী যিরো ডেক । নীচের
তলা থেকে শুরু হয়েছে মাইনাস ওয়ান ডেক, মাইনাস টু ডেক
ইত্যাদি । উপরের প্রথমতলা থেকে শুরু হয়েছে পযিটিভ সংখ্যা ।

সমতলে পৌছেই চেপে বসল ওরা ছয় সিটের গলফ কার্টে ।
চলেছে দ্বীপের সামনের অংশ লক্ষ্য করে । পিছনে রয়ে গেছে
উকিল ফিল হ্যাভেলা । হেলিপ্যাডে তার কন্সটার নিয়ে ব্যস্ত পাইলট
ব্র্যাডলি । ভগ্নি করছে, যান্ত্রিক ফড়িংটা মেরামত করার চেষ্টা
করছে ।

দ্বীপের রাস্তা ধরে যেতে যেতে রানা দেখল, চারপাশে
লোকজন নেই বললেই চলে ।

‘এখানে আপনারা কতজন?’ জানতে চাইল ।

‘এমনিতে পঞ্চাশজন থাকে, কিন্তু এ মাসে সবমিলে দশজন।’

‘মাত্র পঞ্চাশজন নিয়ে এই দ্বীপ চালান?’ চারপাশে চাইল রানা। নানাদিক থেকে আসছে নির্মাণের আওয়াজ। কিন্তু কোথাও দেখা গেল না কর্মীদল। সামান্যতম চেষ্টামেটি নেই।

‘কাজ করছে কারা?’

‘সব অটোমেশন,’ বললেন ম্যানিনি।

ডেবে যাওয়া একটা জায়গার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কার্ট থামালেন বিজ্ঞানী, আঙুল তাক করলেন নিচু জায়গাটার দিকে।

ঝালাই করা হচ্ছে ওখানে। ছিটকে উঠছে কমলা আগুন। খটাখট আওয়াজে গঁথে দেয়া হচ্ছে রিভেট। ‘হুঁইই!’ আওয়াজ তুলে ঘুরছে ইলেকট্রিক স্কু-ড্রাইভার। কিন্তু কোথাও কেউ নেই।

লাফিয়ে উঠল আরও ফুলকি।

দু’ সেকেন্ড পর রানা খেয়াল করল, হাত-পা সমেত ভ্যাকিউম ক্লিনারের মত মোটাসোটা কী যেন ওয়েল্ডিং করছে। আরেক পাশে আরেকটা যন্ত্র, মাকড়সার মত সরসর করে মই বেয়ে উঠে চলে গেল ওপরে।

সিনেমার রোবটের মতই দ্রুত কাজ করছে আরও কিছু যন্ত্র। খানিকটা আড়ষ্ট ভঙ্গি, কিন্তু তাতে কমেনি দক্ষতা। এসব রোবট সত্যিকারের কাজের হতে পারে, কিন্তু ব্যাটারদের কোনও স্টাইল নেই, ভাবল রানা।

হাত-পাওয়ালা ভ্যাকিউম ক্লিনার শেষ করেছে ওয়েল্ডিং। কয়েকটা হাতে জাল্টে ধরল লম্বা একটা খুঁটি, ওটাই তার মই, সাঁই করে উঠে গেল চোখের আড়ালে। রানাদের মেঝে সমতলে উঠে এল আরেকটা মেশিন। তেলাপোকার মত আট পায়ে ভর করে দ্রুত উধাও হলো রাস্তা ধরে। তার পিছু নিল ছোট একটা মেশিন।

‘এরাই আমার কর্মী,’ গর্ব ভরে বললেন বিজ্ঞানী, ‘নানা

আকারের, নানান ডিযাইনের আঠারো শ' রোবট আছে আমার। নির্মাণের কাজে ব্যবহার করছি ওদের। দ্বীপের সবখানে যেতে পারে, মেরামত করতে পারে সবই।'

দ্বীপের সামনের দিকে দেখা গেল জড় হয়েছে বেশ কিছু রোবট। কয়েক সেকেণ্ড পর রওনা হয়ে গেল লাইন ধরে। কোথাও চলেছে।

'টিফিনের সময় বোধহয়?' জানতে চাইল সোহেল।

'ঠিকই ধরেছেন,' বললেন ম্যানিনি, 'পাওয়ার লেভেল কমতেই সময় নষ্ট না করে রসদ নিতে যাচ্ছে। ইলেকট্রিকাল সাপ্লাই নেবে। চার্জ হলেই আবারও ফিরবে কাজে। চব্বিশ ঘণ্টা ব্যস্ত, ছুটি নেয় মাত্র সাতবার। প্রতিবারে পনেরো মিনিট।'

'কখনও দুর্ঘটনার মুখে পড়ে না?' জানতে চাইল সোহেল।

'পড়ে। সেক্ষেত্রে সাহায্যের জন্যে সিগনাল পাঠায়। তখন অন্য রোবট এসে তাকে সরিয়ে নিয়ে যায় কারখানায়। রোবট ডক্টর তাকে মেরামত করে পাঠিয়ে দেয় কাজে।'

'কে বলে দেয় কীসের পর কী করতে হবে?' জানতে চাইল রানা।

'মাস্টার প্রোগ্রাম আছে প্রত্যেকের চিপ্‌স্-এ। তা ছাড়া, ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে নিয়মিত তথ্য পায়। কাজের অগ্রগতি জানায় মূল কমপিউটারকে। ওই কমপিউটারই ওদের মাথা। ওটার নির্দেশে কাজের মান পরখ করে দেখে আরেকদল রোবট।'

'সুপারভাইযার,' বলল সোহেল।

'ঠিকই ধরেছেন,' বললেন ম্যানিনি, 'তাই করে ওরা। এখানে লেবার আর ম্যানেজমেন্টের লড়াই নেই।'

গলফ কার্ট চালু করে রওনা হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী। থামলেন প্রকাণ্ড এক দালানের ভিতর। ওখান থেকে এলিভেটরে উঠল ওরা। তিনতলা নেমে পৌছে গেল মস্ত একটি ল্যাবোরেটরিতে।

চারপাশে চামড়া মোড়া বিলাসবহুল রঙিন সব কাউচ, দেয়ালে দেয়ালে জ্বলছে দামি সব কমপিউটারের স্ক্রিন।

ঘরে হালকা নীল আলো, সামনে এবং পাশে বৃত্তাকার, প্রকাণ্ড জানালা। ওদিকে সাগর দেখা যাচ্ছে। যেন বিশাল এক অ্যাকুয়েরিয়ামে সাঁতার কাটছে ছোটবড় নানান জাতের মাছ।

‘আমরা পানির নীচে,’ মন্তব্য করল সোহেল।

‘পঁচিশ ফুট নীচে,’ বললেন ম্যানিনি। ‘এই পরিবেশ আর এই স্নান আলায়ে মাথা খোলে আমার।’

চারপাশে চোখ বুলিয়ে জ্যাসিস্টা বলল, ‘কেউ গুছিয়ে দেয় না এই ঘর?’

চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পোশাক আর খাবারের ট্রে। একটা টেবিলের উপর গোটা বিশেক বই। বেশিরভাগই খোলা। পিসার টাওয়ারের মত-কাত হয়ে রয়েছে কয়েকটা বই, যে-কোনও মুহূর্তে ধুপ্ করে পড়বে মেঝেতে। ঘরের কোণে ওয়েল্ডিং করছে একটা রোবট।

‘পরিষ্কার টেবিল মানেই ওটার মালিকের মগজে কঠিন সমস্যা আছে,’ নিশ্চিত সুরে বললেন বিজ্ঞানী। ভায়াল থেকে এক ফোঁটা পানি নিয়ে চারকোনা বড় একটা মেশিনের স্লাইডে রাখলেন। পানিটুকু শুষে নেয়া হলো, পরক্ষণে মৃদু হুম-হুম আওয়াজ তুলল মেশিন।

‘তা হলে পৃথিবীর সেরা সুস্থ মগজ আপনার,’ বলে এক গাদা কাগজ সরিয়ে ফেলল রানা, ওগুলো টেবিলে রেখে বসল চেয়ারে।

শুনেও শুনলেন না ম্যানিনি, মনোযোগ দিয়েছেন মেশিনের দিকে। কয়েক সেকেন্ড পর টেবিলে রাখা মনিটরে ভেসে উঠল পানির ফোঁটার ভিতরের ন্যানোবট।

‘ম্যাগনিফিকেশন বাড়ানো তো, বাপু,’ বললেন বিজ্ঞানী। বোঝা গেল বলেছেন তাঁর মেশিনকে।

পাল্টে গেল চিত্র, এবার দেখা গেল বেশ কিছু দ্বীপ।

‘আরও বাড়াও,’ কমপিউটারকে তাগাদা দিলেন ম্যানিনি।
‘ফোকাস করো সেকশন এক শ’ ষাটে। ম্যাগনিফিকেশন আঠারো
শ’।’

মৃদু হুম-হুম আওয়াজ তুলল মেশিন। এবার মনিটরে দেখা
গেল মাকড়সার মত চারটে জিনিস।

হাঁ হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী।

‘কী বুঝলেন?’ জানতে চাইল সোহেল।

টার্মিনালের সামনের চেয়ারে বসে পড়লেন ম্যানিনি। গভীর
মনোযোগ দিয়েছেন মনিটরে। কি-বোর্ড আর মাউস নিয়ে ব্যস্ত
হয়ে উঠলেন। আরও যুম করছেন। চার পোকের মধ্যে একটা
নড়ছে।

‘এ হতে পারে না,’ বিড়বিড় করে বললেন ম্যানিনি।

‘নিজের জিনিস চিনতে পারছেন না?’ বলল রানা।

‘হারিয়ে যাওয়া সম্ভাব্যতার মত ওরা,’ বললেন বিজ্ঞানী। ‘ঠিক
আমার ডিযাইনের মতই, কিন্তু...’

‘কিন্তুটা কীসের?’

‘কিন্তু এগুলো আমার হতে পারে না।’

‘আপনার না হলে কার?’ সোজা-সাপ্টা জানতে চাইল রানা।
লোকটা আবারও অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। ‘আপনার নয় কেন? কেন
হতে পারে না আপনার?’

‘কারণ, আমি এ জিনিস তৈরিই করিনি।’

কড়া কথা বলতে গিয়ে থমকে গেল রানা।

‘ওগুলো নড়ছে,’ স্ক্রিনের দিকে আঙুল তাক করল জ্যাসিণ্টা।

মনিটরের দিকে চেয়ে ছবি আরও বড় করলেন বিজ্ঞানী। ‘ওরা
খেতে ব্যস্ত।’

‘খেতে ব্যস্ত মানে?’ জানতে চাইল রানা, ‘কী খাচ্ছে?’

খসখস করে মাথা চুলকালেন ম্যানিনি। ছবি অন্তত দশ গুণ বড় করে নিচু স্বরে বললেন, ‘ওরা ছোট সব অর্গানিক প্রোটিন খাচ্ছে।’

‘এসব ছোট রোবট অর্গানিক মলিকিউল খাবে কেন?’

‘কারণ ওদের খিদে লেগেছে,’ বললেন বিজ্ঞানী। মেশিনের দিকে ফিরলেন।

‘খিদে লাগবে কেন রোবটের?’ হাল ছাড়ল না রানা।

‘এই দ্বীপে বড় রোবট প্লাগ থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে পেট ভরায়,’ বললেন ম্যানিনি, ‘কিন্তু ন্যানোবটকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে চাইলে তার শক্তির ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই ছোট রোবটের সামনে খোলা কয়েকটা পথ। পিঠের এবড়োখেবড়ো জিনিস আসলে মাইক্রোচিপ্‌স বা খুদে সোলার কালেক্টর। পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। আর এই ন্যানোবট যদি আমার ডিযাইনেরই হয়, ওরা হজম করবে সাগরের পানির অর্গানিক খাবার। সেসব ভেঙে তৈরি করবে শক্তি। ধাতু, প্লাস্টিক বা সাগরের আবর্জনা হজম করবে। শুধু তাই নয়, ওরা জন্ম দিতে থাকবে ওদের মত আরও ন্যানোবট।’

‘বড় জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলছেন,’ বলল রানা। ‘আগে বলুন জন্ম দেবে কীভাবে। পাখি বা মৌমাছির ব্যাপারটা বুঝি, কিন্তু মেশিন নতুন মেশিন তৈরি করবে, সেটা ব্যাখ্যা করে বলুন।’

‘ন্যানোবট কাজে লাগাতে হলে, প্রথমেই বাড়াতে হবে এদের সংখ্যা। দ্বিতীয় কাজ সন্তান জনুর ব্যবস্থা করে দেয়া। আর...’

‘সংক্ষেপে বলুন, আপনার ডিযাইনের ন্যানোবটের কাজটা কী,’ বলল রানা।

‘আমি চেয়েছিলাম আমার ন্যানোবট লড়াই করবে সাগরের পলিউশনের বিরুদ্ধে,’ শুরু করলেন ম্যানিনি।

‘নানান আবর্জনা খেয়ে ফেলবে,’ আন্দাজ করল রানা।

‘শুধু যে খেয়ে নেবে তা নয়, ভাল কাজে ব্যবহার করবে,’ বললেন বিজ্ঞানী। ‘এভাবে দেখুন, পলিউশনের কারণে মরতে শুরু করেছে সব সাগর। যেমন প্রশান্ত মহাসাগরের বড় একটা অংশ ব্যবহার করা হচ্ছে ট্র্যাশ-ক্যানের মত করে। সেসব আবর্জনা সঠিকভাবে সরিয়ে ফেলতে হলে চাই হাজার হাজার কোটি ডলার। সেই টাকা কোথা থেকে আসবে? কোনও দেশ দায় নেবে না। কাজেই এমন একটা মেশিন চাই, যেটা খেয়ে শেষ করবে আবর্জনা, আর শক্তি সাপ্লাই দেবে মানব-সভ্যতাকে।’ হাত দিয়ে মনিটর দেখালেন তিনি। ‘এসব ভেবে তৈরি করি ন্যানোবট। বিরূপ পরিবেশেও টিকে থাকবে, সাগরে তৈরি করবে নিজের মত আরও ন্যানোবট। আর আবর্জনা পেলেই খেয়ে শেষ করবে। আর খেলেই... বুঝতেই তো পারছেন।’

ভেবেচিন্তে ন্যানোবটের জন্ম দিয়েছেন বিজ্ঞানী, ভাবল রানা। পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগ অক্সিজেন জোগান দিচ্ছে সাগর, এক তৃতীয়াংশ খাবার আসছে ওখান থেকে। কাজেই সাগর পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি। ওগুলো নোংরা করে তুললে এমন এক সময় আসবে, যখন থাকবে না একটা মাছও। তার চেয়েও বড় কথা: ফুরিয়ে যাবে পৃথিবীর প্রায় সব অক্সিজেন। শ্বাস নিতে পারবে না কোনও প্রাণী। অথচ, মস্ত সব দেশ এ নিয়ে ভাবছে না। আবর্জনা পরিষ্কার করছে না, কারণ তাতে অনেক খরচ।

অদ্ভুত সমাধানে এসেছেন ডক্টর ম্যানিনি।

কেউ যখন এই ভয়ঙ্কর সমস্যা নিয়ে ভাবছে না, তিনি ভেবেছেন পয়সা খরচ না করে কীভাবে দূর করা যায় সমস্যা।

‘চমৎকার পরিকল্পনা করেছেন আপনি,’ বলল সোহেল।

‘তাতেও সমস্যার শেষ নেই,’ বলল রানা।

‘ঠিকই ধরেছেন,’ সায় দিলেন বিজ্ঞানী। ‘বড় কিছু সমস্যা তো থাকবেই। কিন্তু আসল পাগলামি হচ্ছে সব জেনেবুঝেও চুপ করে

বসে থাকা। দেশগুলোকে কে বলেছে কোটি কোটি টন প্লাস্টিক বা আবর্জনা সাগরে ফেলতে? নিশ্চয়ই জানেন এসবের ফলে কী হচ্ছে। কমে গেছে তিমি মাছের সংখ্যা। তৈরি হচ্ছে একের পর এক বিষাক্ত ডেউ। কী নেই সেগুলোয়— সিগারেট লাইটার, প্লাস্টিকের বোতল, মোনোফিলামেন্ট লাইন, বাচ্চাদের ভাঙা খেলনা...’ কাঁধ ঝাঁকালেন জিনিয়াস। ‘আমরা আসলে শেষ করে দিচ্ছি সমস্ত সাগর। মারা পড়ছে ওরা। এর ফলাফল কিন্তু মানব জাতির জন্যে ভয়ঙ্কর।’

‘আমি আপনার সঙ্গে একমত,’ বলল রানা। ‘কিন্তু মেশিন তৈরি করবে নিজের মত আরও মেশিন, এটা মেনে নেয়া কঠিন। ব্যাপারটা কিন্তু যৌক্তিক বলেও মনে হচ্ছে না আমার কাছে।’

চেয়ারে হেলান দিয়ে আস্তে করে মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী। ‘কেউ মনে করেনি ওটা যৌক্তিক কাজ। আমি নিজেও না। তাই তৈরিও করিনি। আগেই বলেছি, এই জিনিস আমার সৃষ্টি নয়।’

‘তা হলে এই জিনিস আমার ভাইয়ের বোটে উঠল কী করে?’ কঠোর সুরে জানতে চাইল জ্যাসিস্টা।

জবাব পাওয়ার জন্য বিজ্ঞানীর দিকে চাইল রানা। কিন্তু পেল না কোনও উত্তর।

বয়স্ক মানুষটা চেয়ে আছেন জ্যাসিস্টার দিকে। চোখে ভয়।

ঘুরে চাইল রানা। পরিষ্কার দেখল বিজ্ঞানীর ভয়ের কারণটা।

মেয়েটার হাতে নাক-বোঁচা একটা সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। বিন্দুমাত্র কাঁপছে না দুই হাত। মাথলটা তাক করা বিজ্ঞানীর বুকে।

তেরো

নিজেকে রক্ষা করতে বুকের সামনে দুই হাত তুলেছেন ডক্টর রবার্টো ম্যানিনি। ‘কসম, ওগুলো কীভাবে তোমার ভাইয়ের বোটে গিয়ে উঠেছে আমি জানি না!’

জ্যাসিস্টা আর বিজ্ঞানীর মাঝে দাঁড়িয়ে গেল রানা। শান্ত স্বরে বলল, ‘পিস্তল নামিয়ে রাখো, জ্যাসিস্টা।’

‘কেন নামাব?’ ফুঁসে উঠল মেয়েটা।

‘কারণ সূত্র বলতে আছেন শুধু ডক্টর ম্যানিনি,’ বলল রানা। ‘তিনি খুন হলে কখনও জানবে না আসলে কী ঘটেছে তোমার ভাইয়ের কপালে। তা ছাড়া, খুন করলে বাকি জীবন জেলে পচতে হবে তোমাকে।’

‘কিন্তু এই লোকই তৈরি করেছে ওসব মেশিন,’ আপত্তির সুরে বলল জ্যাসিস্টা। ‘নিজেই স্বীকার করেছে। প্রমাণ তো পেয়েই গেছি!’

মেয়েটার চোখে তাকাল রানা। ভেবেছিল ওখানে ভয় দেখবে, কিন্তু কোনও দ্বিধা নেই চোখে। আছে শুধু রাগ আর শীতলতা।

‘সামনে থেকে সরে যাও, মাসুদ রানা।’

‘তুমি কিন্তু বড় একা, বলেছিলে আমাদেরকে,’ বলল রানা। ‘ট্রিগার টিপে দিলে বাকি জীবন সত্যিকারের একা হয়ে যাবে।’

‘এই লোকই খুন করেছে আমার ভাইকে,’ বলল জ্যাসিস্টা,

‘হয়তো বলবে না কারণটা, কিন্তু প্রতিশোধ তো নিতে পারব!
...দয়া করে সরে যাও আমার সামনে থেকে।’

পথ ছাড়ল না রানা।

‘মেয়ে, তোমার ভাইয়ের মৃত্যুর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই,’ কাঁপা স্বরে বললেন ম্যানিনি। ‘কিন্তু যে খুন করেছে, তাকে হয়তো খুঁজে বের করতে সাহায্য করতে পারব।’

‘কীভাবে?’ জানতে চাইল রানা।

‘খুঁজে বের করব কারা ওই টেকনোলজি নিয়ে কাজ করেছে,’ বললেন বিজ্ঞানী। ‘তাদের ভেতর কে তৈরি করেছে, তাও জানতে পারব। এমন তো নয় যে একটা স্কু-ড্রাইভার আর রাং-ঝালাইয়ের যন্ত্র তুলে নিলেই এই জিনিস তৈরি হবে। খুব জটিল প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে হয় ন্যানোবটের। কোনও সন্দেহ নেই, ওই প্রাথমিক ডিযাইন করার সময় যারা আমার সঙ্গে ছিল, তাদের কেউ তৈরি করেছে এই মেশিন।’

বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনি কথা বলছেন, এমন সময়ে নিঃশব্দে বিড়ালের মত জ্যাসিস্টার প্রায় পিছনে পৌঁছে গেছে সোহেল।

‘বলতে থাকুন, ডক্টর ম্যানিনি,’ বলল রানা, কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন তাগিদ।

‘ওই সিস্টেম সম্পর্কে জানে মাত্র নয়জন,’ থেমে থেমে বললেন বিজ্ঞানী। ‘কিন্তু আমার সমান জানে মাত্র একজন। তার নাম পিয়েরে ডিবোয়ে। এই দ্বীপেই আছে সে এখন।’

‘মিথ্যা বলছে!’ রাগে ফুলে গেল জ্যাসিস্টার চোয়াল, ‘নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চাইছে!’ আরও শক্ত করে পিস্তলের বাঁট ধরল মেয়েটা।

পিছন থেকে ওই একই সময়ে থাবা দিল সোহেল। ছোঁ দিয়ে নিয়ে নিল পিস্তল। তবে ওটা হাতে না রেখে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরের মেঝেতে। দুই হাতে জ্যাসিস্টার বাহু ধরল হাফ নেলসন

কায়দায়। মনে মনে প্রশংসা করল রানা বাঙালি বিজ্ঞানী কুয়াশার। নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ প্রক্রিয়ায় ওর যান্ত্রিক বাম হাত প্রায় নিখুঁত করে দিয়েছেন মানুষটা। ডান হাতের চেয়ে শক্তি কম নেই বাম হাতে।

পিস্তল মেঝেতে পড়তেই ‘বুম!’ আওয়াজ হলো। এক সেকেণ্ড পর রানা বুঝল, গুলি বেরোয়নি অস্ত্র থেকে।

‘সবাই ঠিক আছ তো?’ জানতে চাইল।

ম্যানিনি আর সোহেল আস্তে করে মাথা দোলাল। ওরা কেউ আহত নয়। ভাইয়ের খুনিকে হাতে পেয়েও খুন করতে পারেনি বলে ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছে জ্যাসিন্টা।

‘আওয়াজটা কীসের?’ জানতে চাইল রানা।

জবাব দিল না কেউ।

আর তখনই জোরালো ধাতব আওয়াজ হলো। ল্যাবের পিছনের দিকে অন্ধকারে নড়ে উঠেছে কী যেন।

ওদিকে চোখ গেল রানার।

ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে পোড়া বাজে গন্ধ। চালু হয়ে গেছে বেশ কয়েকটা ওয়েল্ডিং রোবট। সামনের সবধরনের বাধা ঠেলে আসছে এদিকেই। ধাতব বাহুতে বলসে উঠছে ফ্লেম টর্চের সাদা আগুন।

ঝট্ করে রবার্তো ম্যানিনির দিকে চাইল রানা। হিসাব কষে ফেলেছে। জানতে চাইল, ‘নিশ্চয়ই আপনার মাস্টার প্রোগ্রামার পিয়েরে ডিবোয়ে?’

আস্তে করে মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী। ‘আমার মনে হচ্ছিল কেউ যেন আমাদের ওপর নজর রেখেছে।’

ওদের দিকে রওনা হয়ে গেছে ওয়েল্ডিং রোবট।

দুটো রোবটের পা নেই, চলছে ফিরছে ট্যাকের মত ট্র্যাকের সাহায্যে।

তৃতীয়টার পাখির মত সরু পা। ধাতব মেঝেতে খ্যাটাং-

খ্যাটাং আওয়াজ তুলছে।

জ্যাসিস্টাকে ছেড়ে দিল সোহেল।

রানার দিকে ঘুরে চাইল মেয়েটা। ‘দুঃখিত, আসলে...’

‘ব্যখ্যা পরে শুনব,’ বলল রানা। ওর চোখ রোবটদের উপর।

বালকহেড ডোরের দিকে ছুট দিলেন বিজ্ঞানী। ওখানে পৌঁছে মুচড়ে দিলেন হ্যাণ্ডেল। খুলল না দরজা।

‘সাবধান!’ গলা ছাড়ল সোহেল।

রবার্টো ম্যানিনির উপর ফ্লোম টর্চ তাক করেছে একটা মেশিন। ট্র্যাকের সাহায্যে ঘড়-ঘড় আওয়াজ তুলে ধীরে সুস্থে সামনে বাড়ছে। হাতে ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত সাদা আগুনের অস্ত্র।

বয়স্ক লোক বিজ্ঞানী, কিন্তু দুই লাফে সরে গেলেন সাত ফুট দূরে। কিন্তু তাতে স্বস্তি নেই, ঘুরে তাঁর দিকে রওনা হয়ে গেল রোবট। কোণঠাসা করবে।

জ্যাসিস্টার পিস্তল পড়ে আছে অনেকটা দূরে। রানা ওদিকে চার পা যাওয়ার আগেই জ্যাস্ত হয়ে গেল আরেকটা রোবট। আটকে দিল ওদিকের পথ।

পিছিয়ে গেল রানা, ওই রোবট আর নিজের মাঝে রাখল বড় কাউচ। ওর মতই পিছিয়ে এসেছে সোহেল আর জ্যাসিস্টা।

‘এগুলো কীভাবে চলে?’ গলা উঁচিয়ে জানতে চাইল রানা। একটু দূরের টেবিলের সামনে থেমেছে একটা রোবট। হাত বাড়িয়ে দিতেই ঘুরতে লাগল ছোট করাত। টেবিলের পুরু কাঠ মাখনের ভেতর গরম ছুরির মত কেটে দু’টুকরো করে দিল।

‘স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলে, নইলে দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোল দিয়ে চালাতে হয়,’ বললেন ম্যানিনি, ‘চোখের বদলে ওদের আছে পিনহোল ক্যামেরা।’

ঘুমন্ত মানুষের মত এসে ঘিরে ফেলছে রোবট। কোনও বাধা পড়লেই কাজে লাগাচ্ছে থাবার মত হাত। ফ্লোম টর্চ, করাত,

হাতুড়ি, জু-ড্রাইভার আর ছোরার কাছে হার মানছে সবই। রানার চোখের সামনে দু' টুকরো হয়ে গেল দুটো চেয়ার আর একটা কাউচ। আগুন জেলে দেয়া হলো কাঠ ও কাপড়ে।

রানা খেয়াল করল, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চলছে সব রোবট। একেকবারে একটার বেশি সামনে বাড়ছে না। বিজ্ঞানীর উদ্দেশে বলল ও, 'রিমোট কন্ট্রোল এখন পিয়েরে ডিবোয়ের হাতে।'

মাথা দোললেন ম্যানিনি।

সোহেলের দিকে ফিরল রানা। 'কোনও পরামর্শ?'

'প্লাগ খুলে ফেললে...' থেমে গেল সোহেল। পরক্ষণে বলল, 'কিন্তু এদের বোধহয় ব্যাটারিও আছে।' একটা চেয়ার তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল কাছের রোবটকে লক্ষ্য করে। গুড়-গুড় আওয়াজ তুলে আসছে ওটা।

মেশিনটার বুকে দুম করে লাগল চেয়ার, ওখান থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। টলমল করে উঠেছে রোবট, কিন্তু সামলে নিল। এগোতে শুরু করল আবারও।

কোণঠাসা হয়ে বিজ্ঞানীর কাছে চলে এসেছে রানা।

সোহেল আর জ্যাসিটা বেশ খানিকটা দূরে।

রানার মনে হলো, বিজ্ঞানী আর ওকে বাগে পেতে চাইছে পিয়েরে ডিবোয়ে।

হঠাৎ করেই ডানদিকে সরে দৌড় শুরু করল রানা। কিন্তু পাঁচ ফুট যাওয়ার আগেই থামল কড়া ব্রেক কষে। ওর সামনে দিয়ে গেছে সাদা আগুনের তীব্র হলকা। এমনই হবে আশা করেছিল রানা, নিজের ক্ষিপ্ততার উপর বিশ্বাস রেখে দৌড় শুরু করল বামপাশ দিয়ে।

অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে রোবট, শত্রুর উদ্দেশে ছুঁড়ল আগুনের আরেকটা হলকা। কিন্তু দুই সেকেন্ড আগেই ওটার কোমরের কাছে পৌঁছে গেছে রানা। পিঠের উপর দিয়ে গেল গনগনে শিখা।

গরমে চিড়-বিড় করে উঠল তুক। ওদিকে খেয়াল দেয়ার সময় নেই, হাতের নাগালে পেল ধাতব একটা বাহু— দেরি না করে গায়ের জোরে ছিঁড়ে নিল ওটা। পরক্ষণে চোখে পড়ল কপালের ক্যামেরা। ঘুমি বসাল ওটার উপর। ওর কাঁধের উপর দিয়ে গেল ওয়েল্ডিং টর্চের ফুলকি। মা দুর্গার মত দশটা হাত নাড়ছে রোবট। একবার রানাকে বাগে পেলে...

‘কোনও সুইচ নেই?’ ব্যস্ত কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

‘না, নেই,’ জানিয়ে দিলেন ম্যানিনি। ‘কখনও ভাবিনি ম্যানুয়ালি বন্ধ করতে হবে।’

‘এখন থেকে ভাবতে শুরু করুন!’ রোবটের একপাশে তিনটে পাইপ, হাইড্রলিক হতে পারে। পাইপ ছিঁড়ে নিতে চাইল রানা। কিন্তু বুকে বেদম এক ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল অন্তত পাঁচ ফুট দূরে।

রিভেট গাঁথে দেয়ার হাতুড়ি ব্যবহার করেছে রোবট।

চিত হয়ে পড়েছে রানা। ওর মনে হলো চুর-চুর হয়ে গেছে পাঁজরের সব হাড়। এদিকে খুবই কাছে পৌঁছে গেছে দ্বিতীয় রোবট। ওটা করাত নামাচ্ছে ওর পেট বরাবর। দু’টুকরো করবে ওকে। গড়াতে শুরু করে, রোবটের আওতার বাইরে সরে গেল রানা। পিঠ ঠেকল গোলাকার, প্রকাণ্ড জানালার কাঁচে। ওদিকে সাগরের সবজেটে-নীল পানি।

রানার কাছেই করুণ চেহারা করে দাঁড়িয়ে আছেন বিজ্ঞানী। একটু দূরে সোহেল-জ্যাসিন্টা। ওদের সবাইকে ঘিরে ফেলেছে রোবটগুলো।

‘একটাই উপায়,’ বলে উঠে দাঁড়াল রানা। এইমাত্র ওর বুকে হাতুড়ি মেরেছে যে মেশিন, তিন লাফে ওটার খুব কাছে পৌঁছে গেল। রোবটের নানান যন্ত্রপাতি থেকে সরিয়ে রেখেছে শরীর। মাত্র এক সেকেন্ড পর এল সাদা আঙনের হলকা। প্রায় অন্ধ হয়ে

গেল ও। সাঁই করে উপর থেকে নামল হাইড্রলিক হ্যামার। গা মুচড়ে সরল রানা, কিন্তু কাঁঠালের আঠার মত লেগে রইল রোবটের পাশে। ঠেলে ওকে পিছিয়ে দিল মেশিনটা। ধূপ করে পিঠ দিয়ে জানালার কাঁচে বাড়ি খেল রানা। আবারও জ্বলে উঠেছে ফ্লেম টর্চ। কিন্তু যেখানে থাকার কথা রানার, ওখানে নেই ও। জানালার অ্যাক্রিলিক কাঁচে লাগল ভীষণ উত্তপ্ত আগুন। বাঁকা একটা রেখা তৈরি হলো কাঁচে। পরের সেকেন্ডে নীচের অংশে লাগল আগুন।

সামনে বেড়েছে রোবট। একপাশ থেকে জানালার কাঁচের উপর ওটাকে ঠেলল রানা। খাটুনির চোটে মনে হলো ভেঙে পড়বে মেরুদণ্ডের হাড়। ‘আশা করি... এগুলো... ও’অটর-প্রফ না,’ দাঁতে দাঁত চেপে ঠেলছে। পরক্ষণে খপ্প করে ধরল হাইড্রলিক পাইপ। ঠিকই ধারণা করেছে, অত্যন্ত শক্তিশালী হাতুড়ি নামল ওর মাথা লক্ষ্য করে।

ঝট করে আওতা থেকে সরে গেল রানা। ওর জায়গায় জানালার কাঁচে এসে ঠকাশ্ করে লাগল হাতুড়ি।

চাপা একটা চিড়-চিড় আওয়াজ পেল রানা।

লক্ষ-কোটি ফাটল ধরেছে অ্যাক্রিলিক কাঁচ জুড়ে।

মস্ত একটা হাঁ করে ওদিকে চেয়ে আছেন রবার্টো ম্যানিনি।

চোখ বড় বড় করে দেখছে সোহেল আর জ্যাসিন্টা।

ওই কাঁচ বাইরের প্রাকৃতিক প্রচণ্ড দুর্যোগ ঠেকাতে পারে, কিন্তু ভিতর দিক থেকে হামলা হতেই ভেঙে পড়তে শুরু করেছে।

ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের মত এল যেন আস্ত সাগর, মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো জানালার কাঁচ। পরক্ষণে যে যেখানে ছিল, প্রবল পানির তোড়ে ভেসে গেল। আসবাবপত্র, রোবট, রানারা—সব কিছুই ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরের দেয়ালে।

ধূপ-ধাপ করে কী যেন লাগল রানার বুক-পেট-উরুতে। ধাক্কা

দিয়ে সরাতে গিয়ে বুঝল, গায়ে এসে পড়েছে ওয়েন্টার রোবট।
ওটাকে সরিয়ে দিল। ভেসে উঠতে চাইল। কিন্তু ঘরে ঢুকেছে মস্ত
এক ঢেউ। চেপে ধরেছে ওকে মেঝেতে। অবশ্য দুই সেকেণ্ড পর
হাঁটুর উপর ভর করে বসল। পরক্ষণে সাঁতার কাটতে শুরু করে
ভেসে উঠল পানি-সমতলে।

ফেনায়িত, খ্যাপা জলে ভাসছে বহু কিছুই। রানা টের পেল,
পানির সঙ্গে উপরে উঠছে। একটু পর ভরে যাবে মস্ত ঘর।
ল্যাবোরেটরিতে বাতাস আটকা পড়েছে বলে কমে গেছে সাগরের
ঢুকবার গতি। অবশ্য, কোনও চোরা লিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে
বাতাস, একটু পর তলিয়ে যাবে সব।

চারপাশে চাইল রানা। ভেসে উঠেছে সোহেল। ডান হাতে
ধরে আছে বিজ্ঞানীর কাঁধ। একটু দূরে ছাতের একটা পাইপ ধরে
ভাসছে জ্যাসিণ্টা।

‘আর রোবট নেই তো?’ জানতে চাইল রানা।

‘ওদেরকে সাঁতার কাটা শিখিয়েছি নাকি?’ বিষণ্ণ মুখে বললেন
ম্যানিনি।

‘জীবনে এই একটা ভাল কাজ করেছেন,’ বলল সোহেল।

‘আমরা কতটা নীচে?’ জানতে চাইল রানা।

‘পঁচিশ ফুট।’

‘সাঁতার কেটে বেরিয়ে যেতে হবে।’

‘পারব,’ বলেই খক-খক করে কাশতে লাগলেন বিজ্ঞানী।
তলিয়ে যাওয়ার পর গিলেছেন অন্তত আধ লিটার পানি।

‘জ্যাসিণ্টা?’

‘পারি।’

‘সবাই খুলে ফেলুন জুতো।’ বিজ্ঞানীর দিকে ঘুরল রানা।
‘ফেলে দিন আপনার আলখেল্লা। ওটা নিয়ে সাঁতারাতে গিয়ে শেষে
ডুবে মরবেন।’

‘তা ছাড়া ওটা দেখার পর থেকে খালি বমি আসছে আমার,’ বলল সোহেল। ‘আপনার একটু রুচি থাকা উচিত।’

‘ফুল আমি ভালবাসি,’ আপত্তির সুরে বললেন ম্যানিনি।

‘তা হলে ফুলের-বাগান করুন, গায়ের কাপড়ে যা-তা সব ছাপ দিলেই হলো?’

খুব গম্ভীর চেহারায় আলখেলা খুললেন বিজ্ঞানী।

সবাই ফেলে দিল জুতো।

জানালায় ভাঙা জায়গাটার কাছে সরে এল।

দুব দিয়ে রঙনা হওয়ার আগে ম্যানিনির চোখে তাকাল রানা।

‘কোথায় পাব আপনার পেয়ারের লোক পিয়েরে ডিবোয়েকে?’

‘মেইন বিন্ডিঙে, হেলিপ্যাডের কাছে কন্ট্রোল সেন্টারে,’ বললেন ম্যানিনি, ‘কিন্তু এখন আর ওকে ভালবাসি না আমি। আমারই নিজের হাতে গড়া মেধাবী ছাত্র, এত বড় শয়তান হয়ে উঠবে ভাবতেও পারিনি।’

‘ওখানে যাওয়ার পথে আপনার হাতুড়ি বা ফ্লেম টর্চওয়ালা মিস্তিরির সঙ্গে দেখা হোক, তা চাই না,’ বলল রানা, ‘আপনি কি তার নির্দেশ ওভাররাইড করতে পারবেন?’

নাকের ডগা চুলকে নিয়ে বললেন বিজ্ঞানী, ‘না পারার কী আছে। ওটাই তো হবে আমার প্রথম কাজ।’

‘ওড,’ চট করে একবার সোহেলকে দেখল রানা। ‘আমরা এবার আক্রমণে যাব।’

‘চোঁ-চোঁ করা খালি পেটে...’ বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনির মতই বিমর্ষ দেখাল সোহেলকে।

চোদ্দ

ভাসমান, প্রকাণ্ড আইল্যান্ডের সদ্য নির্মিত উঁচু দালানের ওপর তলায় প্রায়াক্ষকার কন্ট্রোল রুমে একের পর এক মনিটরে চোখ রাখছে বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনির প্রাক্তন ছাত্র পিয়েরে ডিবোয়ে। সামনে তিনটে মনিটর। তার দুটো কালো। কিন্তু তৃতীয় মনিটরে দেখা গেল নড়ছে কী যেন।

হঠাৎ করেই কালো হয়ে গেল মনিটর।

‘কী হলো?’

জবাব দিল না ডিবোয়ে।

তার দিকে ঝুঁকে এল বিজ্ঞানীর আইন উপদেষ্টা ফিল হ্যাভেলা। ‘কিছু বলছ না কেন? বুড়ো-শালা মরেছে?’

কালো মনিটর দেখিয়ে দিল ডিবোয়ে। ‘কী জানি! তুমি যা দেখছ, আমিও তা-ই দেখছি। মরল কি না কে জানে!’

চোখ সরু করে মনিটরের দিকে চেয়ে রইল হ্যাভেলা।

নতুন করে প্রোথ্রাম রিবুট করল ডিবোয়ে। ভাবছে, সিগনাল পাঠাবে কনস্ট্রাকশন রোবট। তখনই দ্বীপের স্কিম্যাটিক ডিসপ্লেতে দপ করে জ্বলে উঠল লাল বাতি। টিট-টিট শব্দ তুলছে অ্যালার্ম।

‘পানি ল্যাবে,’ বলল ডিবোয়ে। হঠাৎ করেই বুঝে ফেলল কী হয়েছে। ‘সাগর গিয়ে ঢুকেছে ওই ঘরে। নিশ্চয়ই ফেটে গেছে উন্মাদটার পিকচার উইণ্ডো।’

‘তার ফলে কী হতে পারে?’

সুইভেল চেয়ারে ঘুরে গেল ডিবোয়ে। খুশি হয়ে উঠেছে। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী। ‘কপাল মন্দ, এবার মরতে হবে ওদেরকে। দেখে মনে হবে ঘটেছে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাকসিডেন্ট।’

‘আন্দাজ করলে চলবে না, ডিবোয়ে, এক শ’ ভাগ নিশ্চিত হতে হবে,’ বলল উকিল হ্যাভেলা। ‘মৃতদেহ চাই।’

‘তারা আছে সাগরের পঁচিশ ফুট তলে,’ বলল ডিবোয়ে, ‘আর যেভাবে বিস্ফোরিত হয়েছে জানালার কাঁচ, এরপর বাঁচার উপায় নেই। তবুও যদি বাঁচে, হয়ে গেছে ক্ষত-বিক্ষত। জোরালো স্রোতের বিরুদ্ধে বেরোতে পারবে না, দম আটকে মরবে।’

‘রবার্তো ম্যানিনির ডিযাইন বিক্রি করে জায়েদ বিন মনযুরের কাছ থেকে দশ মিলিয়ন ডলার করে পেয়েছি,’ বলল হ্যাভেলা। ‘এখন এরা বেঁচে গেলে শ্রেফ পচে মরব জেলে। নিশ্চয়ই বোঝা, বাঁচতে দেয়া যাবে না। অত খুশি হয়ে উঠো না। আরও রোবট পাঠাও। তুলে আনুক সবার লাশ। নিশ্চিত হতে হবে যে সত্যিই মরেছে ওরা।’

আবারও চেয়ার সহ ঘুরে কি-বোর্ডে টোকা দিতে লাগল ডিবোয়ে। লিস্ট থেকে বের করেছে হাইড্রো লেখা ফাইল। খটা-খট টাইপ করে কাজে নামিয়ে দিল দুটো সাবমারসিবলকে। ও-দুটো আছে ম্যানিনির ল্যাবের খুবই কাছে।

‘জিনিসগুলো কী?’

‘খোল পরিষ্কারক,’ বলল ডিবোয়ে, ‘বুড়োর দ্বীপের খোল থেকে পরিষ্কার করে অ্যালগি আর বার্নেকল।’

‘আক্রমণ করতে পারে?’

‘তুমি বার্নেকল হলে তখন পারবে,’ বলল ডিবোয়ে। ‘ওদের ক্যামেরা দিয়ে চারপাশ দেখতে পাব।’

ম্যানুয়াল কন্ট্রোল ব্যবহার করে ১৬২এ সেকশনের দিকে সাবমারসিবল নিয়ে চলেছে সে। ওদিকেই ম্যানিনির ল্যাব। গতি

তুলবার জন্য তৈরি নয় এসব সাবমারসিবল ।

গন্তব্য অবশ্য খুবই কাছে ।

দীর্ঘ চারকোনা জানালা পেরোবার সময় বলল ডিবোয়ে, ‘ওই যে অবযার্ভেশন ডেক । আর সামান্য গেলেই ম্যানিনির ল্যাব ।’

কয়েক সেকেন্ড পর দেখা গেল ল্যাবোরেটরির বাইরের অংশ ।

ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জানালা । ওখান থেকে আগে বেরোত উজ্জ্বল আলো । গুহার মত ঘর এখন অন্ধকার । ভেঙে পড়েছে গোলাকার, মস্ত কাঁচ । ফ্রেমের সঙ্গে রয়ে গেছে কয়েক টুকরো পুরু, ভারী অ্যাক্রিলিক । কালো গহ্বরটা দেখাল ভয়ঙ্কর রাক্ষসের মুখের মত ।

‘ভেতরে ঢোকো,’ বলল ফিল হ্যাভেলা ।

তাই করবে নিজেও ঠিক করেছে পিয়েরে ডিবোয়ে । কিন্তু এক সেকেন্ড পর ডানদিকে দেখতে পেল নড়াচড়া । ওদিকে ঘোরাল সাবমারসিবল । ক্যামেরা দেখিয়ে দিল উপরে উঠছে কয়েকজন সাঁতারু ।

‘ধরো ওদেরকে!’ খঁকিয়ে উঠল হ্যাভেলা । ‘ঠেকাও!’

সাবমারসিবলের দীর্ঘ বাহু শেষজনের পা-র দিকে বাড়িয়ে দিল ডিবোয়ে । পিছনে রয়ে গেছে এক সাঁতারু, সুঠামদেহী এক মেয়ে ।

সাবমারসিবলের বাহু খপ করে ধরল তার পা । শুরু হয়েছে টানা-হেঁচড়া । থরথর করে কাঁপছে ক্যামেরা । মেয়েটা শ্বাস ছাড়তেই উপরে উঠছে বুদ্বুদ । প্যানেলের জয়স্টিক নীচে নামিয়ে আনল ডিবোয়ে । নামতে শুরু করেছে সাবমারসিবল ।

কিন্তু তা দু’ সেকেন্ডের জন্য, তারপর থেমে গেল যন্ত্রটা । মনিটরের পর্দায় উদয় হয়েছে এক লোক । গড়ান দিল চুরুট আকৃতির সাবমারসিবল । মুচড়ে ভেঙে দেয়া হলো ওটার বাহু । হেডসেটে ভোঁতা আওয়াজ পেল ডিবোয়ে ।

ছাড়া পেয়েছে মেয়েটা। আবারও সাবমারসিবল দু'হাতে ধরেছে লোকটা, চোখ রেখেছে ক্যামেরার দিকে।

কন্ট্রোল রুমে শিরশির করে উঠল ডিবোয়ের বুক। ভয় লেগে গেল লোকটার হিংস্র চোখ দেখে। ক্যামেরার সামনে আঙুল তুলল সে, যেন সরাসরি তাক করেছে ডিবোয়ের দিকে। হাতের ইশারায় দেখিয়ে দিল কীভাবে ফাঁক করে দেবে গলা। পরক্ষণে এক ঘূষিতে ভেঙে দিল ক্যামেরা। অন্ধ হয়ে গেছে সাবমারসিবল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে ভুল হয়নি পিয়েরে ডিবোয়ের।

আসছে ওই লোক। একবার ধরতে পারলে...

দ্রুত টাইপ করতে লাগল ডিবোয়ে। এখনও ওর হাতে রয়ে গেছে জরুরি কৌশল। হয়তো বাঁচাতে পারবে নিজের পিঠ। এন্টার টিপে চেয়ার ছাড়ল সে, মেঝে থেকে তুলে নিল মাঝারি ব্রিফকেস। ওটার ভিতর নগদ টাকা। শেষ পেমেন্ট।

‘কই যাও?’ জানতে চাইল ফিল হ্যাভেলা।

‘সটকে পড়ছি,’ জানিয়ে দিল ডিবোয়ে, ‘তোমার শখ থাকলে রয়েছে যেতে পারো।’

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে রিভলভার বের করল, দরজা খুলে বেরিয়ে এল করিডরে, তাড়া খাওয়া তেলাপোকার মত ছুটতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেন্ড পর কন্ট্রোল সেন্টার থেকে বেরোল স্ট্রিকি হ্যাভেলাও, এক দৌড়ে পৌছে গেল সঙ্গীর পাশে।

দি আইল্যাণ্ড-এর স্টারবোর্ডের সরু মই বেয়ে উপরের ডেকে পৌছে গেছে রানা-সোহেল। আড়াল নিয়েছে ছোট একটা ওক গাছের। দেখে নিল চারপাশ। একটু দূরে গমের সবুজ খেত।

কয়েক সেকেন্ড পর মই বেয়ে উঠে এল জ্যাসিস্টা, হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল ওদের পাশে। খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে। ‘এবার কী করবে?’ জানতে চাইল।

‘দখল করব কন্ট্রোল সেন্টার,’ বলল রানা। বুঝতে পারছে, বিজ্ঞানীর কাছ থেকে তথ্য পেলে তা কাজে আসবে। কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইল রানা।

শামুকের গতি তুলে মই বেয়ে উঠছেন বিজ্ঞানী। প্রতি ধাপ উঠে বিশ্রাম নিচ্ছেন। কেশে চলেছেন খক-খক করে।

কর্কশ শোনালা রানার ফিসফিস, ‘আসুন, ম্যানিনি! হাতে সময় নেই!’

‘মনে হচ্ছে আর উঠতে পারব না,’ বললেন বিলিওনেয়ার। ‘এখানে দাঁড়িয়েই মরে যাব। আমাকে ছাড়াই চলে যান।’

‘খুশি হতাম ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারলে,’ বিড়বিড় করল সোহেল।

‘রোবট বিকল করতে হবে, মনে আছে?’ তাড়া দিল রানা।

‘ঠিক,’ মাথা দুলিয়ে আবারও রওনা হলেন ম্যানিনি। ‘আসছি।’ ধীরে ধীরে উঠছেন ভদ্রলোক।

ওদিক থেকে চোখ সরিয়ে কন্ট্রোল সেন্টারের দিকে চাইল রানা। পিরামিডের তৃতীয়তলার স্টারবোর্ডে বেরিয়ে এসেছে দু’জন লোক। নামতে শুরু করে হারিয়ে গেল স্টেয়ারওয়েল-এ।

তাদের একজনকে চেনা-চেনা লাগল রানার।

বিজ্ঞানীর সহকারী সেই উকিল। অন্যজন অচেনা।

‘পিয়েরে ডিবোয়ে দেখতে কেমন?’ জানতে চাইল রানা।

মইয়ের শেষ ধাপের উপরে উঠল বিজ্ঞানীর মাথা। ‘মাঝারি আকারের লোক। গাজরের মত ফ্যাকাসে লাল চেহারা। চুল ছোট করে ছাঁটা। মাথাটা কদম ফুলের মত গোল।’

লোকগুলো অনেক দূরে ছিল। কিন্তু চেহারার যে বর্ণনা দিয়েছেন বিজ্ঞানী, তা হুবহু মিলে যায়।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর দেখা গেল তাদের দু’জনকে। রাস্তায় বেরিয়ে দৌড়াতে শুরু করেছে। বার-বার দেখে নিচ্ছে এদিকটা।

রানার বুঝতে দেরি হলো না, পালাচ্ছে লোক দু'জন ।

শুরু করল রানা, 'আপনার এই জাহাজ...'

'জাহাজ না, জাহাজ না, এটা একটা দ্বীপ,' প্রায় কাতরে উঠলেন ম্যানিনি ।

'এই দ্বীপ থেকে চলে যেতে চাইলে সেরা বাহন কোন্টা হওয়া উচিত?'

'হেলিকপ্টারে উঠতে না চাইলে ম্যারিনায় গিয়েও বোট বা সি-প্লেনে চাপতে পারেন ।'

ম্যারিনার দিকেই ছুটছে ওই দুই লোক ।

'বদমাস পিয়েরে ডিবোয়ে আর আপনার সঙ্গে ওই কাঠির মত উকিল চলেছে ম্যারিনার দিকে,' বলল রানা । 'জ্যাসিস্টা, তুমি মিস্টার ম্যানিনিকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেবে কোনও কমপিউটারের সামনে । কাজটা করতে গিয়ে আবার খুন করে বোসো না ।'

'বিরক্তিকর মানুষ হলেও কোনও অপরাধ করেননি,' যোগ করল সোহেল ।

'বিরক্তিকর!' নিখাদ বিস্ময় ম্যানিনির চোখে ।

'নয়তো কী? মেহমানদের দুটো বিস্কুট আর এক কাপ চা-ও কি সেধেছেন? এদিকে খিদেয় মরে যাচ্ছি!' জ্যাসিস্টার দিকে ফিরল সোহেল, 'তাই বলে খুন করে ফেলাটা বোধহয় ঠিক হবে না ।'

'বুঝতে পেরেছি,' বলল মেয়েটা । 'খুন করব না ।'

'চল্ যাই,' বন্ধুর দিকে চাইল রানা ।

মাথা দোলাল সোহেল ।

দৌড় শুরু করে গমের খেতের ভিতর দিয়ে শর্টকাট ধরল ওরা দু'জন । তীরের মত ছুটছে । বুক পর্যন্ত উঠে এসেছে গমের সোনালী শিষ । কিছুক্ষণের মধ্যে পৌছে গেল খেতের প্রান্তে । পার্কে ঢুকে অর্ধেক পথ পাড়ি দিতেই শুনল চালু হয়েছে কোনও

ইঞ্জিন।

‘বোট না রে,’ দৌড়ের ভিতর বলল সোহেল, ‘এয়ার-কন্ড লাইকোমিং। শালারা সি-প্লেনে করে ভাগতে চাইছে।’

‘আরও জোরে দৌড়া!’ তাড়া দিল রানা।

বাজপাখির মত উড়ে চলেছে ওরা দু’জন।

রানা আর সোহেল নকল দ্বীপের আরেক প্রান্তের দিকে চলেছে, এদিকে রবার্তো ম্যানিনিকে নিয়ে ধীর পায়ে হেঁটে মেইনটেন্যান্স বিল্ডিং পৌঁছে গেছে জ্যাসিণ্টা। মস্ত ঘরে পঞ্চাশটা রোবট রিচার্জ হচ্ছে দেখে গলা শুকিয়ে গেল ওর। অবশ্য নড়ল না একটা মেশিনও।

দেরি না করে প্রোগ্রামিং টার্মিনাল খুঁজে নিলেন ম্যানিনি, মনোযোগ দিলেন কি-বোর্ডে।

‘আপনাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছি বলে সত্যিই দুঃখিত,’ বলল জ্যাসিণ্টা। ভাবছে, লোকটা ভয় পেয়েছে বলে কাজে ভুল করে বসতে পারে। হয়তো ঠেকাতেই পারল না রোবটগুলোকে!

‘আমিও দুঃখিত,’ বললেন রবার্তো। ঝড়ের গতিতে টাইপ করছেন। ‘রেগে যাওয়ার জন্যে আপনাকে দোষ দিতে পারছি না।’

আস্তে করে মাথা দোলাল জ্যাসিণ্টা।

‘দুকে পড়েছি,’ খুশি-খুশি স্বরে বললেন ম্যানিনি। মনে হলো গর্বিত। কিন্তু তিন সেকেণ্ড পর হাঁ হয়ে গেলেন। চেহারায় ফুটে উঠল সত্যিকারের বিস্ময়। বিশ্বাস করতে পারছেন না নিজের চোখকে। ভুরু কুঁচকে মনিটরের নির্দিষ্ট অংশে মন দিলেন। বিড়বিড় করে বললেন, ‘ডিবোয়ে, এটা কী করেছে, বাছা?’

তখনই হঠাৎ করেই প্রাণ ফিরে পেতে লাগল চারপাশের রোবট। শৌ-শৌ আওয়াজে চালু হয়েছে অসংখ্য মোটর। এলইডি

মনিটরের রং হয়ে গেল সবুজ থেকে কমলা। পুরু অক্ষরে ফুটে উঠল লেখা।

‘হামলাকারী মোড?’ জিজ্ঞেস করল জ্যাসিটা, ‘কী ধরনের প্রোগ্রাম?’

‘এই দ্বীপে যাদের আরএফআইডি চিপ সহ আইডি ব্যাজ নেই, তাদেরকে খুঁজে বের করবে রোবট। এই ব্যবস্থা করেছিলাম জলদস্যু ঠেকাতে।’

চট করে জ্যাসিটা টের পেয়ে গেল, ওর কোনও ব্যাজ নেই।

যার যার প্লাগ খুলতে শুরু করেছে রোবটগুলো।

নিশ্চয়ই বিজ্ঞানীর কাছে ব্যাজ আছে?

‘আপনার ব্যাজ কই?’ ব্যস্ত হয়ে জানতে চাইল জ্যাসিটা।

‘আমার আলখেল্লার ভেতরে,’ বললেন ম্যানিনি। ‘জোর করে আমাকে দিয়ে ওটা খুলিয়ে ছেড়েছে আপনাদের ওই মাসুদ রানা!’

পার্ক থেকে ছিটকে বেরিয়ে পরের গমের খেতে গিয়ে ঢুকেছে রানা ও সোহেল। খেতের একদিক থেকে এল অন্যরকম শব্দ। ঘড়-ঘড় আওয়াজে চালু হয়েছে ইঞ্জিন। ওই জিনিস মাঝারি কমবাইন মেশিন। ফসল কাটার যন্ত্রের তাড়া খেয়ে রানা-সোহেলের মনে হলো, ওটা সত্যিকারের দানব। কচা-কচ গমের কাঁচা শিষ কাটতে কাটতে আসছে ওটার ধারালো ফলা ওদের দিকেই।

‘ম্যানিনির সহকারী শালাকে কে বলবে এখন ফসল কাটার সময় না!’ বলল সোহেল।

‘কথা বাদ দিয়ে ভাগ!’

গম গাছের সারির মাঝ দিয়ে উড়ে চলেছে ওরা। খেত পেরিয়ে পড়ল সরু রাস্তায়। ওটা গেছে ম্যারিনার দিকে। রানার পিছনে লেজে-আগুন-ধরা চিলের মত উড়ছে সোহেল। ওরা খেয়াল করল ফলের গাছের সারি থেকে বেরিয়ে এসেছে বেশ

কয়েকটা মেশিন।

‘এখনও রিপ্ৰোগ্রাম করতে পারেনি ম্যানিনি,’ ছুটে ছুটে বলল রানা। ‘কোড ভুলে গেছে কি না কে জানে!’

‘নিজের নাম যে মনে রেখেছে, এই তো বেশি!’

ঝড়ের গতি তুলে এক শ’ ফুট যেতেই পেল নিচু দেয়াল। ওটা টপকে যাওয়ায় ওপাশে রয়ে গেল যন্ত্রগুলো। দশ সেকেন্ড পর দৌড়ে ম্যারিনার দিকের ধাপ বেয়ে নামতে লাগল দু’জন।

সামনের ব্রেকওঅটর থেকে বেরিয়ে যেতে রওনা হয়েছে সি-প্লেন। যা করবার করতে হবে ঝটপট।

বোটগুলোর ভিতর যেটাকে বেশি দ্রুতগামী বলে মনে হলো রানার, ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল ওটায়। পৌঁছে গেল বাইশ ফুট ডনযি বোটের কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে। ওদিকে দড়ি খুলে বোটে লাফিয়ে উঠেছে সোহেল। একই সময়ে গর্জন ছাড়ল ভি-৮ ইনবোর্ড ইঞ্জিন।

‘ডকের দিক থেকে আসছে কয়েকটা দানব,’ সতর্ক করল সোহেল।

‘রোবট ঠেকাতে পারবে না আমাদের,’ বলল রানা।

ওদের দিকে তেড়ে এল নিচু যন্ত্রদানব।

থ্রটল খুলে দিয়েছে রানা, বনবন করে ঘুরিয়ে নিল হুইল। প্রায় লাফিয়ে ছুট লাগাল বোট। ক্রমেই বাড়ছে গতি, ম্যারিনা থেকে বেরোতে বাঁক নিল। ব্রেকওঅটরের খোলা জায়গার দিকে তাক করেছে বো।

ওই পথের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে গেছে সি-প্লেন।

ওটাকে নাগালে পাবে ভেবেছে রানা। একবার সুযোগ পেলেই পাশ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে কাত করে।

কিন্তু ব্রেকওঅটরের আওতা থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত সাগরে পড়ল সি-প্লেন। বাড়তে শুরু করেছে গতি।

চোখের ইশারায় ড্যাশবোর্ডের রেডিয়ো সোহেলকে দেখাল রানা। 'ব্র্যাডলিকে বল হেলিকপ্টার আকাশে তুলতে। এদেরকে হারালে চলবে না।'

রেডিয়ো চালু করে ঠিক ফ্রিকোয়েন্সি ডায়াল করে গলা ছাড়ল সোহেল, 'ব্র্যাডলি, আমি সোহেল আহমেদ! কাম ইন!'

'হ্যালো, মিস্টার আহমেদ, কিছু বলবেন?' জানতে চাইল পাইলট।

'ফড়িংটা আকাশে তুলুন!' তাড়া দিল সোহেল, 'একটা বোট নিয়ে সি-প্লেনের পিছু নিয়েছি। ওটাকে ধরতে হবে। বোট না, এখন চাই হেলিকপ্টার।'

'দুঃখিত, সেটা অসম্ভব,' জবাবে বলল ব্র্যাডলি। 'পারলে ছুটে আসতাম, কিন্তু খুলে ফেলেছি ইঞ্জিনের জরুরি কিছু পার্টস্।'

'কী করেছেন?' বোটের ইঞ্জিনের উপর দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'কেন করেছেন?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'মিস্টার রানা বলে দিয়েছেন এদেরকে বিশ্বাস করাতে হবে। কাউলিং খুলে তারপুলিনের ওপর রেখেছি কয়েকটা পার্টস্। যাতে সবাই দেখতে পারে মিথ্যা বলছি না।'

'এত নিখুঁত হতে বলেছে কে ওকে,' বিড়বিড় করল রানা।

'তার মানে হেলিকপ্টার পাচ্ছি না,' হতাশ হয়ে বলল সোহেল। এখন ধাওয়া করে পৌঁছে যেতে হবে সি-প্লেনের পাশে, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে হবে ওটাকে। কাজটা করতে গিয়ে মারাও পড়তে পারে ওরা।

ব্রেকওঅটরের মাঝের খোলা জায়গায় পৌঁছে গেছে ডনযি স্পিডবোট। 'দু' শ' গজ দূরে সি-প্লেন। এবার পিছনে বাতাস রেখে শুরু করবে টেক-অফ রান।

থ্রটল পুরো ঠেলে দিল রানা। তীব্র গতি পেল ডনযি বোট।

মাঝারি সব চেউয়ের চুড়ায় উঠে কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছে গেল সি-প্লেনের সামনে।

নাকের কাছে বোট দেখে বাধ্য হয়ে বাঁক নিল ভীত পাইলট, কাত হয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল সি-প্লেন।

নিজেও বামে বাঁক নিয়েছে রানা, নতুন উদ্যমে ধাওয়া করল আকাশযানটাকে।

আবারও গতি তুলছে সি-প্লেন।

ওটার তৈরি পাগলা চেউ পাত্তা না দিয়ে পিছু নিল রানা।

কাজে লাগিয়েছে ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তি।

কয়েক সেকেন্ডে পৌঁছল সি-প্লেনের সামনে, আবারও কমিয়ে আনতে শুরু করেছে গতি।

ঝুপ্ করে ডেকে বসে পড়ল সোহেল। তার আগে সতর্ক করেছে রানাকে।

সাগরে গতি তুলছে সি-প্লেন।

ওদের মাথার উপর দিয়ে সাঁই করে বেরিয়ে গেল ধাতব প্রপেলার। পশ্টুন রাডারে লেগে ছিটকে উঠল বোট। কয়েক মুহূর্ত পর ধড়াস্ করে নেমে এল সাগরে।

‘কপাল ভাল মাথা কেটে নিতে পারেনি,’ বলল সোহেল, ‘আর সামনে যাস্ নে!’

রানার আশা ছিল, বাঁক নেবে বিমান। কিন্তু মস্ত বড় লাফে ওদের বোটটাকে পেরিয়ে গেছে সি-প্লেন। অবশ্য, তাতে লাভ হয়েছে। বেকায়দাভাবে সাগরে নেমেছে বিমান। ভারসাম্য স্থির রাখতে গিয়ে গতি কমাতে হয়েছে পাইলটকে। নতুন করে তুলতে চাইল গতি, কিন্তু যেতে পারল না সঠিক দিকে।

‘বাতাসের উল্টো দিকে ছুটছে,’ বলল সোহেল। ‘সহজ হবে না টেক-অফ করা।’

‘কাজটা কঠিন, কিন্তু অসম্ভব না,’ জবাবে বলল রানা। উন্মত্ত

ঢেউ পাতা না দিয়ে দক্ষতার সঙ্গে বোট নিয়ে গেল বিমানের পিছনে, জোর গুঁতো দিল দুই পশুনে।

বার-বার হোঁচট খেয়ে বাঁক নিতে শুরু করেছে বিমান। অবশ্য, ঠিকভাবেই ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করল পাইলট। কয়েক সেকেন্ডে আবারও সিধা করে নিল সি-প্লেন।

‘সাবধান, রানা!’ চেষ্টা করে উঠল সোহেল।

বোটের ডগায় লাগল এক রাশ গুলি। সাবমেশিনগান ব্যবহার করেছে দুই অপরাধীর একজন। বাধ্য হয়ে বাঁক নিয়ে পিছিয়ে এল রানা। এই সুযোগে গতি কমিয়ে ঘুরে গিয়ে হাওয়ার অনুকূলে বিমান নিয়ে গেল পাইলট।

মেইনটেন্যান্স রুমে রোবট-বাহিনীর দিকে চেয়ে আছে জ্যাসিণ্টা, চোখে-মুখে ভয়। নড়েচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের দিকে রওনা হয়ে গেছে যন্ত্র-দানব। দুঃস্বপ্ন তৈরি করবার জন্য যথেষ্ট ছিল নীচের ওই ল্যাবের কয়েকটা রোবটই। এখন কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে জ্যাসিণ্টার। মস্ত ভুল করে ফেলেছে। মোটেই উচিত হয়নি এদের সঙ্গে এখানে আসা। এবার মরতে হবে বেঘোরে।

‘কিছু তো করুন!’ রবার্তো ম্যানিনির দিকে চাইল জ্যাসিণ্টা।

‘চেষ্টা তো করছি,’ বললেন বিজ্ঞানী। ‘খুব চালাক লোক ওই পিয়েরে ডিবোয়ে। যদি আগে জানতাম এতটা ভাল, তিন গুণ বাড়িয়ে দিতাম ওর বেতন।’

সাহায্যের জন্য চারপাশে তাকাল জ্যাসিণ্টা। রোবটগুলোর কাছেই এক সারি লকার। ওখানে চোখ গেল ওর। ‘লকারে কী, ডক্টর?’

‘ওঅর্ক ইউনিফর্ম।’

‘সঙ্গে আইডি আছে?’

‘হ্যাঁ,’ মনিটরের দিকে চোখ বিজ্ঞানীর। এক সেকেন্ড পর

প্রায় লাফিয়ে উঠলেন চেয়ারে। ‘আরেহ্! তাই তো! ওখানেই তো...’

কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করেনি জ্যাসিণ্টা, দৌড়াতে শুরু করেছে। রোবটদের বাড়িয়ে দেয়া ধাতব বাহু এড়িয়ে পৌঁছে গেল লকারের কাছে। হ্যাণ্ডেল টেনে খুলে ফেলল প্রথম কবাট। তাক থেকে খপ্ করে তুলে নিল ওঅর্ক ইউনিফর্ম। বুকে সাদা আইডি ব্যাজ। ওটা নিজের বুকের কাছে ধরল ও।

অগ্রসরমাণ মেশিনগুলো থেমে গেল, কয়েক সেকেন্ড পর রওনা হয়ে গেল বিজ্ঞানীকে ধরতে। ঝড়ের গতিতে বৃথা টাইপ করে চলেছেন মানুষটা।

‘কোনোভাবেই ভাঙতে পারছি না কোড!’ আফসোস করে বললেন, ‘পারব, কিন্তু সময় লাগবে!’ বিজ্ঞানীর খুব কাছে পৌঁছে গেছে খুনি সব রোবট। সামনেরটা জোরালো ধাক্কা দিয়ে তাঁকে ফেলে দিল মেঝেতে। আরেকটা রোবট বনবন করে ঘুরন্ত স্কু-ড্রাইভার নামাতে শুরু করেছে বিজ্ঞানীর বুক লক্ষ্য করে।

দৌড়াতে শুরু করে কয়েক মুহূর্তে গন্তব্যে পৌঁছে গেল জ্যাসিণ্টা, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একটা রোবটকে, চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মিস্টার ম্যানিনির বুকে। আশা করছে, দু’জনের হিট সোর্সকে একজনের দেহের তাপ বলে মনে করবে রোবট। নিজের বুকে ধরে রেখেছে আইডি ট্যাগ।

‘হুঁই-হুঁই!’ আওয়াজ তুলছে স্কু-ড্রাইভার।

চোখ মুদে ফেলল জ্যাসিণ্টা।

এক সেকেন্ড পর থেমে গেল আওয়াজ। পিছিয়ে গেল স্কু-ড্রাইভার। বিজ্ঞানীকে ছেড়ে শত্রুর খোঁজে দরজার দিকে রওনা হয়ে গেছে সব ক’টা রোবট।

বিজ্ঞানীর বুকে আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে ওদিকটা দেখছে জ্যাসিণ্টা।

এক লাইনে মেইনটেন্যান্স বিল্ডিং থেকে বেরোল সব রোবট।

মেঝেতে নেমে কঠোর চোখে রবার্তো ম্যানিনির দিকে চাইল জ্যাসিন্টা। চাপা স্বরে বলল, ‘আমি আপনাকে বাঁচিয়েছি। কথাটা মনে রাখবেন।’

আস্তে করে মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী। চোখ সরাতে পারলেন না দরজার ওপর থেকে।

ভাসমান দ্বীপ থেকে আধ মাইল দূরে সি-প্লেন থেকে গুলি আসছে রানা-সোহেলের বোট লক্ষ্য করে। বাঁক নিয়ে হাওয়ার অনুকূলে পৌঁছে গেছে বিমান, গতি বাড়তে শুরু করেছে পাইলট। গুলি এড়াতে আবারও বিমানের পিছনে চলল রানা।

‘সোহেল, শেষ সুযোগ! হয় এখন, নইলে কখনও না!’

‘ঠিক আছে,’ বলে বোটের বো-র ডগায় চলে গেল সোহেল, তুলে নিল ভারী নোঙর। ‘কলোরাডোর এক বন্ধু শিখিয়েছে কীভাবে ল্যাসো দিয়ে গরু ধরতে হয়।’ দড়ির ডগায় বনবন করে ঘোরাতে শুরু করেছে বিশ পাউণ্ডের নোঙর।

সোহেল কী করবে বুঝে গেছে রানা, সামনে ঠেলে দিল থ্রটল। সি-প্লেনের সঙ্গে কমিয়ে আনছে দূরত্ব। কয়েক মুহূর্ত পর আবারও শুরু হলো গুলি। বোট পাইলটের দিকে সরিয়ে নিল রানা, পরক্ষণে ঢুকে পড়ল বিমানের পেটের নীচে।

বিমানের পণ্টুন পানি থেকে উঠতেই অলিম্পিকের হাতুড়ি ছোঁড়া বডি-বিল্ডারের মত ঘুরেই নোঙর ছুঁড়ল সোহেল। পণ্টুনের দণ্ডে বারকয়েক পেঁচিয়ে গেল নোঙর। টানটান হয়ে উঠল দড়ি।

উড়তে গিয়েও আবারও ধপাস করে সাগরে নামল সি-প্লেনের নাক। বেদম টান খেয়ে লাফিয়ে সামনে বাড়ল বোট।

পিছনে ভারী বোট, বিমানের বাম ডানা কাত হয়ে তলিয়ে গেল পানির নীচে। পরক্ষণে চরকির মত ঘুরতে শুরু করে চুরমার হয়ে গেল বিমান। নানাদিকে ছিটকাল ভাঙা অংশ।

পাশ থেকে ভয়ঙ্কর হ্যাঁচকা টান আসতেই মড়মড় আওয়াজ তুলে নোঙর সহ বোটের একটা অংশ ভেঙে গেল। ডুবে যেতে যেতেও সামলে নিল রানার বোট। বামদিকে দ্রুত বাঁক নিতে শুরু করেছে ও, থ্রটল বন্ধ করে ঘুরে পিছনে চাইল।

একটা পশুঁন হারিয়েছে ক্ষতিগ্রস্ত বিমান। ডিগবাজি দিতে গিয়ে ভাঁজ হয়ে মুচড়ে গেছে দুই ডানা। ছিঁড়ে ছিটকে গেছে লেজ। বিমানের পেটে গলগল করে ঢুকছে সাগর। কিছুক্ষণের ভিতর তলিয়ে যাবে সি-প্লেন।

‘বুঝুক শালারা!’ বো-র সামনের হ্যাণ্ডবার ছেড়ে ওদিকে চাইল সোহেল।

‘তুই রোডিয়োতে নামলে ভাল করতি,’ অন্তর থেকে প্রশংসা করল রানা। বোট ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে চলল বিধ্বস্ত বিমানের দিকে।

সি-প্লেনের পাশাপাশি হলো বোট।

দ্রুত ডুবছে বিমান। ভিতরের দুই আরোহী প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বিপদে পড়ে ভুলে গেছে অস্ত্রের কথা। আগে বেরোল ফিল হ্যাভেলা, সাগরে নেমে খপ্পু করে ধরল বোটের একপাশ। কয়েক সেকেন্ড পর তার সঙ্গী হলো পিয়েরে ডিবোয়ে।

বোটে উঠে আসতে চাইল তারা, কিন্তু সম্ভব হলো না।

সামান্য থ্রটল খুলে সামনে বাড়ল রানা, এগিয়ে গেল আট-দশ ফুট। আবারও থামল।

‘প্লিয,’ করুণ সুরে বলল ডিবোয়ে, ‘আমি ভাল সাঁতার জানি না।’

‘তা হলে ভাসমান দ্বীপে ওঠাই উচিত হয়নি তোমার,’ উপদেশের সুরে বলল সোহেল।

দুই ক্রিমিনাল এসে বোটের একপাশ ধরতেই আবারও থ্রটল খুলে দিল রানা। হাত ছুটে গেল লোকদুটোর।

বেশ কয়েক ফুট এগিয়ে গেল বোট।

হাবুডুবু খেয়ে পিছু নিল ডিবোয়ে। হ্যাণ্ডরেইল পেয়ে গেল হ্যাভেলা। কয়েক সেকেন্ড পর ওখানে পৌছল ফরাসি। শব্দ করে ধরতে চাইল হ্যাণ্ডরেইল।

‘সব এই লোকের দোষ,’ অসহায় সুরে নালিশ করল।

‘কীসের দোষ?’ জানতে চাইল রানা। ‘কী করেছে?’

‘ন্যানোবট চুরি করেছে,’ বলল ডিবোয়ে।

‘অ্যাঁই, চুপ করো তো!’ কড়া সুরে ধমক দিল হ্যাভেলা।

ঝটকা দিয়ে সামনে বাড়ল বোট।

পিছনের সাগরে রয়ে গেল দুই চোর।

‘ওই লোক কাকে ন্যানোবটের ফর্মুলা দিয়েছে?’ জানতে চাইল সোহেল।

হ্যাভেলা বোটের পাশে পৌছে যাওয়ার অন্তত এক মিনিট পর প্রায় ডুবতে ডুবতে আবারও গন্তব্যে পৌছল ডিবোয়ে, খপ্প করে ধরল হ্যাণ্ডরেইল।

‘মিস্টার রানা, আমরা না ঠিক করেছি বাইরের কাউকে কখনও বোটে উঠতে দেব না?’ নিরীহ কণ্ঠে জানতে চাইল সোহেল।

হাসিমুখে মাথা দোলাল রানা। ‘আরে, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম! সরি, মিস্টার আহমেদ!’

আবারও থ্রটল খুলে দিল ও।

দুই সাতারু প্রাণপণে ধরে রাখতে চাইল হ্যাণ্ডরেইল, কিন্তু ছুটে গেল হাত।

এবার আর থামল না রানা, পৌনে এক মাইল দূরের ভাসমান দ্বীপের দিকে ধীর গতিতে চলেছে।

‘প্রিয়, মিস্টার রানা!’ হাহাকার করে উঠল ডিবোয়ে, ভেসে থাকতে গিয়ে জোরালো ধুস্-ধাস্ শব্দ তুলে প্রাণপণে ছুঁড়ছে হাত-

পা। ‘আমি সবই বলব!’

প্রায় বধির লোকের মত কানের কাছে হাত নিল রানা। ‘ভাল করে শুনছি না! দূরে চলে যাওয়ার আগেই যা বলার...’

‘ওর নাম জায়েদ!’ হাবুডুবু খাওয়ার মাঝে চেষ্টা করে উঠল ডিবোয়ে, ‘ওর নাম জায়েদ বিন মনযুর!’

রানা থ্রটল নিউট্রাল করতেই কয়েক ফুট গিয়ে থামল বোট।

‘কোথায় পাব সেই জায়েদকে?’ জানতে চাইল রানা।

চোরের মত চেহারা করে একবার হ্যাভেলার দিকে চাইল ডিবোয়ে। তার সঙ্গী বিরক্ত হয়ে ঘন-ঘন মাথা নাড়ছে।

‘সে থাকে ইয়েমেনে,’ হড়বড় করে বলল ডিবোয়ে, ‘আর কিছুই জানি না!’

‘তোমার সঙ্গে পরিচয় হলো কী করে?’

‘অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে পড়ার সময়,’ নির্দিষ্ট স্বীকার করল ডিবোয়ে।

‘তবে যে তোমার সঙ্গীর দোষ দিচ্ছিলে?’ জানতে চাইল সোহেল।

‘দেবই তো! এই উকিলের বাচ্চাই তো পটিয়েছে আমাকে!’

পনেরো

কারুকার্য করা মরোক্কান স্টাইলের একতলা চমৎকার বাড়িটার সামনে মস্ত বড় উঠান, আর পিছনে নানারঙা ফুলে ভরা সুবাসিত বাগান। ওখান থেকে ঢিল ছুঁড়লে সেটা গিয়ে পড়বে গালফ অভ

এডেন-এ। বিকেল পেরিয়ে সন্ধ্যা হতেই আকাশ জুড়ে নেমেছে নিকষ-কালো অন্ধকার। ভারী মেঘের ভেলার আড়ালে ঢাকা পড়েছে অসংখ্য ঝিকিমিকি তারা। ঝরে গেছে সবার জীবন থেকে অমূল্য আরেকটি দিন। তবুও চারপাশের এই মায়াভরা পরিবেশ ভাল লাগছে খালিফের। রূপার থালা থেকে ভেড়ার সুস্বাদু ঝাল মাংস, সঙ্গে গরম রুটি আর সরু করে কাটা লাল টমেটো পুরছে মুখে, চিবাচ্ছে তারিয়ে তারিয়ে। মৃদু, ঝিরঝিরে হাওয়ায় বার-বার নড়ে উঠছে স্বচ্ছ কাপড়, ওটা ঘিরে রেখেছে বাগানের এদিকটা। একটু দূরে পাথুরে টিলার পায়ে চুমু দিয়ে ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ তুলে আবারও সাগরে ফিরছে ঢেউ; তার আগে হৃদয়ের সব কষ্ট ভুলে যেতেই যেন গুন-গুন করে গাইছে স্বর্গচ্যুত কোনও অভিশপ্ত, অসহায়, অপরাধী পরীর দুঃখের গান।

কিছুক্ষণ পর এল এক পরিচারক। কড়া, কালো চায়ের মগ টেবিলে নামিয়ে রেখে ফিসফিস করে কথা বলল খালিফের কানে।

চুপ করে সব শুনল খালিফ। কুঁচকে গেছে ভুরু, ভাঁজ পড়ল কপালে। চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

খালিফের খাওয়া শেষ হলে বাসন নিয়ে বিদায় নিল ভৃত্য।

তার কিছুক্ষণ পর বাগানে শোনা গেল পায়ের শব্দ।

স্বচ্ছ কাপড়ের ঘেরের ওপাশ থেকে বলে উঠল ছায়ার মত কেউ, ‘আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে।’

‘আসুন, মকবুল,’ জবাবে আমন্ত্রণ জানাল খালিফ।

‘খাওয়ার সময় বিরক্ত করতে চাইনি,’ বলল সে। ‘অপেক্ষা করেছে।’ কাপড়ের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।

সামনের আরামদায়ক চেয়ার দেখিয়ে দিল খালিফ। ‘বসুন, মকবুল। ইজরায়েলের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের সময় থেকেই আমরা বন্ধু। আপনার দেয়া অস্ত্রের জোরে ইহুদিদের ঠেকাতে পারিনি, কিন্তু ওগুলোর কারণেই প্রতিপত্তি পেয়েছে মনযুর বিন হানিফ ও

তার পরিবার, আর সেইসঙ্গে নসিব খুলেছে আমারও ।’

সামনের চেয়ারে এসে বসল মকবুল ।

সে বদমেজাজি, ঝগড়াটে আর বদস্বভাবের মানুষ । কিন্তু খালিফ খেয়াল করেছে, বেশ দ্বিধা নিয়ে হেঁটে এসেছে সে । কোনও কিছু নিয়ে চিন্তিত ।

‘দু’জনের নসিব নিয়ে আলাপ করতেই এখানে এসেছি,’ বলল মকবুল, ‘এবার হয়তো কপাল খুলবে, হাতেও আসবে সিংহভাগ মুনাফা ।’

চায়ে চুমুক দিয়ে টেবিলে গ্লাস রাখল খালিফ, পাশের ছোট বাসন থেকে সদ্য কাটা ‘ক্বাৎ’-এর পাতা নিয়ে মুড়িয়ে মুখে ফেলল । মৃদু অ্যামফেটামিন ড্রাগের মত ওই জিনিসে খুলবে মাথা । পাতা চিবুতে শুরু করতেই গলা দিয়ে নামল রস ।

‘সিংহ সিংহভাগ নেবে, কারণ তারা সিংহ,’ বলল খালিফ । ‘তাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইবে কে?’

‘কিন্তু সিংহ যদি হয় দুর্বল?’ সামনে ঝুঁকল মকবুল । ‘অথবা হারাতে শুরু করে তার সম্মান? সেক্ষেত্রে কিন্তু পালের নেতৃত্ব নেবে অন্য সিংহ ।’

‘প্রতীক ব্যবহার করে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে না, মকবুল,’ বলল খালিফ । ‘আপনি বলছেন জায়েদ বিন মনযুর আর তার প্রজেক্ট নিয়ে । ভাবছেন, ভুল পথে চলেছে সে ।’

সামান্য দ্বিধা নিয়ে মাথা দোলল মকবুল ।

তার দিকে ক্বাৎ-এর বাসন বাড়িয়ে দিল খালিফ । ‘নির্ন । মগজ খুলবে ।’

ভাঁজ করে নিয়ে পাতা মুখে ফেলল মকবুল ।

‘জায়েদের কোন্ কাজটা আপনার ভুল মনে হচ্ছে?’ জানতে চাইল খালিফ ।

‘আজ তিন বছর ধরে আশা দিচ্ছে সে,’ বলল মকবুল । ‘কিন্তু

এক ফোঁটা পানি পড়েনি এদিকের জমিতে ।’

‘পরিবর্তন আসতে সময় লাগে । ধৈর্য ধরতে বলা হয়েছে সবাইকে । বলা হয়নি?’

‘কিন্তু আমাদের হাতে তো আর সময় নেই,’ বলল মকবুল । ‘আপনিও এটা জানেন । ইয়েমেন শুকিয়ে গেছে । রাজনৈতিক সংকট তো আছেই, তার ওপর জোর করে শহরগুলো থেকে বের করে দেয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষকে । কোথাও নেই যথেষ্ট পানি ।’

মেঝেতে রাখা চিলুমচিতে মুখ থেকে লালা আর সবুজ পাতার দলা ফেলল খালিফ । গ্লাস তুলে চায়ে চুমুক দিল । মিথ্যা বলেনি মকবুল । পানির অভাব এতই বেশি, হিমশিম খাচ্ছে রাজধানীর সবাই । আগামী বছর রেশন করেও রক্ষা করা যাবে না শহর । বাধ্য হয়ে অন্য এলাকায় সরে যেতে হবে লাখ লাখ মানুষকে । কিন্তু তাতেও রক্ষা নেই, খরায় পুড়ছে গোটা দেশ, শান্তি নেই ।

‘গত সপ্তাহে তিনবার বৃষ্টি হয়েছে এখানে,’ বলল খালিফ । ‘অথচ এ সময়ে বৃষ্টি হয় না । উত্তরের পাহাড়ের চূড়া ঢাকা পড়েছে ঘন মেঘে । সব পাল্টে যেতে শুরু করেছে, মকবুল । জায়েদের প্রতিজ্ঞা বিফল হবে না ।’

‘হয়তো,’ বিরস কণ্ঠে বলল মকবুল । ‘কিন্তু অন্যের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারে সে ।’

লোকটার চোখ চকচক করছে, দেখল খালিফ । বুঝে গেল কী কারণে এখানে এসেছে সে ।

‘নিজের সম্মান নষ্ট করবে না জায়েদ,’ বলল খালিফ ।

‘জায়েদ বিন মনযুরের আবার কীসের সম্মান,’ তিক্ত স্বরে বলল মকবুল । ‘দৃষ্টান্ত হিসেবে আপনাকেই দেখিয়ে দিতে পারি । সবাই জানে, আজ জায়েদ যে পর্যায়ে পৌঁচেছে, সবই হয়েছে আপনার সহায়তায় । তার টাকা বলুন বা ক্ষমতা, সব এসেছে আপনার বুদ্ধির জোরে । নইলে এত টাকা পেত না জায়েদ ।

আপনার পরিশ্রম বা বিশ্বস্ততার জন্যে কোটি কোটি টাকা পেয়েছে সে— আজ কী নেই তার? কোম্পানি, প্রাসাদ, বিবি... কিন্তু এসব পেয়ে বিশেষ কী দিয়েছে সে আপনাকে?’ চারপাশ দেখল মকবুল। ‘চমৎকার বাড়ি, কয়েকজন চাকর, খাওয়ার মত ভাল খাবার.... সারাজীবন প্রাণের ঝুঁকি নেয়ার পর কী-ই বা পেয়েছেন আপনি? ...না, খালিফ, অনেক কম দেয়া হয়েছে আপনাকে। আরও অনেক পাওয়ার ছিল আপনার। নিজের জন্যে কাজ করলে এত দিনে মস্ত ধনী হতেন আপনি।’

‘আমি বিশ্বস্ত চাকর, মকবুল,’ বলল খালিফ।

‘মালিকের বড় প্রাপ্তি হলে সেখান থেকে নির্দিষ্ট পুরস্কার পায় চাকররা,’ বলল মকবুল, ‘এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী পুরনো, বুদ্ধিমান ক্রীতদাসও হয়ে উঠতে পারে পরামর্শদাতা।’

যথেষ্ট শুনেছে খালিফ, বলল, ‘ক্বাৎ-এর পাতা বোধহয় বেশি চালু করে দিয়েছে আপনার মগজ।’

উত্তেজিত কণ্ঠে বলল মকবুল, ‘বলতে পারেন, যথেষ্ট চালু করেছে। আপনি নিজেও ভাল করেই জানেন আসলে সত্যটা কী। আমাদের মতই আপনাকেও ব্যবহার করেছে জায়েদ। পাচ্ছে অনেক, আর বাধ্য না হলে চার আনা পয়সাও দিচ্ছে না কাউকে। তার পরামর্শে নিজেদের টাকা বিনিয়োগ করেছি আমরা। এখন যদি বন্ধ করে দেয় প্রজেক্ট, শেষ হয়ে যাব সবাই। যদি আরও টাকা দাবি করে, বাধ্য হয়ে তা দিতে হবে, যেমন করে হোক।’

‘বুঝলাম, আপনি আসলে আপনার টাকার কথা ভাবছেন।’

‘তা নয়,’ বলল মকবুল। ‘আসল হচ্ছে ক্ষমতা। কিছুদিনের ভেতর আমাদের হাতের বাইরে চলে যাবে জায়েদ। তখন দরদামও করতে দেবে না। তার হাতে চলে এসেছে পৌরাণিক আমলের পরীর হাতের জাদুর ভয়ঙ্কর ক্ষমতা। আর যদি রয়ে যায় তার হাতে ওই শক্তি, আমাদেরকে আর প্রয়োজন পড়বে না। সে

কারণেই স্রষ্টা দুষ্ট জিনদেরকে অভিশপ্ত করতেন। খারাপ জাদুকরদের বিশ্বাস করা হতো না। সুযোগ পেলেই স্রষ্টার বিরুদ্ধে লড়ত তারা, দখল করে নিতে চাইত স্বর্গ। ঠিক তাই করতে চাইছে জায়েদ বিন মনযুর।’

পুরনো বন্ধু কত দূর পর্যন্ত যাবে, আন্দাজ করতে চাইছে খালিফ। এখনও ওকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলেনি। কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করেছে। সুযোগ দিলে সরাসরি বলবে।

‘তার মানে আলাপ করেছে বিনিয়োগকারীরা,’ বলল খালিফ।
‘তাদের হয়ে কে আগে মুখ খুলবে, মকবুল?’

‘তা বড় কথা নয়,’ বলল ব্যবসায়ী।

‘আমি জানতে চাই।’

‘আসল প্রশ্ন, এখন কোন্ পক্ষ নেবেন আপনি,’ বলল মকবুল,
‘একবার ভাবুন, কেন আপনি এডেন-এ? মরুভূমিতে জায়েদের জাদুর গুহায় নেই কেন?’

‘কারণ এই মুহূর্তে আমাকে পাশে দরকার নেই তার।’

‘আজকাল ঘন-ঘনই এমনটা ঘটছে,’ জোর দিয়ে বলল মকবুল। ‘আর আপনি তো বিশ্বস্ত ভৃত্য, কী করবেন যখন আপনাকে আর জায়েদের লাগবেই না?’

মনে মনে হোঁচট খেল খালিফ। কথাটা নিজেও আগে ভেবেছে। খচ্-খচ্ করেছে অন্তর। মিথ্যা বলেনি মকবুল।

আবার বলতে শুরু করল মকবুল, ‘যখন ছোট ছিল, মানসিক জোরে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতেন আপনি। এখন কি তা করতে পারবেন? সেই জোর আপনার আছে? সবই তো দিয়ে বসেছেন তাকে, খালিফ। সময় হয়েছে কিছু পাওয়ার। যা আপনার প্রাপ্য, তা আদায় করে নিন এবার।’

‘আপনি বোধহয় অভ্যুত্থানের মত কিছু করতে বলবেন?’

‘এই বিশাল সাম্রাজ্য কিন্তু তৈরি করেছেন আপনিই,’ নিচু স্বরে

বলল মকবুল। ‘জায়েদের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়ার কথা আপনার। চাবিকাঠিও আপনার হাতে। সামান্য চাকরের মত বাড়ির বাইরে থাকবেন কেন? আপনিই হতে পারেন বেদুঈনদের নেতা।’

মকবুলের কথা আচ্ছামত নড়িয়ে দিয়েছে খালিফকে। এসব আপত্তিকর চিন্তা অন্তরের গভীরে পুঁতে রেখেছিল সে। এ কথা ঠিক, যত কাজেরই হোক, হোক যতই কঠোর বা নিষ্ঠুর, আসলে তো সত্যিই সে রয়ে গেছে সেই চাকরই।

জায়েদের ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে উঠলেই ওদের দু’জনের মাঝে তৈরি হবে আরও ব্যবধান। তার পরিবর্তে জায়েদের কাছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে গোষ্ঠি আর পরিবার। দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হবে ওকে। ওর নিজের ছেলে-মেয়েরা এত কষ্টের ফসল নিজেদের ঘরে তুলতে পারবে না।

আসলে, কিছুদিন ধরেই এসব শুরু হয়েছে। আজকাল ওকে কম সময় দিচ্ছে জায়েদ, বদলে গেছে আচরণ, অভ্যাস। খালিফের উপদেশ আর পছন্দ হচ্ছে না। আগে প্রতিটা কথা মন দিয়ে শুনত, আর এখন ব্যস্ততার অজুহাত দেখায়।

অবশ্য, এই কারণে বিশ্বাসঘাতকতা মোটেই যৌক্তিক নয়।

ক্বাৎ-এর পাতার বাসনের দিকে হাত বাড়াল খালিফ। আরেকটা পাতা মুচড়ে মুখে পুরল। সিদ্ধান্ত নিল, পরে এসব নিয়ে ভালভাবে ভাববে।

চিবুতে শুরু করতেই পাতা থেকে বেরোল রস। শক্তির একটা টেউ যেন ছড়িয়ে পড়ল শরীরে।

সন্দেহ নেই মকবুল সিদ্ধান্ত পাল্টে নেবে না। যা বলবার বলে ফেলেছে সে। এখন যদি নীতির বিষয়ে একমত না হয় দু’জন, এখানেই ফুলের বাগানে দেখা দেবে বিরোধ। হয়তো খুব কাছেই অপেক্ষা করছে মকবুলের লোক। আর বন্ধুত্বের কথা ভুলে নিজ

হাতেই ওকে খুন করবে লোকটা।

এই সুযোগ দেয়া মস্ত ভুল হবে।

‘কোনও পরিকল্পনা করেছেন?’ জানতে চাইল খালিফ।

মাথা দোলাল মকবুল।

‘জায়েদকে জানাতে হবে, ছোট পরিসরে কীভাবে কাজ করে মাইক্রোবট, তা দেখতে চাই আমরা।’

“‘আমরা’” মানে কি অন্যরাও?”

‘আমি ওখানে থাকব, সঙ্গে সৌদি শেখ হাকিম আবেদিন। আমাদের যথেষ্ট বিশ্বাস করে জায়েদ। সব দেখার পর অন্যদের জানিয়ে দেব আমরা।’

‘আচ্ছা! কী ধরনের ব্যবস্থা নেবেন?’

‘আপনি জায়েদকে জানিয়ে দেবেন, তার কন্ট্রোল রুম আর প্রোডাকশন ফ্যাসিলিটি দেখতে চাই আমরা। নইলে বন্ধ হবে টাকার চালান। এ ছাড়া, আরও জানাবেন, আমরা দেখতে চাই তার কমপিউটার প্রোগ্রামিং আর কোড।’

মকবুল কী চাইছে তা নিয়ে ভাবছে খালিফ। কিছুক্ষণ পর দাড়ি হাতড়ে নিয়ে বলল, ‘আর সব দেখার পর?’

‘আপনাকে ইশারা করব,’ বলল মকবুল, ‘আপনি খতম করে দেবেন জায়েদকে। দায়িত্ব নেবেন গোটা অপারেশনের। পার্টনার হিসেবে আপনাকে মেনে নেবে কনসোর্টিয়ামের সদস্যরা।’

ষোলো

দি আইল্যাণ্ডের দ্বিতীয় দালানে বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনির হাই-টেক অফিসের দিকে চলেছে মাসুদ রানা। সি-প্লেন নিয়ে পলায়নরত উকিল ফিল হ্যাভেলা আর বিজ্ঞানীর সহকারী পিয়েরে ডিবোয়েকে সোহেল আর ও ধরে আনবার পর পেরিয়ে গেছে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা। দুই বন্দি আছে এখন দ্বীপের কারাগারে। এরপর ঘটেছে অনেক কিছুই।

বিসিআই চিফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান আর নুমার অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে রানার কথা হয়েছে। ব্যস্ত হয়ে উঠেছে দুই ইন্টেলিজেন্স সংগঠন। সংগ্রহ করা হচ্ছে জায়েদ বিন মনযুর সম্বন্ধে জরুরি প্রতিটি তথ্য।

বিজ্ঞানীর আমন্ত্রণে এই দ্বীপে চলে এসেছে আসিফ আর তার স্ত্রী তানিয়া। হেলিকপ্টারের পার্টস লাগাবার পর মালে দ্বীপ থেকে ওদেরকে তুলে এনেছে পাইলট ব্র্যাডলি।

পিয়েরে ডিবোয়ের কমপিউটার কোড ভাঙতে পনেরো ঘণ্টা লেগেছে রবার্তো ম্যানিনির। এখন দেখছেন, আরও কোনও ফাঁদ পেতেছে কি না প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর মনে হয়েছে, নতুন করে আর কোনও বিপদ হবে না, তবে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নন। মেইন কমপিউটার অন্তত এক শতা প্রোগ্রাম চালাচ্ছে স্বয়ংক্রিয় এই দ্বীপে, সব কিছু পরীক্ষা করতে হলে চাই আরও কয়েক দিন। অবশ্য, রানার কথায় জরুরি কিছু প্রোগ্রাম চেক করেছেন বিজ্ঞানী।

ডিঅ্যাকটিভেট করা হয়েছে প্রতিটি কনস্ট্রাকশন রোবটকে ।

একটু আগে রবার্তো ম্যানিনির অফিসে সবাইকে জড়ো হতে বলেছে রানা । ওই অফিসে পৌছুবে বিসিআই হেডকোয়ার্টার থেকে মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের পরের নির্দেশ ।

দরজা খুলে অগোছালো অফিসে পা রেখে রানা দেখল, ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছে সোহেল, আসিফ আর তানিয়া । ডেস্কের ওপাশে বিজ্ঞানী । পাশেই জ্যাসিন্টা কাপুল ।

‘আপনার জেলখানা দেখার মতই,’ ম্যানিনিকে বলল রানা । ‘ওটার চেয়ে খারাপ অনেক ফাইভ স্টার হোটেল থেকেছি আমি ।’

কথাটা শুনে খুশি হলেন বিজ্ঞানী । ‘দি আইল্যান্ডের সব কনস্ট্রাকশন শেষ হলে, আশা করি বেড়াতে আসবে শত শত মিলিওনেয়ার আর বিলিওনেয়ার । বাড়াবাড়ি করলে ওদের কাউকে কাউকে রাখতে হবে জেলে । তাই বলে এই দ্বীপ সম্পর্কে খারাপ মনোভাব নিয়ে বাড়ি ফিরুক, তা চাই না ।’

রানা চেয়ারে বসতেই জানতে চাইল জ্যাসিন্টা, ‘মুখ খুলেছে ওরা?’

‘না, মুখ ঐটে আছে বিনুকের মতই,’ সোহেলকে এক পলক দেখে নিয়ে মনিটরের স্যাটালাইট ফিডের দিকে চাইল রানা ।

এইমাত্র মস্ত মনিটরে দেখা দিয়েছেন বিসিআই চিফ, গম্ভীর ।

সংক্ষেপে তাঁর সঙ্গে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দিল সোহেল ।

এরপর সরাসরি মিটিঙের জরুরি কথায় এলেন রাহাত খান: ‘জায়েদ বিন মনযুরের বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে । একটু পর এনক্রিপটেড ফাইলে সেসব পাবে তোমরা । প্রাথমিক কিছু তথ্য জানিয়ে দিচ্ছি । তার বাবার ছিল উটের ব্যবসা । এ ছাড়া, ছিল মরুদ্যান । পানি বিক্রি করে ওখান থেকেও আসত প্রচুর মুনাফা । জায়েদকে ইংল্যান্ডে পড়িয়েছে সে । উনিশ শ’ পঁচাত্তর সালে বেদুঈন জায়েদ বিন মনযুর ছিল অক্সফোর্ডের ছাত্র ।

বাবা মারা যাওয়ার পর, পড়াশোনা ছেড়ে জড়িয়ে পড়ে আর্মস্ চোরাচালানে। ফিলিস্তিনে পিএলও-র কাছে চড়া দামে প্রচুর অস্ত্র বিক্রি করে সেই টাকা বিনিয়োগ করে আইনসম্মত ব্যবসায়। শিপিং ও কনস্ট্রাকশন ব্যবসা মস্ত বড়লোক করে দেয় তাকে।

‘পাঁচ বছর আগে “মিয়াহা আন্বা” অর্থাৎ মিষ্টি পানি নামে চালু করে টেকনোলজি বিষয়ক এক কোম্পানি। বলতে পারো অস্বাভাবিক একটা আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়াম। প্রচুর টাকা আসে সন্দেহজনক উৎস থেকে। প্রথম থেকেই ওই কনসোর্টিয়ামকে চোখে চোখে রেখেছিল ইন্টারপোল। তার যথেষ্ট কারণও ছিল। সরকারী নিয়ন্ত্রণহীনভাবে শত শত কোটি টাকা আর আধুনিক টেকনোলজি ঢুকতে থাকে ইয়েমেনে। অথচ, অত মূলধন যাওয়ার কথা নয় ওই দেশে। ইন্টারপোল ধারণা করেছিল, ওই কোম্পানি আসলে টেরোরিস্টদের কোনও ফ্রন্ট বা মানি-লগারিং অপারেশন। কিন্তু পরে দেখা গেল, ওটার প্রধান পরিচালক জায়েদ বিন মনযুর রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি চাইছে না। মানি-লগারিং করছে না ওই কোম্পানি। আইন মেনে করা হয়েছে প্রতিটি টেকনোলজিকাল ট্রান্সফার এবং হাই-টেক ইনভেস্টমেন্ট।’

সামনের কি-বোর্ডে টাকা দিলেন রাহাত খান।

রানাদের মস্ত স্ক্রিনে ভেসে উঠল একটা দৃশ্য।

ওই অঞ্চল ইয়েমেনের উত্তর মরুভূমি। অনেক উপর থেকে যুম করা হলো। রানার মনে হলো, আকাশ থেকে নীচে পড়ছে ও। রেয়োলুশন লক হতেই দেখল, মরুভূমির ওই অংশে এক পাথুরে টিলা। পিছনের দিকের বালিতে যানবাহনের চাকার অসংখ্য দাগ।

চুপ করে অপেক্ষা করছে রানা ও সোহেল।

‘বিসিআই-এর স্থানীয় এজেন্ট কালাম জানিয়েছে, মরুভূমির ওদিকে বেশ তৎপর জায়েদ বিন মনযুর। খেয়াল করো, বালি ওখানে কালো। জায়গাটা কয়েক শ’ একর জুড়ে।’

‘দেখে মনে হচ্ছে ফ্লাশ-ফ্লাড হয়েছিল,’ মন্তব্য করল আসিফ ।
‘কিন্তু মরুভূমির ওদিকটা খুবই শুকনো,’ বললেন বিসিআই চিফ ।

‘কিছু লুকাতে চাইছে?’ মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল সোহেল ।

‘আমাদের এক্সপার্টরা বলছেন, ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে প্রচুর মাটি,’ বললেন রাহাত খান । ‘নীচে বোধহয় আছে প্রকাণ্ড কোনও ফ্যাসিলিটি । ওই এলাকার ইনফারেড স্ক্যান করেছে হ্যামিলটনের নুমা টেকনিশিয়ানরা । বালির ভেন্ট থেকে বেরোচ্ছে অস্বাভাবিক তাপ । মরুভূমির নীচে একটা কিছু তৈরি করা হচ্ছে । কিন্তু তা কী, আমাদের কারও জানা নেই ।’

‘আমার তৈরি ডিযাইন অনুযায়ী ন্যানোবট?’ বললেন রবার্তো ম্যানিনি ।

‘অসম্ভব নয়,’ বললেন বিসিআই চিফ । ‘কিন্তু তা-ই যদি হয়: তৈরি করা হচ্ছে কেন? কী করা হবে ওসব দিয়ে?’

ইটালিয়ান বিজ্ঞানী বললেন, ‘জানি না । আমার ইচ্ছে ছিল দুনিয়ার আবর্জনা খেয়ে শেষ করবে ওরা । কিন্তু এরা পাণ্টে নিয়েছে ডিযাইন । নতুন এসব ন্যানোবট তৈরি করা হয়েছে একেবারেই অন্য কোনও কাজের জন্যে । শুনেছি হামলা করেছে আমেরিকান এক ক্যাটাম্যারানে । কিন্তু সেক্ষেত্রে আর কোনও জাহাজে নয় কেন?’

‘আপনার কী মনে হয়, কী উদ্দেশ্যে এসব তৈরি করে থাকতে পারে, ডক্টর?’ জানতে চাইলেন রাহাত খান ।

জ্যাস্টিটাকে চট করে দেখে নিয়ে বললেন বিজ্ঞানী, ‘খাওয়ার মোড়ে রাখলে পুরো ক্যাটাম্যারানটা খেয়ে ফেলার কথা ওদের । কিচ্ছু থাকার কথা নয় ।’

‘আপনি বলছেন, কোনও প্রমাণই থাকার কথা নয়,’ টেলি-কনফারেন্স শুরু হওয়ার পর প্রথমবারের মত মুখ খুলল রানা ।

‘তার মানে, খেয়ে ফেলতে পারে যে-কোনও জাহাজ। কিন্তু খায়নি কেন? ওই কাজের জন্যে তৈরি করা হয়নি। নুমা-টিম হয়তো আসল কারণ আবিষ্কার করেছিল: সাগরের তাপমাত্রা কমিয়ে দিচ্ছে এসব ন্যানোবট।’

‘জানি না কীভাবে তা সম্ভব,’ বললেন ম্যানিনি, ‘তবে কোটি কোটি ন্যানোবট বহু কিছুই করতে পারবে।’

‘কোনও ব্যাখ্যা দেবেন, ডক্টর?’ জানতে চাইলেন-বিসিআই চিফ।

‘ওদেরকে সাধারণ পোকা বলে মনে করুন। সামান্য একটা পোকা কী-ই আর করবে, কিন্তু একই এলাকায় লাখ লাখ পোকা জন্মালে তৈরি করবে নানান সমস্যা। সংখ্যায় না বাড়লে তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু আমার ডিযাইনের বট তৈরি করবে নিজের মত আরও অসংখ্য বট। কোটি কোটি ছড়িয়ে পড়বে সাগরে। সব যে একই কাজে ব্যস্ত হবে, এমন না-ও হতে পারে। কয়েক কোটি ন্যানোবট আটকে দেবে যে-কোনও বোট। কিন্তু ধরুন, কয়েক বিলিয়ন ন্যানোবট হলে রুখে দিতে পারে প্রকাণ্ড সুপারট্যাঙ্কার। খেয়ে ফেলতে পারে আস্ত অয়েল রিগ। আর ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন বট তৈরি হলে ওরা শেষ করে দেবে দুনিয়ার সমস্ত সাগর।’

‘তা কি সম্ভব?’ জানতে চাইল তানিয়া।

আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন রাহাত খান।

তানিয়ার কথায় মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী। ‘খুবই সম্ভব। প্রচুর ন্যানোবট টেক্সিনের মত খতম করে দেবে সমস্ত সাগর। ওদের ধরে নিন নননেটিভ স্পেশিস হিসেবে। অচেনা এলাকায় পৌঁছে খতম করবে অন্যসব প্রাণীকে। প্রাকৃতিক শত্রু নেই, পালে পালে বাড়বে, ধ্বংস করবে ইকোসিস্টেম। ছড়িয়ে পড়বে এপিডেমিকের মত। মারা পড়বে মাছ ও অন্যসব প্রাণী। ঠিক তা-ই করবে ওরা।’

তারপর উঠে আসবে ডাঙায় ।’

‘বইয়ে পড়েছি, চিন থেকে কীভাবে নিউ ইংল্যান্ডে এসেছিল জিপসি মথ,’ বলল আসিফ । ‘নননেটিভ ওরা । কিন্তু তাদের খেয়ে নেয়ার মত কেউ ছিল না । প্রথম বছর দেখা দিল মাত্র কয়েকটা হুলওয়ালা বিছে । পরের বছর হাজার হাজার । আর তৃতীয় বছরে ছেয়ে ফেলল চারপাশ । কোটি কোটি, গাছের সব পাতা শেষ করতে লাগল । মারা পড়তে শুরু করল মস্ত সব জঙ্গল । আপনি বোধহয় ন্যানোবট সম্পর্কে এই আশঙ্কাই করছেন, ডক্টর ম্যানিনি?’

মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী ।

আসিফের কথা নিয়ে ভাবছে সবাই ।

রানা মনের চোখে দেখল, ভারত মহাসাগর থেকে গোটা দুনিয়ার সব সাগরে ছড়িয়ে পড়েছে ন্যানোবট । ওর মনে প্রশ্ন জাগল: কেন এ কাজ করবে কেউ? কী পাবে তাতে?

‘এসব ছড়িয়ে দেয়ার যে কারণই থাক, তা মঙ্গলজনক নয়,’ বললেন রাহাত খান, ‘কাজেই, রানা-সোহেল, তোমাদের কাজ হবে খুঁজে বের করা, কারা এসব করছে এবং কেন ।’ বিজ্ঞানীর কাছে জানতে চাইলেন, ‘আপনার কোনও সাজেশন, ডক্টর?’

সবার চোখ চলে গেল রবার্তো ম্যানিনির দিকে ।

‘মাত্র দুটো কাজ করা যায়,’ বললেন বিজ্ঞানী । ‘প্রথম কথা: রুখতে হবে ন্যানোবট । আমি হয়তো সে কাজে সাহায্য করতে পারব । আর দ্বিতীয় কাজ: যারা তৈরি করেছে এসব বট, তাদের কাছ থেকে জানতে হবে, কী নির্দেশ দিয়েছে ওদেরকে ।’

‘অর্থাৎ, যেতে হবে ইয়েমেনে,’ বললেন রাহাত খান ।

মাথা দোলালেন ম্যানিনি । ‘আমি বুড়ো মানুষ, যেতে পারব না । কিন্তু ইয়েমেনে যে যাবে তার প্রথম কাজ হওয়া উচিত, খুঁজে বের করা ওগুলোর মালিককে । তার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে,

কী কাজে ব্যবহার করতে চায় এসব ন্যানোবট ।’

আসিফ আর তানিয়ার দিকে চাইলেন রাহাত খান । ‘জর্জ হ্যামিলটন জানিয়েছে, তোমরা যেন ডক্টর ম্যানিনির ওখানে থেকে গিয়ে ন্যানোবট বিষয়ে গবেষণা করো । দি আইল্যান্ড হবে তোমাদের হোম বেস ।’ রানা আর সোহেলকে ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত দেখে নিয়ে ভারী কণ্ঠে বললেন, ‘আরও জটিল হয়ে উঠছে এই অ্যাসাইনমেন্ট । তোমাদের ইয়েমেনে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছি ।’

রানা ‘আমরা তৈরি, স্যর,’ বলবার তিন সেকেন্ড পর ‘গুড লাক, বয়েজ,’ বলে স্ক্রিন থেকে উধাও হলেন রাহাত খান ।

মিটিং শেষ ।

সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠতে না উঠতেই রানার সামনে হাজির হলো জ্যাসিটা । ‘রানা, আমিও যেতে চাই তোমার সঙ্গে ।’

‘তা সম্ভব নয়,’ সোজা মানা করে দিল রানা ।

‘সম্ভব নয় কেন?’ আহত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা । ‘আমার ভাইকে খুন করেছে । নিজ চোখে দেখতে চাই জায়েদ বিন মনযুরের মৃত্যু ।’

‘একবার বিপদে ফেলেছ, সেটাই যথেষ্ট,’ বলল রানা । ‘দ্বিতীয়বার সুযোগ পাবে না । তোমার উচিত বাড়ি ফিরে যাওয়া ।’

‘ওই দ্বীপে আমার আপন বলতে কেউ নেই,’ বলল জ্যাসিটা । ‘কাজেই তাড়াও নেই ওখানে ফেরার ।’

নিষ্ঠুর শোনাল রানার কণ্ঠ, ‘ভাল । বেড়াতে যেতে পার অন্য কোথাও ।’

ঘরে তৈরি হয়েছে অস্বস্তিকর পরিবেশ ।

রানা আর জ্যাসিটার পাশে চলে এল তানিয়া, সহজ সুরে বলল, ‘শুনেছি তুমি ম্যারিন বায়োলজিস্ট হওয়ার জন্যে পড়াশোনা করছ । উপকৃত হব তোমাকে পাশে পেলে । দরকারে জেনে নিতে

পারব ফুড চেইনের জটিল সব ব্যাপার। আমাদের সঙ্গে রয়েই যাও, জ্যাসিটা?’

তানিয়ার প্রস্তাবটা ভাল, এ ছাড়া কিছু করবার উপায়ও নেই জ্যাসিটার। একটু দ্বিধা করে মাথা দোলাল ও।

ওর মানসিক কষ্টের কথা ভেবে খারাপই লাগছে রানার। কিন্তু ভেবে-চিন্তেই মানা করেছে। মোটেও উচিত হবে না ওকে আর কোনও বিপদে ফেলে দেয়া।

সতেরো

বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনির কনফারেন্স রুম ত্যাগ করবার চল্লিশ ঘণ্টা পর কাঠের এক ট্রলারে চেপে গালফ অভ এডেনের তীরের কাছে পৌঁছে গেল রানা-সোহেল। মাত্র এক মাইল দূরে সৈকত।

কালো ওয়েট সুট, পায়ে ফিন, পিঠে অক্সিজেন ট্যাঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা সিগনালের জন্য। বাচ্চাদের শ্যাম্পু ব্যবহার করে ভালভাবে মাস্কের ভিতর দিক ডলে নিল রানা, ধুয়ে ফেলল পানি দিয়ে। নিজের এয়ার পাইপ পরীক্ষা করল সোহেল। কাজটা শেষ করে দেখে নিল পায়ের খাপে ভরা ছোরাটা।

‘কী রে, রেডি?’ জানতে চাইল রানা।

‘হঁ। ...ওদিক থেকে কোনও ইশারা পেলি?’

‘না রে, শালা, তোর বোনের মন এখনও পাথরের মত পাষাণ।’

‘চোপ্, শালা! ...ব্যাটা যদি এদিকে এসে ধরা পড়ে?’

‘পড়বে না,’ বলল রানা। ‘আগেও বসের হয়ে কাজ করেছে।’
‘নিজের নাম জানিয়েছে?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘বলেছে, “নাম লাগবে না, ঠকাব না মেজর জেনারেলের লোককে।”’

চাঁদবিহীন অন্ধকার রাত। উত্তর-পশ্চিমের ঝিরিঝিরি হাওয়ায় ভর করে আসছে মরুভূমির শুষ্ক গন্ধ। তীরে কোনও আলো নেই। ছোট ঢেউয়ে ভর করে মৃদু দুলছে কাঠের ট্রলার, নোঙর করেছে একটু আগে। আলো না দেখলে তীরের দিকে যাবে না রানা-সোহেল।

ধীরে ধীরে পেরিয়ে গেল দশ মিনিট, তারপর তীরে জ্বলে উঠল এক জোড়া বাতি। তিনবার তিন সেকেন্ডের জন্য জ্বলল এবং নিভল। নতুন করে আর জ্বলল না।

‘বসের লোক পৌঁছে গেছে,’ মুখে মাস্ক পরে নিল রানা।

একই কাজ করবার আগে সোহেল বলল, ‘একটা কথা, পানিতে যদি ওই ন্যানোবট থাকে? আর চিবুতে শুরু করে আমাদেরকে?’

‘মনে মনে প্রার্থনা কর, যাতে ওদের খিদে না থাকে,’ বলে কালো সাগরে নেমে পড়ল রানা।

এক সেকেন্ড পর প্রায় নিঃশব্দে ওর পাশে নামল সোহেলও।

দিক ঠিক করে নিয়ে রওনা হয়ে গেল দুই বন্ধু। ফিনের জোরালো স্ট্রোকে সরাসরি সামনের আঁধার সৈকত লক্ষ্য করে চলেছে।

তীরের কাছে পৌঁছে ওরা শুনল আছড়ে পড়ছে ঢেউ। কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে ভাটা। টেনে নিতে চাইছে পুবে। সাগরের বিরুদ্ধে লড়াই না করে ঢেউয়ের সাহায্য নিয়ে কোনাকুনি চলল ওরা।

চোখ রেখেছে ঢেউয়ের ওপর। বড় একটা এলেই সঙ্গে উঠে

আসছে ওপরে । কয়েক সেকেণ্ড পর ওটা সরে গেলে আবারও স্থির রাখছে নিজেদের অবস্থান ।

একটু পর পনেরো গজ দূরে সৈকত দেখল ওরা ।

নীচের জোরালো স্রোত টেনে নিতে চাইল সাগরের গভীরে ।
প্রাণপণে সামনে বাড়ল ওরা । পরের ঢেউ এলে এগোল সহজেই ।

কিছুক্ষণ লড়বার পর দেখা গেল পাথুরে বোন্ডার ।

কয়েকটা বোন্ডারের মাঝে গিয়ে উঠল রানা । খুলে ফেলল
মাস্ক, ফিন আর ট্যাঙ্ক । ওয়েট সুটের চেইন খুলে ভিতর থেকে
বের করল ছোট নাইট ভিশন স্কোপ । ভালভাবে দেখল সৈকত
এবং একটু দূরের রাস্তা ।

কিছুই নড়ছে না কোথাও । খাঁ-খাঁ করছে চারপাশ ।

সত্তর গজ দূরে পশ্চিমের রাস্তায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে পুরনো এক
ফোব্রভাগেন মাইক্রোবাস । ওটাই গন্তব্যে পৌঁছে দেবে ওদেরকে ।

ঘুরে সাগরের দিকে চাইল রানা । কয়েক সেকেণ্ড পর সৈকতে
উঠে এক দৌড়ে ওর কাছে পৌঁছে গেল সোহেল ।

‘ওই যে আমাদের গাড়ি,’ আঙুল তুলে মাইক্রোবাস দেখিয়ে
দিল রানা । ‘একটু সরে গেছি আমরা ।’

‘অসুবিধে নেই, ভাটার ভেতর সাঁতার তো কাটতে হচ্ছে না,
হাসতে হাসতেই পৌঁছে যাব ওখানে,’ বলল সোহেল ।

‘অত হাসি কীসের,’ শুকনো স্বরে বলল রানা । ‘ওই লোকের
পিছনে লেজ জুটে গিয়ে থাকলে বিপদে পড়ব । চারপাশ ভালভাবে
দেখে নে ।’ সোহেলের হাতে ধরিয়ে দিল স্কোপ ।

কয়েক মিনিট পর নিশ্চিত হলো ওরা । ওয়েট সুট খুলে
ফেলতেই পরনে থাকল শুধু সাধারণ আরবি পোশাক । ডাইভিং
গিয়ার হাতে করে বয়ে চারদিকে নজর রেখে এগোল সামনে ।
অল্পক্ষণেই পৌঁছে গেল ফোব্রভাগেন মাইক্রোবাসের কাছে ।

তিরিশ বছর আগে জন্মেছে গাড়িটা । একসময় ছিল খয়েরী

রঙের। বছরের পর বছর বালির ঘষা আর রোদে চটে গেছে রং, উধাও হয়েছে চাকাগুলোর থ্রেড। ভেঙে গেছে ভিডার্লিউ মনোগ্রাম, ভি আর নেই, রয়ে গেছে শুধু ডার্লিউ।

‘ইঞ্জিন চালু হবে তো?’ সন্দেহ নিয়ে বলল সোহেল।

‘না হলেও ক্ষতি নেই, আমি স্টিয়ারিং ধরব, তুই ঠেলবি।’ মালে দ্বীপের ভেসপার কথা মনে পড়েছে। রানার। ‘ভাবিস না, ভেসপার দ্বিগুণ চাকা আছে এতে।’

‘ব্যস, তা হলে তো আর চিন্তাই নেই! তুই দুটো বেঁধে নিবি পায়ে, আমি নেব দুটো; নিরাপদেই পৌঁছে যাব বাঘের খাঁচায়!’

মাইক্রোবাসের স্লাইড ডোর খুলে ফেলল রানা। বহু কিছুই রাখা যাবে ভিতরে। সবচেয়ে বড় সুবিধা: এই গাড়ি ওঅটর কুল্ড নয়। মরুভূমিতে অনেক বিশ্বস্ত হবে এটার এয়ার কুল্ড ইঞ্জিন।

বিসিআই চিফ গাড়িটা এখানে রাখবার দায়িত্ব দিয়েছেন যাকে, সে আশপাশে কোথাও নেই। রাস্তার বালিতে আরেকটা গাড়ির চাকার দাগ দেখল ওরা, চলে গেছে বড় একটা টিবি পেরিয়ে।

সঙ্গে মালপত্র মাইক্রোবাসে তুলল ওরা। ড্রাইভিং সিটে রানা বসতেই আরেকবার দরকারী জিনিসগুলো চেক করে দেখল সোহেল। ‘পিছনে বুট আর কাফতান, এ ছাড়া আছে দরকারী কিছু ইকুইপমেন্ট, খাবার ও পানি।’

খুঁজতে শুরু করে ভাইয়ের নিচু করল রানা, এক সেকেণ্ড পর হাতে পেয়ে গেল চাবি। সঙ্গে ছোট একটা কাগজ। ইগনিশনে চাবি ঢোকাতেই প্যাসেঞ্জার সিটে এসে বসল সোহেল।

বাতি জ্বলে কাগজের ভাঁজ খুলে লেখাটা পড়ল রানা: ‘উত্তর-পূর্বের রাস্তা ধরে সাত মাইল গেলে পেভ করা উত্তর-পশ্চিমের রাস্তা। ওটা ধরে যেতে হবে। নাম ইস্টার্ন হাইওয়ে। ত্রিশ মাইল পেভ করা, এরপর ধুলোময় পথ। পঁয়তাল্লিশ মাইল গিয়ে লুকিয়ে

ফেলতে হবে মাইক্রোবাস। উত্তর-পশ্চিমে দুই শ' নব্বুই ডিগ্রি ধরে পাঁচ দশমিক দুই মাইল গেলে সামনে পড়বে জায়েদ বিন মনযুরের কমপাউণ্ড। গুড লাক।’

‘সই করেছে?’

‘নাহ্।’ কাগজ ভাঁজ করে বুক পকেটে রেখে দিল রানা। ‘চল, রওনা হওয়া যাক।’

ইগনিশনে চাবি মুচড়ে দিতেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন। এই আওয়াজ তৈরি করে একমাত্র ফোক্সভাগেন গাড়ি। ক্লাচ টিপে প্রথম গিয়ার ফেলতেই খটাং আওয়াজ তুলল ইঞ্জিন। রওনা হয়ে গেল রানা। আশা করছে, ভোর হওয়ার অনেক আগেই পৌঁছে যাবে গন্তব্যে। সেজন্য লাগবে বড়জোর চার ঘণ্টা।

আঠারো

ভারত মহাসাগরের ঢেউগুলো থেকে মাত্র তিরিশ ফুট উপরে বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনির ডিযাইন করা এয়ারশিপে বসে চারপাশ দেখতে দেখতে খুশি হয়ে উঠেছে তানিয়া রেন্জা। ওদের গতি ঘণ্টায় মাত্র বিশ নট।

দেখতে সুদর্শন নয় এই এয়ারক্রাফট। নীচে, পিছনে বুলছে ক্রু কমপার্টমেন্ট। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বাইরে, ওপরে বিজ্ঞানীর আবিস্কৃত দুই এয়ার পড। ভিতরে হিলিয়াম গ্যাস। পড দেখতে পণ্টুনের মত। অবশ্য, বড় ও দীর্ঘ। নীচের দিক চ্যাপ্টা, উপরাংশ গোলাকার— সাহায্য করে আকাশযান এগোতে। যাত্রী

কমপার্টমেন্টের ওজন নিচ্ছে নীচের সব স্ট্রাট। এমনই ডিয়াইন, চোখ তুলে চাইলে পরিষ্কার দেখা যাবে উপরের আকাশ।

প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্ট দেখতে আধুনিক, দামি ক্রুযারের কেবিনের মত। উপরের গ্যাস ভরা পড থেকে দূরে। কেবিনের পিছনে খোলা ডেক। ওখানে সূর্যস্নান করতে পারবে যে কেউ। ইচ্ছা হলে আবার ঢুকতে পারবে কেবিনে। দূরে দুটো ডাস্ট করা ফ্যান, স্লেজ-টানা কুকুরের মত ও-দুটোই টেনে নিচ্ছে আকাশযান। দু'পাশে দুটো ডানা, তার ওপর খাড়া লেজ কাজ করছে এয়ারশিপের রাডার হিসাবে।

‘অপূর্ব! চমৎকার!’ প্রশংসা না করে পারল না তানিয়া। পাশ থেকে চোখ রেখেছে সাগরে। ওখানে উড়োজাহাজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাঁতরে চলেছে তিনটে ডলফিন। আসলে অনুসরণ করছে প্লেনের ছায়াটাকে।

আকাশযানের কন্ট্রোলে আছেন রবার্তো ম্যানিনি। মুগ্ধ হয়ে চারপাশ দেখছে তানিয়া, আসিফ আর জ্যাসিন্টা। ঝিরঝিরে হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে গা। যেন স্বচ্ছ নীল সাগরে নাচতে নাচতে চলেছে তিন ডলফিন। গতি ধরে রেখেছে অনায়াসে। কখনও কখনও লাফিয়ে উঠছে আকাশে, আবার তীরের মত গিয়ে পড়ছে দূরের সাগরে।

‘আমাদের যেন ছুঁয়ে দিতে চাইছে,’ বলল জ্যাসিন্টা।

‘হয়তো ভাবছে আমাদের বিমানের ছায়াটা ওদের মা,’ বলল আসিফ।

কথাটা শুনে হাসল তানিয়া। ডলফিনরা যে ভয় পাচ্ছে না, তা পরিষ্কার। ‘ডক্টর ম্যানিনি, এতে কাজ হবে মনে হয়।’

মাথা দোলাল জ্যাসিন্টা। আগের চেয়ে ভাল ওর মন।

মুচকি মুচকি হাসছে আসিফ।

‘ব্যাপার কী?’ জানতে চাইল তানিয়া। ‘তোমাকে দেখে মনে

হচ্ছে হাঁড়ির সব মাছ খেয়ে ফেলা হলো বেড়াল। কেউ জানে না কী কীর্তি করেছে।’

‘ভাবছিলাম, আসলে কপাল ভাল আমার,’ চওড়া হাসি দিল আসিফ। ‘পাশে দুই সুন্দরী মেয়ে! আর ওদিকে মরুভূমির মাঝে বালি খেয়ে গলা শুকিয়ে ফেলছে রানা আর সোহেল।’

হেসে ফেলল তানিয়া।

‘দুই সুন্দরীর সঙ্গে পাওয়ার কথাটা বাদই দিই,’ বলল আসিফ, ‘মাল্টি মিলিয়ন ডলারের খেলনা নিয়ে খেলছি। আর ওদিকে ঘামে ভেজা দুর্গন্ধযুক্ত উটের পিঠে কঠিন জীবন পার করেছে ওরা।’

‘কথাটা মিথ্যে নয়,’ সায় দিল তানিয়া। ঘুরল বিজ্ঞানীর দিকে। ‘আর কতটা দূরে যেতে হবে, ডক্টর?’

‘দরকার পড়লে দিনের পর দিন আকাশে থাকতে পারব,’ বললেন ম্যানিনি। ‘অবশ্য, আমি বলব আর একঘণ্টা পর আবারও দ্বীপে ফিরে যাওয়াই ভাল। অন্য দুটো এয়ারশিপ তৈরি রাখবে তুরা। আগামীকাল আবারও বেরোব। দরকার হলে আকাশে তুলব তিনটে এয়ারশিপ।’

‘ওগুলো চালাবার মত পাইলট আপনার দ্বীপে আছে?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘পাইলট?’ ভুরু কুঁচকে ফেললেন বিজ্ঞানী। ‘পাইলট দিয়ে কী হবে?’

‘তা হলে চালাবে কে?’

‘যে-কেউ পারবে,’ বললেন ম্যানিনি, ‘গাড়ি বা বোটের মত করেই তৈরি করেছে। বাড়তি কোনও ট্রেনিং লাগবে না।’

‘আগামীকাল এয়ারশিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে আমাদের প্রাথমিক লেসন দেবেন না?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘নিশ্চয়ই!’

‘এখন থেকেই শিখতে পারি?’

‘কেন নয়?’

বিজ্ঞানীকে নিজেদের সঙ্গে পেয়ে খুশি হয়েছে তানিয়া। মিথ্যা বলেননি মানুষটা, ওদের এই এক্সপিডিশনে সব ধরনের সহায়তা দিচ্ছেন। এরই মাঝে তাঁর দ্বীপটাকে ঘন্টায় সাড়ে চার নট গতিতে চালু করে দিয়েছেন উত্তর-পশ্চিম দিকে। সাগরের ওদিকে রয়েছে নুমার ক্যাটাম্যারানে হামলা করা সেই ন্যানোবটের পাল। ম্যানিনি ছুটি বাতিল করার খবর দেয়ায় দ্বীপে ফিরে এসেছে তাঁর বারোজন ক্রু। রোবটগুলোর ওপর চোখ রাখবে তারা।

সাগরের বুকে চোখ রেখেছে তানিয়া। এয়ারশিপের ছায়ার সঙ্গে ছুটছে তিন ডলফিন। মনে হলো এবার লাফিয়ে উঠবে ওদের একটা, কিন্তু ঠিক তখনই হঠাৎ করেই ভেঙে গেল ওদের দল। ঝট করে ঘুরে দেখতে না দেখতে উধাও হলো।

‘খেয়াল করেছে, আসিফ?’ জানতে চাইল তানিয়া।

‘অনেক গতি তুলতে পারে,’ মাথা দোলাল আসিফ।

‘আমাদের ওপর বিরক্ত হয়ে বিদায় নিয়েছে,’ মন্তব্য করল জ্যাসিন্টা।

সাগরের দিকে চেয়ে আছে তানিয়া। ঢেউয়ে কী যেন সামান্য তফাৎ। কালো হয়ে উঠছে সাগর। না, তাও নয়, ধূসর রঙের ছাপ পড়েছে চারপাশে। পানি এখন আর নীল নয়।

পরিবর্তন বুঝে বিপদের আশঙ্কা করেই আরেক দিকে পালিয়ে গেছে ডলফিন।

মনের ফুর্তি গায়েব হয়ে গেল তানিয়ার, ব্যস্ত কণ্ঠে বিজ্ঞানীকে বলল, ‘গতি কমান, গতি কমান, ডক্টর; আমরা বোধহয় পৌঁছে গেছি ন্যানোবটের এলাকায়।’

উনিশ

‘কে জানে, ছ্যার-ছ্যার করতে করতে কোথায় চলেছি এই ছ্যাকরা গাড়িতে চেপে,’ ফোন্সভাগেনের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে উদাস সুরে বলল সোহেল। চেয়ে আছে দূরের আঁধারে।

‘জানিস না?’ তুমুল গতি তুলে ড্রাইভ করছে রানা, ‘চলেছিস মরুভূমির উডস্টকের মত এক জায়গায়। প্রার্থনা কর ওদিকে যেন কম-থাকে লোকজন। আর সেখানে তোর জন্যে অধীর হয়ে অপেক্ষা করছে অপূর্ব সুন্দরী এক আরব মেয়ে!’

‘তাতে তোর কী রে, শালা?’

‘বন্ধুর খুশিতেই আমার খুশি।’

‘ওই সুন্দরী আমাকে বিয়ে করে খতম করে দেবে আমার জীবনের সব আনন্দ, এই জন্যেই তোর আনন্দ? শালা, বেঈমান!’

একটু পর মাঝরাত হবে। পাকা রাস্তা ফুরিয়ে যাওয়ার পর অনুসরণ করেছে ওরা মরুভূমির বালির সরু পথ। কিছুক্ষণ আগে সরে গেছে বালিতে চাকার দাগ পড়া সেই পথ থেকে। সামনে বালির একটা ঢিবি পেয়ে ওটার পিছনে গিয়ে থামল রানা।

গাড়ি থেকে নেমে চাকার দাগ মুছতে শুরু করে ঢিবির ওদিকে চলে গেল সোহেল। এদিকে মাইক্রোবাস থেকে তারপুলিন বের করে বালিতে ওটা বিছিয়ে দিল রানা। তার উপর আচ্ছামত মাখাল আঠা। কাজটা শেষ করে তারপুলিন উল্টো করে ফেলে খসখস আওয়াজ তুলে বালির উপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল কিছু

দূর। মসৃণ বালিতে ভরে গেছে তারপুলিনের নীচের অংশ। সম্ভ্রষ্ট হয়ে তেরপল উল্টে নিয়ে মাইক্রোবাসের ছাতে রাখল বালির প্রলেপ দেয়া জিনিসটার মাঝ অংশ। ঢাকা পড়েছে গাড়িটা। বার-বার আঁজলা ভরা বালি তুলে তারপুলিনের চার কোনায় স্থূপ তৈরি করল রানা। এখন বাতাস এলেও চট করে সরবে না জিনিসটা।

ওর কাজ শেষ, এমন সময় আবার ফিরল সোহেল। চোখ সরু করে দেখে নিল চারপাশ। ‘কী রে, ভিডাল্লিউ কই?’

‘জাদুর কাঠি দিয়ে অদৃশ্য করেছি,’ বলে ব্যাকপ্যাক পিঠে তুলে নিল রানা। ‘কেউ দেখবে না।’

‘এমন কী আমরাও না,’ বলল সোহেল। ‘বাকি জীবন হাঁটব মরুভূমিতে। আর সেই জীবন মাত্র সুদীর্ঘ দুই দিনের!’

‘সেক্ষেত্রে খুব কাঁদবে তোর বোন! কিন্তু আমি তা চাই না।’ জিপিএস রিসিভার বের করে স্ক্রিনে জায়গাটার উপর পিন বসিয়ে দিল রানা। ভুল হবে না খুঁজে নিতে।

বালির ছোট টিবির মত দেখতে তারপুলিনে ঢাকা গাড়ির পাশ থেকে ব্যাকপ্যাক তুলে কাঁধে ঝুলিয়ে নিল সোহেল। বসে স্লোও পরল রানা। এই জুতো আধুনিক কার্বন ফাইবার ডিশাইনের। পুরনো আমলের টেনিস র‍্যাকেটের মতই, কাজ করবে খুব ভালভাবে। নরম বালিতে ডুবে যাওয়ার বদলে প্রতি পদক্ষেপে ওজন নেবে সব অংশে, ফলে হাঁটা হবে অপেক্ষাকৃত সহজ।

সোহেল ওর জুতো পরে নেয়ার পর রওনা হয়ে গেল দু’জন।

নব্বুই মিনিট পর পৌঁছল এক সারি টিবির সামনে। প্রথম টিবির চূড়ায় উঠবার পর দূর থেকে এল হেলিকপ্টারের ইঞ্জিনের আওয়াজ। ওটা আছে দক্ষিণে।

শব্দের উৎস দেখবার জন্য ওদিকে চাইল ওরা।

আকাশে টিপটিপ করা লাল আলোটা প্রথমে দেখল রানা।

ওটা দুই বা তিন মাইল দূরে। উচ্চতা পাঁচ শ' ফুট। যেন সোজা তেড়ে আসছে ওদের দিকেই।

‘শুয়ে পড়!’ বলে ভূমিশ্যা নিল রানা। সাইডওয়াইণ্ডার সাপের মত গেঁথে যেতে চাইছে বালির বুকে।

একই কাজ করল সোহেল।

আধমিনিট পেরোবার আগেই গলা পর্যন্ত ঢাকা পড়ল ওদের দেহ বালিতে। অবশ্য এই ক্যামোফ্লেজ কাজ করবে কি না, নিশ্চিত নয় ওরা। সরাসরি ওদের দিকেই আসছে হেলিকপ্টার।

‘যাহ্, ধরা পড়ে যাব তো!’ রানার পাশে ফিসফিস করল সোহেল।

কোমরে চলে গেল রানার হাত, স্পর্শ করল হোলস্টারের ওয়ালথার পি.পি.কে.। অবশ্য, কপাল খুব ভাল না হলে পিস্তলের বুলেট ঠেকাতে পারবে না হেলিকপ্টার।

লাল আলোয় তাক করল পিস্তল। কপ্টারের দু’পাশে জ্বলছে দুই সবুজ বাতি। গুলি করলে ঠিক মাঝে করতে হবে। কিন্তু তাতে মারাত্মক ক্ষতি না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

পিস্তল বের করেছে সোহেলও।

রানা ভাবল: পাইলট ওদের যদি স্পট করে থাকে, তা হলে যথেষ্ট কাছে চলে আসার পরেও ফ্লাড লাইট জ্বালছে না কেন?

‘ন্যাভিগেটিং বাতি জ্বলে আসছে কেন?’ বলল সোহেল, ‘গুলি করতে যেন আমাদের সুবিধে হয়, সেজন্যে?’

‘হয়তো ভুলে গেছে যে ওগুলো জ্বলছে?’

হেলিকপ্টার আর মাত্র সিকি মাইল দূরে। কমিয়ে আনছে উচ্চতা। মনে হলো একটু পরিবর্তন করল কোর্স।

‘এবার আর ধরা না পড়ে উপায় নেই রে,’ দুঃখিত কণ্ঠে বলল সোহেল।

চূপ করে আছে রানা। কয়েক সেকেন্ড পর মাথার উপর দিয়ে

চলে গেল হেলিকপ্টার। পিছনে অন্য কোনও আকাশযান নেই।
লাফ দিয়ে বালি ছেড়ে উঠে পিছু নিল রানা। দৌড়ের গতিতে
নেমে এল বালির ঢিবি থেকে। উঠতে লাগল পরের ঢিবিতে।
চূড়ায় উঠে এসে শুয়ে পড়ে চাইল সামনে। তিন সেকেণ্ড পর ওর
পাশে পৌছে ধূপ করে শুয়ে পড়ল সোহেল।

আকাশে থেমে নামতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার। সামনেই
মরুভূমির বুকে প্রকাণ্ড জাহাজের মত নিচু এক টিলা।

নিচু ওয়াটের কয়েকটা বাতি জ্বলে নিয়েছে হেলিকপ্টার।
জাহাজের মত টিলার সমতল জায়গায় পড়ছে আলো। খুব
সাবধানে ল্যাণ্ড করছে যান্ত্রিক ফড়িং।

‘এটাই জায়েদ বিন মনযুরের কমপাউণ্ড,’ বলল রানা।

‘আমরা একা নই, অন্য আরেক দলও আসছে,’ বলল
সোহেল।

দক্ষিণ-পশ্চিমে দেখা গেল আলো। মনে হলো ছোট কোনও
কনভয়। আট-নয়টা গাড়ি। মরুভূমিতে উড়তে শুরু করা ধুলোয়
বোঝা গেল না কয়টা হেডলাইট।

‘নুমার চিফ জর্জ হ্যামিলটনের লোক বলেছিল, এদিকে লোক
তেমন আসে না,’ শুকনো কণ্ঠে বলল সোহেল।

‘এখন ওদের অফিস-টাইম,’ সোহেলের স্বরের চেয়েও অনেক
শুকনো রানার কণ্ঠ, ‘আশা কর, আমাদের ধরতে এখানে
আসেনি।’

কিছুক্ষণ পর টিলার সামনে পৌছল গাড়িগুলো। হেডলাইটের
আলোয় ব্যস্ত হয়ে উঠল কারা যেন। শুরু হয়েছে চেষ্টামেচি।
ভাষাটা আরবি। ছোট্টাছুটি করছে। চারপাশে উড়ছে ধুলোবালি।
গাড়িতে করে আগত লোকগুলোকে অভ্যর্থনা জানাতে বড় একটা
গুহা থেকে বেরিয়ে এল সশস্ত্র একদল লোক।

উপরের টিলার মাথায় ল্যাণ্ড করেছে হেলিকপ্টার। বন্ধ করে

দেয়া হলো ইঞ্জিন। নেমে পড়ল দু'জন। কপ্টারের দরজা আটকে দিয়ে রওনা হলো। পাথুরে টিলার গায়ে গর্তের মত এক জায়গায় ঢুকে উধাও হয়েছে।

‘ওখানে কোনও সুড়ঙ্গ বা দরজা আছে,’ বলল রানা। ‘এদিকের এরা গাড়ির লোকগুলোকে নিয়ে ব্যস্ত, চল, ঢুকে পড়ি।’ উঠে পড়ল রানা, প্রায় দৌড়ের গতি তুলে নামতে শুরু করেছে খাড়া ঢিবি থেকে।

ওর পিছু নিল সোহেল। ‘কী করবি ভাবছিস? ওই দলের লোক হয়ে যাব?’

‘না,’ মাথা নাড়ল রানা। ‘আগে যাব ল্যাণ্ডিং প্যাডে। কপ্টারের লোক দু'জন টিলা থেকে না নেমে একটা জায়গায় গিয়েই মিলিয়ে গেছে। ওপরে ওখানে বোধহয় দরজার মত কিছু আছে।’

বিশ

ভারত মহাসাগরের আকাশে নাক তুলেছে বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনির এয়ারশিপ, ধীরে ধীরে উঠে গেল এক শ' ফুট উচ্চতায়। উড়োজাহাজ হালকা রাখতে গিয়ে বাধ্য হয়ে কিছু সমস্যার মুখে পড়েছিলেন ম্যানিনি। তার একটি: এই বিমান ভাসিয়ে রাখতে চাইলে এগোতেই হবে, নইলে নেমে যাবে।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়ার পর ভেসে যেতে লাগল এয়ারশিপ। নামতে শুরু করেছে আবারও।

অস্বস্তির মাঝে পড়ে গেল যাত্রীরা।

‘আমরা কিন্তু নেমে যাচ্ছি,’ সতর্ক করবার সুরে বলল তানিয়া রেজা। সত্তর ফুট নীচে শান্ত, কালো সাগর। ভুল না হয়ে থাকলে ওই পানি অমন কালো হয়েছে ভয়ঙ্কর ন্যানোবটের কারণে। ওদিকে তাকিয়ে গলা শুকিয়ে গেল ওর। বিমান একবার সাগরে পড়লেই...

‘এক সেকেন্ডে ঠিক করে নিচ্ছি,’ বললেন ম্যানিনি। সামনের দিকে ঠেলে দিলেন একটা লিভার। বিমানের সামনে এবং পিছনে ‘ঝটাং’ আওয়াজ তুলে খুলে গেল বড় ট্রাকের মত দুটো কমপার্টমেন্ট। ‘হুইশ্!’ শব্দে লাফিয়ে আকাশে উঠল পেটমোটা দুটো মস্ত বেলুন। ভিতরে হিলিয়াম গ্যাস। উঠতে চাইছে অনেক উপরে, কিন্তু নাইলন দড়ি ফুরিয়ে যেতেই থামতে হলো। ওজন নিল এয়ারশিপের। টানটান হয়ে উঠেছে দড়ি। বিমান নেমে যাওয়ার গতি কমল, তারপর থেমেই গেল স্থির হয়ে।

‘এই দুটোর নাম দিয়েছি বাতাস নোঙর,’ গর্বের সঙ্গে বললেন ইটালিয়ান বিজ্ঞানী। ‘আবারও রওনা হলে নিজে থেকেই চূপসে যাবে। তার মানে বুঝতেই পারছেন, সাগরে গিয়ে পড়ছি না।’

কথাটা শুনে স্বস্তির ছাপ ফুটল সবার চোখে-মুখে।

বড় করে শ্বাস ফেলল আসিফ আর জ্যাসিন্টা।

‘এবার স্যাম্পলিং কিট নিয়ে কাজে নামব,’ বলল আসিফ।

চল্লিশ ফুট উচ্চতায় স্থির হয়েছে এয়ারশিপ। সামান্য করে হিলিয়াম গ্যাস ছাড়তে শুরু করে বিমান নামিয়ে আনলেন ম্যানিনি সাগর থেকে মাত্র পাঁচ ফুট উপরে। ওখানেই স্থির হলো বিমান। ‘আরও নামতে হবে?’ জানতে চাইলেন তিনি।

‘না, ঠিক আছে,’ বলে পিছনের প্ল্যাটফর্মে চলে গেল আসিফ। ওর হাতে টেলিস্কোপিং স্যাম্পল কালেক্টর।

‘সাবধান,’ বলল জ্যাসিন্টা, চোখে ভয়।

‘ভুলেও কিনারায় যেয়ো না, আসিফ,’ সতর্ক করল তানিয়া।

মাথা দোলাল আসিফ, কিন্তু উল্টো কাজই করল। গিয়ে দাঁড়িয়েছে প্ল্যাটফর্মের একেবারে প্রান্তে।

ভীকু পায়ে ওর পাশে পৌঁছে গেল তানিয়া। ওর মন চাইল স্বামীর কোমরে দড়ি বেঁধে টেনে আনবে। কিন্তু তার উপায় নেই। একবার দেখল চারপাশ।

ওরা আছে ভারত মহাসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় ঘূর্ণিপাকের ওপর। এখান থেকেই তৈরি হয় মস্ত সব সাইক্লোন। সাধারণ সময়ে বড় শান্ত সাগরের এই অংশ। বাতাস বা ঢেউ থাকে না বললেই চলে।

নীলাকাশ থেকে গনগনে আগুন ঢালছে সূর্য। সাগর এখন তেলতেলে, বড় বেশি শান্ত আর কালো। মৃদু বাতাস না থাকলে মনে হতো, থেমে গেছে গোটা পৃথিবী। বাতাসে সরছে এয়ারশিপ। চট করে বুঝবার উপায় নেই, মাত্র পাঁচ ফুট নীচে নিশ্চিত মৃত্যু।

প্লাস্টিকের দণ্ডের শেষপ্রান্তে আটকানো ভায়ালটা পানিতে নামিয়ে দিল আসিফ। তিন সেকেন্ড পর তুলল। বোতলের উপরের অংশ সাবধানে ধরে খুলে নিল দণ্ড থেকে। বাড়তি পানি ঝরিয়ে নিতে চাইল সাগরে। তারপর স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিল বোতলটা।

পুরু প্লাস্টিকের গ্লাভস পরেছে তানিয়া, স্বামীর হাত থেকে নিল স্যাম্পলের বোতল। রবার্তো ম্যানিনির কাছ থেকে আগেই পেয়েছে মাইক্রোফাইবার তোয়ালে, ওটা হেঁকে নেবে মাইক্রো-বট। সেই তোয়ালেতে অল্প কিছুটা পানি ঢালল তানিয়া।

কিন্তু পাওয়া গেল না কোনও ন্যানোবট।

অবশ্য দেখাও প্রায় অসম্ভব।

এক শ'টা থাকতে পারবে পিনের ডগায়।

বোতলের পানির দিকে চাইল তানিয়া। ‘কিছু নেই বলেই তো মনে হয়।’

বোতলের মুখে রাবারের ছিপি শক্ত করে আটকে রেখে দিল স্টেইনলেস স্টিলের ছোট বাস্কে। তোয়ালে রাখল আরেক বাস্কে। কিনারা থেকে নীচের সাগর দেখল তানিয়া আর আসিফ। নদীর পাড় বা উঁচু জায়গা থেকে ওভাবে পানির দিকে তাকায় সবাই। পানি পরিষ্কার মনে হলো। কিন্তু ডলফিন যেখানে পালিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সরে এসেছে ওরা দু' মাইলের মত। চিন্তিত হয়ে উঠেছে স্বামী-স্ত্রী।

‘ওরা পানি-সমতলে নেই,’ কয়েক সেকেণ্ড পর বলল তানিয়া। ‘সরাসরি উপর থেকে নীচে দেখেছি, কিন্তু অন্য কোনও অ্যাংগেলে দেখা যাবে না। মনে হচ্ছে সাগরের পানি ঠিকই আছে।’

ককপিট থেকে সায় দিলেন ম্যানিনি: ‘বেশ কয়েক ফুট নীচে আছে। আরও গভীর থেকে স্যাম্পল তুলতে হবে। আপনারা চাইলে একেবারে নেমে গিয়ে...’

‘থাক-থাক!’ কাতরে উঠল জ্যাসিটা। ‘প্লিয! আমরা যদি সাগরে পড়ে যাই? বা কোনও ভুল হয়?’

জ্যাসিটা আছে কেবিনের মূল অংশে, দেয়ালের পাশে। এদিকটা দেখছে। ভয়ে প্রায় সবুজ হয়ে গেছে চেহারা।

‘এখান থেকেই তুলে আনতে পারব,’ বলল আসিফ, পুরোপুরি নিশ্চিত। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মের শেষে। বুক বেরিয়ে রইল সাগরের ওপর। লাঠির প্রান্তে নতুন বোতল আটকে নিয়ে নামিয়ে দিল সাগরে। আশা করছে এবার তুলে আনতে পারবে বোতল ভরা ন্যানোবট।

প্ল্যাটফর্মের কিনারায় চলে এসেছেন ম্যানিনি। তানিয়াও।

স্যাম্পল তুলে আনল আসিফ। তীক্ষ্ণ চোখে দেখল ভিতরের পানি।

না, পরিষ্কার।

কিছুই নেই।

পানিটুকু ফেলে দিয়ে হেঁচড়ে সামনের বাড়ল। প্ল্যাটফর্ম থেকে
প্রায় বেরিয়ে গেল ওর কোমর।

আপত্তি করল জ্যাসিণ্টা, ‘আসলে এসব কী হচ্ছে? আপনারা
কি সত্যিই ওই জিনিস বিমানে তুলতে চান?’

রানা বলেছিল, যখন-তখন ভারসাম্য হারাবে ওই মেয়ে, মনে
পড়ল তানিয়ার। একবার সাহসী হয়ে উঠছে, আবার পরক্ষণে
সিঁটিয়ে যাচ্ছে ভয়ে।

‘কাজটা কাউকে না কাউকে তো করতে হবে,’ বলল তানিয়া।

‘আমরা নেভি বা কোস্ট গার্ডদের বলতে পারি কাজটা
করতে।’

‘তানিয়া, শক্ত করে ধরো তো আমার দুই পা,’ বলল আসিফ।
‘আরও গভীর থেকে তুলতে হবে পানি।’

হামাগুড়ির ভঙ্গিতে বসে নিজের ওজন আসিফের পায়ে
চাপিয়ে দিল তানিয়া। দুই হাতে ঠেসে ধরেছে স্বামীর উরুর পিছন
অংশ। জ্যাসিণ্টাকে কী যেন বিড়বিড় করে বলতে শুনল। পিছিয়ে
গেছে মেয়েটা। যেন ভয় পাচ্ছে কুমিরের মত লাফিয়ে উঠে সাগর
থেকে হামলা করবে ন্যানোবট।

যতটা সম্ভব নীচে প্লাস্টিকের লাঠি নামিয়ে দিল আসিফ। ওর
দীর্ঘ হাত আর লাঠি মিলে দৈর্ঘ্যে হলো কমপক্ষে আট ফুট। গভীর
পানি থেকে তুলে আনল বোতল।

তানিয়া টের পেল, টানটান হয়ে গেছে আসিফের মাংসপেশি।
এবারের স্যাম্পল কালচে মনে হলো।

‘বোধহয় পেয়ে গেছ।’

লাঠি পিছিয়ে আনতে লাগল আসিফ।

দূরে দাঁড়িয়ে কাঁপছে জ্যাসিণ্টা। পিছিয়ে গেল আরেক কদম।

‘ভয় নেই,’ সান্ত্বনা দিলেন ম্যানিনি।

ঠিক তখনই বিকট ‘বুম!’ আওয়াজে থরথর করে কেঁপে উঠল

এয়ারশিপ। হঠাৎ করেই কাত হয়ে গেল একপাশে। যেন এক পাশের চাকা হারিয়েছে কোনও গরুর গাড়ি।

পিছলে গেল আসিফ, গড়াতে শুরু করে লাগল গিয়ে একপাশের দেয়ালে। আরেকটু হলে পড়ে যেত সাগরে। নিজেও হড়কে গেছে তানিয়া, তারই ভিতর প্রাণপণে শক্ত করে ধরে রেখেছে স্বামীর বেল্ট। অন্য হাতে ধরেছে ডেকের একটা খুঁটি।

চিল-চিৎকার ছেড়ে হোঁচট খেয়ে মেঝেতে পড়েছে জ্যাসিন্টা। আঁকড়ে ধরেছে কেবিনের কবাট। স্টিয়ারিং কন্সোল ধরে নিজেকে সামলে নিতে চাইছেন ডক্টর ম্যানিনি।

‘কিছু ধরো!’ চিৎকার করে স্বামীকে বলল তানিয়া।

‘ধরতে হলে তোমারই ধরতে হবে,’ পাল্টা চেষ্টা আসিফ। ‘আমার হাতের কাছে কিছুই নেই।’

আবারও জোরালো ‘বুম!’ আওয়াজ হলো। সমতল হলো এয়ারশিপ। পরক্ষণে নীচে নামতে লাগল পিছনের অংশ। এভাবে পিঠ থেকে ময়লা ফেলে ডাম্প ট্রাক। সারা শরীরের সমস্ত জোর খাটিয়ে আসিফের বেল্ট আঁকড়ে ধরে রাখল তানিয়া। অন্য হাতে জাস্টে ধরেছে খুঁটি। সাধারণ মেয়ের তুলনায় অনেক শক্তিশালী তানিয়া, কিন্তু আসিফের ছয় ফুট দুই ইঞ্চি শরীরের দুই শ’ চল্লিশ পাউন্ডের ওজন ওর পক্ষে ধরে রাখা অসম্ভব। পিছলাতে শুরু করে প্ল্যাটফর্ম থেকে পড়ে যেতে লাগল আসিফ। তানিয়া টের পেল, বেল্ট কেটে বসছে ওর আঙুলে। ব্যথায় পাগল হয়ে উঠছে ও।

তানিয়ার পিছনে পৌঁছে গেছে জ্যাসিন্টা আর ম্যানিনি, দু’জনই সাহায্য করতে চাইছে।

আকাশের দিকে একবার মুখ তুলল তানিয়া। মেলা থেকে কেনা বাচ্চাদের গ্যাস বেলুনের মত ভেসে যাচ্ছে বিজ্ঞানীর বাতাস নোঙর। ওটার জন্যেই সাগরে নামতে শুরু করেছে এয়ারশিপের পিছনের অংশ।

চিৎকার করে বলল তানিয়া, ‘সামনে বাড়তে শুরু করুন, মিস্টার ম্যানিনি!’

‘ঠিক-ঠিক!’ এক দৌড়ে ককপিটে গিয়ে ঢুকলেন বিজ্ঞানী।

‘জ্যাসিণ্টা, আমাকে সাহায্য করো!’

ম্যানিনি ককপিটে ঢুকতেই তানিয়ার পিছনে বসে পড়েছে জ্যাসিণ্টা, খপ্প করে আসিফের ডান পা ধরে পিছিয়ে যেতে চাইল। ওদিকে ঘুরতে শুরু করেছে সামনের ডাস্ট ফ্যান, খুব ধীরে ধীরে সামনে বাড়ছে এয়ারশিপ। উপরের দিকে উঠছে বলে আরও কঠিন হয়ে উঠেছে আসিফকে ধরে রাখা।

তানিয়ার মনে হলো, কোমর থেকে ছিঁড়ে পড়বে ওর দেহ। তারই মাঝে দেখল, আরও ভাল করে আসিফের পা ধরতে চাইছে জ্যাসিণ্টা।

গতি বাড়ছে এয়ারশিপের। তবুও নেমে চলেছে পিছন দিক। পানি থেকে মাত্র এক ফুট উপরে আছে এখন। পানির কাছ থেকে মুখটা সরিয়ে ‘উল্টো সিটআপ’ দিতে চাইছে আসিফ।

গতি আরও বাড়তেই সমতল হতে লাগল এয়ারশিপের মেঝে।

‘এবার টানো!’ চিৎকার করে বলল তানিয়া। ব্যবহার করছে শরীরের সমস্ত শক্তি। আসিফের গোড়ালি চেপে ধরে ভিতরের দিকে টেনে নিতে চাইছে জ্যাসিণ্টা।

উঠে আসছে আসিফ। পরের পাঁচ সেকেন্ডে ওর কাঁধ-মাথা উঠে এল প্ল্যাটফর্মে। তানিয়া দেখল, এত বিপদেও স্যাম্পলের লাঠি হাতছাড়া করেনি ওর স্বামী।

‘ফ্যালো তো ওটা!’ ধমক মারল তানিয়া।

‘জীবনেও না, এমনি এমনি এত কষ্ট করেছি?’ বড় করে দম নিল আসিফ।

ইতিমধ্যে বেশ গতি তুলেছে উড়োজাহাজ। সামনের দিক

আর পিছনের দিক সমতল হয়েছে।

আসিফ নিরাপদ দেখে বেণ্ট ছাড়ল তানিয়া। রাগী স্বরে বলল, ‘বোকা, আসিফ রেজা, আবারও যদি দেখি এমন ঝুঁকি নিয়েছ...’ ওর চোখ ছলছল করছে অশ্রুতে।

‘আর জীবনেও না, তবে ইচ্ছে করে তো ঝুঁকি নিইনি,’ হাসি-হাসি মুখ করল আসিফ। ককপিটের দিকে চাইল। ‘কী হয়েছিল, ডক্টর?’

‘জানি না,’ গম্ভীর সুরে বললেন বিজ্ঞানী। ‘কী করে যেন ছুটে গেল বাতাসের নোঙর। কোনও ধরনের ম্যালফাংশন।’

স্বামীর দিকে চেয়ে আছে তানিয়া। ভাবছে, কপাল ভাল যে বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছে ওরা। কিন্তু একটু আগে ওটা শুধু দুর্ভাগ্য ছিল, নাকি সামনে অপেক্ষা করছে আরও বড় কোনও সমস্যা? স্যাবোটাজ করেছে রবার্তো ম্যানিনির ত্রুড়া? বন্দি করা হয়েছে ডিবোয়ে আর হ্যাভেলাকে। হয়তো আগেই তাদের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে ত্রুদের কেউ। যা ভাবছে, কাউকে বলল না তানিয়া। একবার দেখল বোতলের কালচে পানি। মনে মনে বলল, আসিফ ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করব না!

একুশ

গনগনে রাগে জ্বলছে বুক, কিন্তু নির্বিকার চেহারা য় গুহার করিডর ধরে হেঁটে চলেছে জায়েদ বিন মনযুর। অফিসের দরজা খুলে ডেস্কের পিছনে গিয়ে বসল নিজের চেয়ারে।

পিছনে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল খালিফ।

‘এরা কি ইস্কুলের ছাত্র ভেবেছে আমাকে?’ নিচু স্বরে বলল জায়েদ। ‘মাস্টারের কথা মেনে চলতে হবে?’

‘তা নয়,’ নরম সুরে বলল খালিফ।

‘তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে দিয়েছে, তারা আসছে, আমি যেন তৈরি থাকি,’ রাগ সামলে রাখল জায়েদ। ‘ওদের কথা মত আমাকে নাচতে হবে, তাই না?’

অফিসের পাশের দেয়ালে কাঁচের মস্ত জানালার ওদিকে বিশ ফুট নীচে ফ্যাকটরির মেঝে। তকতকে পরিষ্কার ঘরে মেশিনের সামনে ব্যস্ত বেশ কিছু লোক। পরনে হ্যাযম্যাট, মানে হ্যাযার্ডাস ম্যাটেরিয়াল প্রুফ-সুট। তৈরি করছে ন্যানোবট। মিশরের নাসের হুদের বিশাল আসওয়ান ড্যাম ভাঙতে পাঠানো হবে ওগুলোকে।

‘তারা একটা অনুরোধ করেছে,’ বলল খালিফ। ‘আর তাদের কথা বা পরের কাজ দেখে আমার মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গে দেখা করা আপনার উচিত।’

‘তুমি মস্ত বোকামি করেছ,’ বলল জায়েদ। ‘উচিত হয়নি আমার হয়ে কথা দেয়া।’ জীবনে বহুবার রাগ হয়েছে ওর, কিন্তু আগে কখনও খালিফের দিকে অভিযোগের আঙুল তাক করেনি। কয়েক মুহূর্ত পর বলল, ‘সাফল্যের যত কাছে যাচ্ছি, ততই দেখছি মারাত্মক সব ভুল করছে আমার অনুচররা। ভুলতে বসেছে কার জায়গা কোথায়।’

পাল্টা কিছু বলতে গিয়েও মুখ বুজে রাখল খালিফ। মনের জোরে দমন করল রাগ। শান্ত রাখতে চাইছে নিজেকে।

‘যথেষ্ট বলেছ, এবার আমাকে একা থাকতে দাও,’ হাতের ইশারায় দরজা দেখিয়ে দিল জায়েদ।

বরাবরের মত সামান্য কুর্নিশ না করেই সোজা হয়ে দাঁড়াল খালিফ, নরম সুরে বলল, ‘না, আপনার বাবা মারা যাওয়ার পর,

সেই ছোটবেলা থেকে আপনাকে আগলে রেখেছি আমি। আপনার বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, সবসময় রক্ষা করব আপনাকে। তা এমন কী আপনার নিজের কাছ থেকেও। আর সে কারণেই এবার যা বলার আমি বলব, আর আপনি চুপচাপ শুনবেন। সব শুনবার পর স্থির করবেন কী করা উচিত।’

হতবাক হয়ে খালিফের দিকে চাইল জায়েদ। ওর মনে হলো, এখনই বেয়াদব লোকটাকে খুন করে ফেলা উচিত। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে।

‘এই কনসোর্টিয়াম আমাদেরকে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়েছে,’ শুরু করল খালিফ। ‘দিয়েছে, যাতে আপনি সফল হন। প্রত্যেকে ক্ষমতামালা এবং নিষ্ঠুর। প্রয়োজনে দেরি করে না পেশি দেখাতে।’

অবাক হয়ে মন্ত-মুন্সের মত খালিফের দিকে চেয়ে আছে জায়েদ। বহু বছর আগে এভাবেই লোকটার কথা শুনত।

‘আজ তাদের কেউ কেউ এসেছে ক্ষতি করতে,’ বলল খালিফ। ‘একাট্টা হয়েছে সবাই।’

অফিসের দেয়ালে চোখ পড়ল জায়েদের। পুরনো আমলের অস্ত্র রাখা ওখানে। বাঁকা একটা তলোয়ারের উপর স্থির হলো ওর চোখ।

‘সেক্ষেত্রে খুন করব ওদেরকে,’ বলল জায়েদ। ‘নিজ হাতে টুকরো টুকরো করব।’

‘তাতে আমাদের কী লাভ হবে?’ বলল খালিফ, ‘একা আসেনি তারা। প্রত্যেকের সঙ্গে সশস্ত্র একদল লোক। সংখ্যায় আমাদের সমানই হবে। লড়াই হলে জিতবে না কোনও দল। আর যদি জিতেও যাই, তদন্ত করবে অন্যরা। হয়তো চাইবে প্রতিশোধ নিতে।’

অনেক দিন পর নিজেকে অসহায় মনে হলো জায়েদের।

কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে ওকে। কিন্তু লোকগুলো জানে না, হামলা করতে এসে নিজেরাই পড়েছে মস্ত বিপদের মুখে।

‘খুব খারাপ সময়ে চাপ দিচ্ছে ওরা,’ বলল জায়েদ। ‘অন্যান্য অতিথিদেরও আসার কথা।’

‘সেসব সামলে নেব আমরা,’ বলল খালিফ।

‘ভাল,’ বিশ্বস্ত মানুষটার দিকে চাইল জায়েদ। ‘এই অবস্থায় কী করতে বলো?’

‘আমরা এমন একটা বার্তা পাঠাব অন্যদের কাছে, যে কারণে লড়াই হবে না। দূর থেকে সব পরিষ্কার দেখবে তারা।’ ভয়ঙ্কর এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল খালিফের মুখে।

বুঝতে শুরু করেছে জায়েদ: একে বুড়ো আর অপদার্থ ভেবেছিল। এখন মনে মনে বলল, মস্ত ভুল করতে যাচ্ছিলাম!

‘তুমি টেস্ট বে ভরে নিতে চাও?’ জানতে চাইল জায়েদ।

ধীরে মাথা ঝাঁকাল খালিফ। ‘আগেই ওই কাজ করা হয়েছে। আসওয়ান ড্যামের মত করেই সাজানো হয়েছে সব।’

নিষ্ঠুর হাসল জায়েদ। ‘গুড! দেখিয়ে দেব ডেমনস্ট্রেশন কাকে বলে! সামনের সারিতে বসতে দিয়ো গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের। ওরা নিজ চোখে সব দেখুক। বুঝুক বাড়াবাড়ি করলে কী ঘটবে।’

‘আপনার নির্দেশ মতই হবে সব,’ বলল খালিফ।

জানালার ওদিকে নীচের ঘরের দিকে চাইল জায়েদ।

কাজে ব্যস্ত কর্মীরা, পূর্ণ গতি তুলে চলছে মেশিন, তৈরি হচ্ছে ন্যানোবট— প্রোডাকশন লাইনে সরু ধারায় রূপালী বালির মত নামছে হলদে প্লাস্টিকের ড্রামে। পিছনের লাইনে আছে আরও উনষাট ড্রাম। ভিতরে ভরা হবে এই চালানের ন্যানোবট। জায়েদের ভুল হয়ে না থাকলে, ওগুলো ভেঙে দেবে মিশরের কোমর। শৃঙ্খলা বা ক্ষমতা সবই হারাবে সেনাবাহিনী, বাধ্য হয়ে জায়েদের পায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে জেনারেল আবিল-বিল।

বাইশ

সোহেলের কয়েক সেকেণ্ড আগে টিলার মাথায় পৌঁছে গেল রানা। সাবধানে দেখে নিল চারপাশ। টিলার সামনের দিকে হেলিপ্যাড। ওখানে আছে রাশান একটা হেলিকপ্টার। খোলা কার্গো ডোরের কাছেই বসে আছে দুই লোক, পরনে গার্ডদের পোশাক। আঙুলে জ্বলছে সিগারেট। আর কাউকে দেখা গেল না।

কানের কাছে সোহেলকে শ্বাস ফেলতে শুনে বলল রানা, ‘দু’জনকে বাগে আনতে পারবি?’

মাথা দোলাল সোহেল। ‘এক টিলে দুই পাখি? পানির মতন।’
কপ্টারের ওদিকটা দেখে নিল রানা।

রওনা হয়ে গেছে সোহেল। দেয়ালের মত উঁচু, খাড়া টিলা ঘেঁষে সামনে বাড়ছে। ধূসর আকাশযানের পাশে পৌঁছে ইশারা করল রানার দিকে।

পোশাকের কাফতান মুখে জড়িয়ে নিল রানা, লুকানো জায়গা থেকে বেরিয়ে হাঁটছে গার্ডদের উদ্দেশে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওর খালি দুই হাত। নিচু কণ্ঠে ডাকছে, ‘অ্যাই, লায়লা, কই গেলি? ...লায়লা?’

রানাকে দেখে ঝট করে ঘুরে চাইল দুই গার্ড। একজনের হাত চলে গেল হোলস্টারের কাছে। কিন্তু বের করল না অস্ত্র। রানাকে স্থানীয় লোক বলে মনে করেছে বোধহয়।

আবারও ডাকল রানা, ‘লায়লা! ...লায়লা?’

মাঝরাতে উটপালককে দেখে অবাক হয়েছে দুই গার্ড।

তাদের দিকেই আসছে লোকটা। উদ্ভিগ্ন আর হতাশ।

‘লায়লা! ...লায়লা!’ মহিলা উটকে আবারও ডাকল রানা, আদর করে বলল, ‘বেয়াড়া মেয়ে!’ গার্ড দু’জনের দিকে চাইল কিছু জিজ্ঞেস করবে বলে। কিন্তু দেখল হঠাৎ করেই চমকে উঠে বালির ওপর পড়ল ওরা হাঁটু গেড়ে।

পিছনে কেউ আছে, ভুলেও ভাবেনি দুই গার্ড। একই সময়ে হুমড়ি খেয়ে ধুপ্ করে মাটিতে পড়েছে তারা, সম্পূর্ণ অবশ।

চওড়া হাসিমুখে রানাকে টেসার দেখাল সোহেল।

গার্ডদেরকে ভয়ঙ্কর ইলেকট্রিক শক দিয়েছে।

‘টেসারের সুবিধা হলো, চট করে কাজ করে,’ বলল সোহেল। ‘চিৎকার করার সুযোগ নেই।’

লোকদুটোর একজন একটু নড়তে শুরু করেছে।

বিনা দ্বিধায় আবারও কড়া শক দিল সোহেল। দুটোকেই।

‘যথেষ্ট, ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইন,’ বলল রানা।

সোহেল টেসারের পাওয়ার অফ করতেই শিথিল হয়ে গেল দুই গার্ড। পাশে পৌছে গেল রানা, তাদের বাহুতে গাঁথে দিল ট্র্যাঙ্কুলাইয়ার ডার্ট। দু’ সেকেন্ডের মধ্যে উল্টে গেল বন্দিদের চোখ— নিশ্চিন্ত ও অজ্ঞান। তাদেরকে হেলিকপ্টারে তুলতে রানাকে সাহায্য করল সোহেল। স্থূপ করে রাখল দুই গার্ডকে। বন্ধ করে দিল স্লাইডিং ডোর।

পাঁচ মিনিট পর আবারও খুলে গেল দরজা, অচেতন গার্ডদের গাড়ী নীল ইউনিফর্ম পরে নেমে এল রানা-সোহেল। মুখ ঢেকে রেখেছে কাফিয়া দিয়ে। হেলিকপ্টার পাহারা দিচ্ছে এমন ভঙ্গি নিল সোহেল। এদিকে খুঁজতে শুরু করল রানা সুড়ঙ্গ।

একটু পর পাথুরে দেয়ালের মাঝে পাওয়া গেল সরু ফাটল। ওটা ফুরিয়ে গেল একটা মইয়ের সামনে। ধাপ নেমে গেছে সোজা

নীচে। নামতে শুরু করে কয়েক সেকেন্ডে মেঝেতে পৌঁছল রানা। কিন্তু করিডরের পথ আটকে দিয়েছে স্টিলের দরজা। হ্যাণ্ডেলের তালার উপর ইলেকট্রনিক সেন্সার, নামকরা যে-কোনও দামি হোটেলের ঘরের তালার সঙ্গে ওটা থাকে।

‘আশা করি বিফল হব না,’ বিড়বিড় করল রানা। হাত ভরে দিল অজ্ঞান গার্ডের চোরাই ইউনিফর্মের বুক পকেটে। পেল দুই শলা বেনসন সিগারেট, একটা হুইসল আর কার্ড কি। কার্ড রিডারে কার্ড চাবি দিতেই জ্বলে উঠল সেন্সারে সবুজ বাতি। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। প্যাণ্টের পকেট থেকে এক সেরি একটা পাথর বের করে দরজা জ্যাম করে দিল ও। আবার উঠে এল উপরে। শিস দিতেই হাজির হলো সোহেল। ওকে বলল রানা, ‘মাদী উটকে ডেকে তোকে পেলাম? আমার উট তো দেখতে এত খারাপ ছিল না!’

‘দাঁড়া, বুরবক, দিন আসবে আমারও... শালা!’ বিড়বিড় করল সোহেল।

দু’ মিনিট পেরোবার আগেই করিডরে নেমে এল ওরা। কিছু দূর যাওয়ার পর নামতে লাগল খাড়া সিঁড়ি বেয়ে।

‘খরগোসের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি,’ মন্তব্য করল সোহেল। ‘সহি সালামতে আবারও বেরিয়ে যেতে পারব কি না কে জানে!’

সিঁড়ি ফুরিয়ে যেতেই সামনে পড়ল কয়েকটা সুড়ঙ্গ। নীচে গেছে দেখে একটা সুড়ঙ্গ ধরে রওনা হয়ে গেল ওরা। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর থামতে হলো। সামনে চৌ-রাস্তার মত ক্রস তৈরি করেছে দুটো সুড়ঙ্গ।

‘না রে, আমরা আছি পিপড়ের বাড়িতে,’ জানাল সোহেল।

‘চল, এগোই,’ বলে সামনের সুড়ঙ্গ ধরে এগোল রানা।

একটু যাওয়ার পর পড়ল আরেকটা চৌ-করিডর।

‘এবার কোথায় যেতে চাস?’ জানতে চাইল সোহেল।

‘জানি না কোথায় যাওয়া উচিত,’ স্বীকার করল রানা ।

‘হয় গাইড লাগবে, নইলে ম্যাপ ।’

চারপাশে নজর বোলাতে শুরু করেছে রানা । কয়েক সেকেন্ড পর দেখল, ছাতে একের পর এক পাইপ । এসব কণ্ডুইট বহন করছে বিদ্যুৎ, পানি বা প্রাকৃতিক গ্যাস । যে-কোনও প্রোডাকশন সেন্টার চালু রাখতে চাইলে এগুলো লাগবেই ।

‘আগে খুঁজে বের করতে হবে এদের ফ্যাকটরি,’ বলল রানা ।

‘আমরা শুধু পাওয়ার লাইনের পিছু নিলেই হবে ।’

বিদ্যুৎবাহী তারের কণ্ডুইট অনুসরণ করে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা । কিছুক্ষণ যাওয়ার পর পৌঁছল চওড়া এক করিডরে । অনায়াসেই এদিক দিয়ে চালিয়ে নেয়া যাবে বড় গাড়ি । সামনে থেকে আসছে ওদের মত পোশাকে দু’জন লোক । গতি না কমিয়ে হাঁটছে রানা । তৈরি হয়ে গেছে লড়াইয়ের জন্য । কিন্তু একটা কথাও না বলে পাশ কাটিয়ে চলে গেল তারা । আবারও স্বাভাবিক হলো ওর শ্বাস-প্রশ্বাস ।

সুড়ঙ্গ ধরে হাঁটতে শুরু করে একটু পর পাশে বড় একটা ঘর দেখল ওরা । মেঝে ওখানে কংক্রিটের । পেতে দেয়া হয়েছে কমপক্ষে এক ডজন টেবিল আর গোটা পঞ্চাশেক চেয়ার । উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ছাতে । পিছনের দেয়ালে কয়েকটা রেফ্রিয়ারেটার, পাশে ছয়টা বেসিন ।

‘ক্যান্টিনে পৌঁছে গেছি,’ বন্ধুকে বলল রানা ।

পেটে হাত বুলিয়ে নিল সোহেল । ‘খিদেও লেগেছে ।’

‘গাড়িতে করে আসার সময় না সব খেয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে গলা পর্যন্ত ভরে ফেললি!’

‘সে তো কয়েক যুগ আগের কথা, বাছা! তখনও তোর খতনা হয়নি!’

তিনটে টেবিলে বসেছে বেশ কয়েকজন লোক । মনে হলো না

তারা আরব বা জায়েদ বিন মনযুরের লোক ।

‘নানান দেশের লোক,’ নিচু স্বরে বলল রানা ।

‘আমাদের বোধহয় সটকে পড়াই ভাল, গুলি খেতে চাই না ।’

দেরি না করে পাইপ আর কণ্ডুইট অনুসরণ করল দুই বন্ধু ।
আরও কিছুক্ষণ হাঁটবার পর পৌছে গেল কাঁচের একটা দেয়ালের
সামনে । ওদিকে বিশ ফুট নীচে মস্ত কোনও হলঘর । নিচু ওয়াটের
বাতি জ্বলছে ছাতে । পরিষ্কার দেখা গেল অলিম্পিক সাইয়ের
একটা সুইমিং পুল । মাঝে মস্ত কী যেন ।

‘হেলথ স্পা?’ বিড়বিড় করল সোহেল ।

‘জানি না ।’

‘বিরাট ট্যাক্স,’ মন্তব্য সোহেলের ।

‘ওয়াশিংটনের নুমা ফ্যাসিলিটিতে এমন সিমুলেশন ট্যাক্স
দেখেছি,’ বলল রানা । ‘কোনও ধরনের রিমডেলিং করছে । স্রোত
বা ঢেউ সংক্রান্ত ।’

‘মারের ওটা কী?’

‘কে জানে! চল, কাছে গিয়ে দেখি ।’

একটু দূরে দরজা দেখেছে রানা । হ্যাণ্ডলে মোচড় দিয়ে খুলে
ফেলল কবাট । সামনের ল্যাণ্ডিংয়ের পর নীচে নেমেছে সিঁড়ি । কিন্তু
কয়েক ধাপ যেতেই বন্ধ দরজা । কবাট খুলে রানা দেখল,
ওদিকটা লকার রুম । স্টলে ঝুলছে সাদা হ্যাযম্যাট সুটের মত
ইউনিফর্ম ।

‘নতুন পোশাক পরার মজাই আলাদা,’ বলল রানা ।

‘এই মাল কাজে আসবে ভাবছিস?’

‘ক্যামোফ্লেজের সুবিধা দেবে । আর ওদিকে ন্যানোবট
থাকলে, উপযুক্ত পোশাক পরাই ভাল ।’

এক মিনিটে গার্ডদের চোরাই ইউনিফর্মের ওপর হ্যাযম্যাট সুট
চাপিয়ে নিল ওরা, পাশের দরজা খুলে থামল সিঁড়ির ল্যাণ্ডিংয়ে ।

নীচে সুইমিং পুলের মাঝে বড়সড় জিনিসটা দু'পাশে গিয়ে মিশেছে। বাঁকা হয়ে উঠেছে উপরে। পুলের এদিকে অনেক পানি, কিন্তু ওদিক খটখটে শুকনো। ওখানে সরু এক আঁকাবাঁকা নালা।

সিঁড়ির বেশ কয়েকটা ধাপ নেমে সামনের দরজা খুলল ওরা।

এখন আছে সুইমিং পুলের পানির স্তরের নীচে।

অ্যাট্রিলিক কাঁচের ওপাশে পরিষ্কার দেখা গেল, পুলের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে দেয়ালের মত জিনিসটা।

‘আগেও এই জিনিস দেখেছি,’ বলল রানা। ‘বাঁধের পাড়।’

‘কাণ্ডাই বাঁধের মত?’

‘হ্যাঁ। ওপরের অংশ গুঁড়ো করা পাথর আর বালি দিয়ে তৈরি। মাঝের অংশে ধূসর ওঅটরগ্রাফ মাটি। নীচে কংক্রিটের কাটঅফ কার্টেন। বাঁধের তলা দিয়ে পানি বেরিয়ে যাওয়া ঠেকাবে।’ বাঁধের পিছনের উঁচু পানির স্তর দেখাল রানা। ‘পানি ভরে রিয়ারভয়ের তৈরি করেছে।’

‘একটা বাঁধের মডেল দিয়ে কী করবে এরা?’ বিড়বিড় করল সোহেল।

‘জানি না, কিন্তু মনে হচ্ছে, জবাবটা পেলে পছন্দ করতে পারব না।’

শক্তিশালী জেনারেটর চালু হওয়ার আওয়াজ পেল ওরা। এক সেকেণ্ড পর ছাতে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। ঝলমল করছে মস্ত ঘর। পুলের পানির মাঝ দিয়ে দেখল রানা, সাদা হ্যাযম্যাট সুট পরা বিদ্যুটে আঁকাবাঁকা কয়েকজন লোক।

‘ভঙ্গি কর, আমরা কাজে ব্যস্ত,’ তাড়া দিল ও।

‘কাজের কী শেষ আছে, এখনই “বাহির” লেখা একটা দরজা খুঁজতে হবে,’ চওড়া হাসি দিল সোহেল।

আবারও সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দুই বন্ধু, বেরিয়ে গেল অবযার্ভেশন রুম থেকে। পুলের পাড়ে পৌঁছে দূরের হ্যাযম্যাট সুট

পরনে লোকগুলোর দিকে হাত নাড়ল। তাদের মধ্যে থেকেও দু'জন হাত নাড়ল ওদের উদ্দেশ্যে। ঢুকে পড়ল ওরা লকার রুমে।

‘এবার কী?’ বন্ধুর দিকে চাইল সোহেল।

জানালা দিয়ে চেয়ে আছে রানা। নীচের প্রকাণ্ড ঘরে ঢুকেছে আরেক দল লোক। গায়ে দামি আরবি পোশাক। আরেক লোকের পোশাক সাদা, হাতের ইশারায় দেখাচ্ছে এদিক-ওদিক। নড়ছে মুখ। সবার পিছনে হাঁটছে দাড়িওয়ালা এক লোক। পরনে ধূসর কাফতান। মনে হলো না তাকে পাত্তা দিচ্ছে কেউ।

‘সামনের লোকটাই জায়েদ বিন মনযুর,’ বলল রানা, ‘এ দেশে আসার আগে এর ছবি দেখেছি।’

‘তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সঙ্গের এরা কারা?’ ভুরু কুঁচকে গেল সোহেলের।

‘নিশ্চয়ই নামী-দামি লোক,’ বলল রানা।

সবাইকে নিয়ে পুল ঘুরে সিঁড়ির কাছে চলে এল জায়েদ। একটু আগে ওই সিঁড়ি বেয়ে উঠেছে রানা-সোহেল। লোকগুলো নেমে গেল সুইমিং পুলের পানির স্তরের নীচে অবযার্ভেশন রুমে।

‘কোনও ধরনের ডেমনস্ট্রেশন দেখাবে মনে হচ্ছে,’ বলল রানা।

‘আরও অপেক্ষা করবি?’ জানতে চাইল সোহেল। ‘যখন-তখন উঠে আসবে। ব্যাটারী ব্যস্ত, এই সুযোগে চল, সরে যাই।’

মাথা নাড়ল রানা। ‘সিনেমা হলের ডি.সি.-র সারিতে চেয়ারে বসেছি, সিনেমা না দেখে চলে গেলে হবে? এবার বোঝা যাবে কী করতে চায় এরা। সুট এখনই খুলিস না। দরকার হলে মিশে যাব অন্যদের সঙ্গে।’

‘তারপর কেউ আলাপ জুড়তে চাইলে? বা যদি বলে, অমুক মেশিনটা চালু করো!’ এক সেকেণ্ড পর হাসল সোহেল। ‘না, ভয় নেই। টিপে দেব গোটা পঞ্চাশেক সুইচ। হাড়ে হাড়ে শালারা

বুঝবে কেমন টেকনিশিয়ান আমরা ।’

‘আমিও একই কথা ভেবেছি,’ বলল রানা ।

আবারও জানালার উপর মনোযোগ দিল ওরা ।

এইমাত্র চালু হয়েছে আরও বেশ কিছু প্রকাণ্ড মেশিন ।

হাতের ইশারার সঙ্গে সঙ্গে মুখ ছুটিয়ে দিয়েছে জায়েদ বিন মনযুর । কিন্তু কাঁচের এপাশ থেকে একটা কথাও শোনা গেল না ।

‘তোর সিনেমা কোথায়?’ আপত্তি তুলল সোহেল । ‘আমি তো দেখছি মিউট করা টিভি!’

পুলের শেষ মাথায় ওভারহেড ক্রেন থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হলো হলদে ড্রাম । ধীরে, সাবধানে নামাতে শুরু করেছে । ব্যস্ত হয়ে সরে গেল আশপাশের সবাই । রইল শুধু সাদা সুট পরা দু’জন ।

রানা বুঝে গেল কী আছে ড্রামে । ‘আওয়াজ না পেলেও এবার টিভিতে দেখবি দারুণ খেলা!’

তেইশ

সুইমিং পুল ঘিরে রাখা প্রকাণ্ড গুহার মত ওই ঘরে সৌদি আরবের শেখ হাকিম আবেদিন আর পাকিস্তানি আইএসআই ডেপুটি চিফ জাফর লালার সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলছে জায়েদ বিন মনযুর । মস্ত ট্যাঙ্ক আর চলন্ত নানান মেশিনের কারণে ঘরে বেসুরো প্রতিধ্বনি । ক্রোধের কোনও ছাপ নেই জায়েদের আচরণে, কিন্তু মনের গভীরে ইচ্ছা, দু’হাতে গলা টিপে মারবে লোকদুটোকে । ঠিক করেছে, এই দলের সবার কাছে পৌঁছে দেবে

জরুরি একটা বার্তা। আসলে একটা নয়, দুটো।

জায়েদের কানে ফিসফিস করল খালিফ, ‘ওদের আলাদা করুন।’ ছায়ার মত পিছিয়ে গেল সে।

শুনেও শুনল না জায়েদ। এ অনুষ্ঠান করতে হয়েছে খালিফের কথায়। কিন্তু নিজেই স্থির করবে কখন শুরু হবে খেলা।

‘আপনারা দেখছেন আসওয়ান ড্যামের একটা ছোট সংস্করণ,’ বলল সে। ‘আর ওটাই হয়ে উঠেছে আমার ডেমনস্ট্রেশনের মূল আকর্ষণ।’

‘এসব কেন দেখাচ্ছেন, বুঝতে পারছি না,’ বলল শেখ হাকিম আবেদিন।

‘সঠিক সময়ে বুঝবেন,’ বলল জায়েদ, ‘মিশরের জেনারেল নাসিফ আবিল-বিল তার প্রতিজ্ঞা ভেঙে অস্বীকৃতি জানিয়েছে কনসোর্টিয়ামে টাকা বিনিয়োগ করতে। নিজস্ব মতামত আছে তার। মূল কারণ, ওই বাঁধ। ওটা যতক্ষণ থাকবে, ইজিপ্টের পাঁচ বছরের পানি জমা থাকবে নাসের হুদে। কিন্তু আমার ক্ষমতা বা আক্রোশ সম্পর্কে কিছুই জানে না সে।’ মুখের কাছে রেডিয়ো তুলে টক সুইচ টিপল জায়েদ। ‘কাজ শুরু করো।’

গর্জন ছাড়ল ক্রেনের ইঞ্জিন। পুলের পানির দিকে নামছে হলদে ড্রাম। কয়েক মুহূর্ত পর স্থির হলো নির্দিষ্ট উচ্চতায়। ড্রামের পেট ঘিরে রেখেছে কেবল, ওটা টানটান হতেই কাত হলো ন্যানোবটের আধার। সরু রেখায় সরসর করে পানিতে পড়তে লাগল ধূসর কী যেন।

উজ্জ্বল আলোয় মনে হলো, জিনিসটা রূপালী বালি। জায়েদের কোটি কোটি ন্যানোবট পড়ছে সুইমিং পুলে। মিশে যাচ্ছে চায়ে মেশানো চিনির মত। কেমন ধূসর হয়ে উঠছে পানি।

‘কমাও দাও,’ রেডিয়োতে জানিয়ে দিল জায়েদ।

ফুটন্ত তরলের মত বলকে উঠল পানি। ঝাঁক বাঁধতে শুরু

করেছে ন্যানোবট। কালো কালির মত নেমে গেল বাঁধের নীচের অংশে।

‘কী করছে ওরা?’ জানতে চাইল আইএসআই ডেপুটি চিফ জাফর লালা।

‘অ্যাগ্রেগেট দিয়ে তৈরি ড্যাম,’ বলল জায়েদ। ‘জমাট বাঁধা পাথর, কংক্রিট, বালি আর মাটির তৈরি। নিজের প্রচণ্ড ওজনে ভর করে আটকে রেখেছে হ্রদের পানি। কিন্তু ওটা অভেদ্য নয়।’

তার কথা শেষ হতেই দেখা গেল, বাঁধের বিশেষ দুই জায়গায় জড়ো হয়েছে রূপালী ন্যানোবট। বাঁধের উপরাংশে, আবার বাঁধের তিনভাগের দু’ভাগ নীচে। ওখানে বাঁকা হয়ে উঠেছে দেয়াল। দেড় মিনিট পর দেখা গেল, বাঁধের ক্রস সেকশনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে খুদে বটগুলো।

‘অদ্ভুত,’ মন্তব্য করল সৌদি শেখ। ‘এত দ্রুত বাঁধ ভাঙবে?’

‘সত্যিকারের ড্যাম অনেক পুরু,’ বলল জায়েদ। ‘কিন্তু তাতে লাভ নেই, ফলাফল ঠিক এমনই হবে। অবশ্য, সময় লাগবে কিছুটা বেশি। আমার হিসেব অনুযায়ী একঘণ্টার মত কাজ করবে ন্যানোবট।’

মাত্র কয়েক মিনিটে পালের সামনের মেশিনগুলো ঢুকে গেল বাঁধের মাঝের কোঁর-এ। নাটকীয়ভাবে ধীর হয়ে গেল কাজ। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, পিনের মত একটা ফাটল তৈরি করেছে সামনের ন্যানোবট।

পরের দু’ মিনিটে ধূসর বালির মত মেশিন ভেদ করল বাঁধের ওদিক— সরু রেখায় ওদিকে বেরোতে শুরু করেছে পানি। ভরা সুইমিং পুলের প্রবল চাপে ক্রমেই বাড়ছে ফাটল। ছিটকে দূরে গিয়ে পড়তে লাগল পানি।

‘এভাবেই ভাঙবে আসওয়ান ড্যাম,’ বলল জায়েদ, ‘ওটার পিছনের ট্রিলিয়ন-ট্রিলিয়ন টন পানির মারাত্মক চাপে কী ঘটবে,

আশা করি বুঝতে পারছেন।’

বিস্তৃত হচ্ছে মডেলের ফাটল— দুই ইঞ্চি ডায়ামিটারের গর্ত দেখতে না দেখতে হয়ে উঠল চার ইঞ্চি ডায়ামিটার। তারপর ভেঙে গেল বাঁধের উপরের একটা অংশ। ওদিকের শুকনো, সরু রাস্তা বা খুদে সব গাড়িকে ভাসিয়ে নিল জলোচ্ছ্বাস। বাঁধের উপরের ক্রটি যেন হয়ে উঠেছে মস্ত নদীর কোনও জলপ্রপাত। কিন্তু বিস্ময়কর হয়ে উঠল বাঁধের নীচের সুড়ঙ্গ।

ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের উপরাংশ দিয়ে হড়-হড় করে বেরোচ্ছে পানি, এদিকে লাখ লাখ ন্যানোবটকে ঠেকাতে পারেনি নীচের ওঅটর-প্রফ কাদার কোর।

‘বাঁধ কিন্তু ভেঙে পড়ছে না,’ আঙুল তুলে দেখাল জাফর লাল।

‘নীচের সুড়ঙ্গ খেয়াল করুন,’ বলল জায়েদ।

বাঁধের এদিকে সুড়ঙ্গ তৈরি শেষ হতেই ওদিকের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেল ন্যানোবট। নীচের সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরোবে বলেই জোরালো চাপ তৈরি করেছে সুইমিং পুলের পানি। চওড়া হতে শুরু করেছে নীচের ফাটল। অবশ্য, এখনও ডায়ামিটার মাত্র এক ইঞ্চি।

ছিটকে গিয়ে দূরে পড়ছে পানির ধারা। পরের মিনিটে ধসে গেল বাঁধের মাঝের একটা অংশ। তৈরি হলো গভীর ভি শেপের নালা। কংক্রিট, বালি, কাদা সবই খসে পড়তে শুরু করেছে।

সরু গিরিপথ পেয়ে বড় ঢেউ তুলে ওদিকে নামল পানি, আসওয়ান ড্যাম ভাঙলে এমনই ঘটবে নীল নদে। দু’পাড় ভাসিয়ে নিল উঁচু জলোচ্ছ্বাস। এক সেকেন্ডের প্রবল পানির তোড়ে ভেসে গেল ধুলো-বালির টিবি, গাছপালা আর ছোট সব বাস্তবের মত বাড়ির মডেল।

সফল হয়েছে পরীক্ষা।

ভেঙে পড়ছে বাঁধ।

প্লাবনে তলিয়ে গেছে চারপাশ ।

নীল নদের কী অবস্থা হবে বুঝতে পেরে হতবাক হয়ে গেছে
শেখ হাকিম আবেদিন আর জাফর লালা ।

মৃদু হাসল জায়েদ, পিছিয়ে গেল এক পা ।

এসেছে সঠিক সময় । পিছনের দরজা খুলে রেখেছে খালিফ ।

তখনই হাসি-হাসি মুখে ঘুরল জাফর লালা । খালিফের দিকে
চেয়ে মাথা দোলাল ।

তার চেহারা দেখে জায়েদের মনে হলো, এ হঠাৎ করেই
অনেক ধনরত্ন পেয়ে যাওয়া কোনও চোর ।

কিন্তু খালিফকে একদম চুপ দেখে পাল্টে গেল লালার
চেহারা । প্রথমে দ্বিধা, তারপর রাগ আর শেষে ভয় ফুটে উঠল
চোখে । বুঝে গেল, খালিফ খুন করবে না তার মনিবকে ।

বামাল ধরা পড়া চোরের মত চেহারা হলো তার । ঝট করে
কোমরে হাত দিল পিস্তল বের করতে ।

কিন্তু এক টান দিয়ে দরজার ওদিকে জায়েদকে নিয়ে গেল
খালিফ, দড়াম করে বন্ধ করে দিল স্টিলের দরজা । মেরে দেয়া
হলো তালা ।

দরজায় একের পর এক গুলি করল শেখ হাকিম আবেদিন
আর জাফর লালা । তাতে কোনও লাভ হলো না । শুধু গুলির
আওয়াজে ঝনঝন করতে লাগল কানের পর্দা ।

দরজার এদিক থেকে চিৎকার করল লালা, ‘কী করছেন,
খালিফ! এসবের মানে কী?’

বাইরের ঘরে ইন্টারকমের সুইচ টিপল জায়েদ । ‘এর মানে
সহজ । আমার কাজের মানুষকে আমারই বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতে
চেয়েছিলে তোমরা! কিন্তু আনুগত্যের পরীক্ষায় পাশ করেছে সে ।
যা করতে চেয়েছ, সেজন্য এখন প্রতিফল পেতে হবে ।’

ধূপ-ধাপ আওয়াজ তুলে স্টিলের দরজায় ঘুষি মারছে দুই

গাদ্দার। কয়েকটা গুলির আওয়াজও এল। জায়েদ ভাবল, ছিটকে যাওয়া গুলি লেগে না মরে এরা। তা হলে সব মজা নষ্ট হবে।

‘বিশ্বাস করুন, জায়েদ বিন মনযুর!’ কাতরভাবে চেষ্টা করে উঠল সৌদি শেখ, ‘আমি এসবের কিছুই জানি না!’

পান্তা দিল না জায়েদ। আবারও মুখের কাছে ধরল রেডিয়ো। ‘কাজ শুরু করো।’

উপরের কন্ট্রোল রুমের অপারেটর টিপল কয়েকটা বাটন।

আরও কাত হলো হলদে ড্রাম। ওটা থেকে ঝরঝর করে ঝরল ধাতব বালি। আবারও ধূসর হয়ে উঠল পুলের পানি। পাল্টে গেল রং।

বাইরের ঘরে খালিফ আর জায়েদের মনে হলো, সুইমিং পুলে ফুটতে শুরু করেছে ভুট্টার স্যুপ।

ভিউয়িং চেম্বার থেকে পরিষ্কার দেখা গেল কী ঘটছে।

অ্যাক্রিলিক দেয়ালের ওপাশে চোখ রেখেছে জাফর লালা। অষ্টোপাসের ছুঁড়ে দেয়া কালো কালির মত কী যেন আটকে গেল ওদিকের কাঁচে। ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। যেন আঠা।

ভয়ে জমাট বেঁধে গেল লালার বুক। তাকে পাশ কাটাল শেখ হাকিম আবেদিন। বদ্ধ দরজার হ্যাণ্ডেল ধরে পাগলের মত টানছে। চিৎকার করল, ‘আমাকে বেরোতে দাও! দোষ জাফর লালার! আমি কিছুই জানি না!’

শুরু হয়েছে অ্যাক্রিলিকে আঁচড়ের কর্কশ আওয়াজ।

জাফর লালা দেখল, ওদিকে তৈরি হচ্ছে কালো ফাটল। বিশেষ করে ফেটে যাচ্ছে দুটো জায়গা। শুরু হয়েছে গা রি-রি করা শব্দ। ওদিকে খেয়াল দিল না সে। কাজ করছে না মাথা। যে-কোনও সময়ে ধসে পড়বে এদিকের কাঁচ।

দরজায় দাঁড়িয়ে জায়েদের কাছে ক্ষমা-প্রার্থনা করছে শেখ হাকিম আবেদিন: ‘আমাদের ছেড়ে দিন! আল্লাহর দোহাই! মাফ

করুন! আল্লাহ্ জানেন, আমি কিছুই করিনি!’

থরথর করে কাঁপছে জাফর লালার দুই হাঁটু। ধূপ করে বসে পড়ল মেঝেতে। বেসুরো কণ্ঠে টেঁচিয়ে উঠল, ‘না! আল্লার দোহাই, মারবেন না! মাফ চাই! মাফ চাই আপনার কাছে!’

অনেক বেড়ে গেছে অ্যাক্রিলিক কাঁচের ফাটল। দুই সেকেণ্ড পর ভেঙে পড়ল ওটা। ভেসে গেল ঘর। সাঁতার কাটতে চাইল জাফর লালা, কিন্তু তাকে ঘিরে ধরল রূপালী বালি। শরীরে গুরু হলো ভয়ঙ্কর জ্বলুনি। কীসে যেন ভরে গেল মুখ। পাগল হয়ে উঠল ব্যথায়। পুরো এক মিনিট সড়কিতে গাঁথা জীবন্ত মাছের মত ছটফট করল সে। প্রাণ বাঁচাতে ছিটকে পড়ল নানাদিকে। কিন্তু পরের মিনিটে চারপাশে ছড়িয়ে গেল খেয়ে ফেলা দেহের সব রক্ত।

জাফর লালার মত একই নির্মম পরিণতি হয়েছে সৌদি শেখের।

চব্বিশ

ধূসর ন্যানোবট ভরা পানিতে নিমজ্জিত টেস্ট-রুমের পৈশাচিক, ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড দেখে সোহেলকে বলল রানা, ‘তোরা কথা মত আগেই বেরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।’

ওরা রয়ে গেছে লকার রুমে। জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখছে ফেনায়িত, রক্ত-মেশা পানি। হ্যাযম্যাট সুট খুলে ফেলল দুই বন্ধু, ঘরের পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে পৌছে গেল সিঁড়িতে।

‘চক বা ময়দার গুঁড়ো ফেললে চিহ্ন দেখে বেরোতে পারতাম এই গোলকধাঁধা থেকে,’ হতাশ কণ্ঠে বলল সোহেল।

‘ওপরের করিডর ধরে গেলেই বেরোতে পারব,’ বলল রানা।

পৌছে গেল প্রধান সুড়ঙ্গ, একপাশে নীচে সুইমিং পুল। ওদিকে চাইল না ওরা। সুড়ঙ্গের মাঝামাঝি জায়গায় পৌছে গেছে, এমন সময় শুরু হলো গোলাগুলির আওয়াজ। প্রথমে চলল এক পক্ষের গুলি, তবে কয়েক সেকেন্ড পরেই এল পাল্টা জবাব। ভেসে এল হৈ-চৈ আর চিৎকারের আওয়াজ।

‘ক্যান্টিন,’ সংক্ষেপে বলল রানা। ‘ন্যানোবটের আক্রমণে যারা খুন হলো, তাদেরই লোকের ওপর এবার হামলা করছে জায়েদ বিন মনযুরের লোক।’

আরও বাড়ছে গোলাগুলি।

‘হামলা শুরু হতে খুব অবাক হয়নি এরা,’ মন্তব্য করল সোহেল।

‘খবরটা আমাদের জন্যে ভাল না,’ বলল রানা। ‘আপাতত গা ঢাকা দিতে হবে।’

সামনের প্রথম দরজা পেয়েই ওটা খুলল রানা, উঁকি দিল ভিতরে। দেখা গেল কয়েকটা ড্রাফটিং টেবিল, কমপিউটার আর প্রিন্টার। শেষের জিনিসগুলো চলছে। কিন্তু ঘরে কেউ নেই।

‘আমাদের নতুন অফিস, ঢুকে পড়,’ তাড়া দিল রানা।

সোহেল ঘরে প্রবেশ করতেই পিছনে দরজা ভিড়িয়ে দিল রানা। পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল দেয়ালে, দরজা সামান্য ফাঁক করে চাইল করিডরে। ‘পিছনে দরজা আছে কি না, দ্যাখ। তা না থাকলে ক্লিটের মত কিছু পেলেও চলবে। আপাতত লুকাতে হবে।’

চারপাশে চোখ বোলাতে শুরু করেছে সোহেল।

ওদিকে দরজার সরু ফাটল দিয়ে বাইরে দেখছে রানা। নতুন দলের বিরুদ্ধে সুবিধা হচ্ছে না জায়েদ বিন মনযুরের লোকের। ছুটে এই ঘর পেরিয়ে গেল কয়েকজন, আহত। কয়েক মুহূর্ত পর আরেক দল লোক যোগ দিল লড়াইয়ে। বেড়ে গেল গোলাগুলি আর চিৎকার। বিস্ফোরিত হচ্ছে স্টান গ্রেনেড।

‘পিছনে লুকাবার জায়গা বা কোনও দরজা নেই,’ জানিয়ে দিল সোহেল। ‘এদের পারিবারিক সমস্যার ভেতর পড়ে গেছি! এক মিনিট দেরি করলে পুরো ফেঁসে যেতাম।’

‘কিন্তু ভাব, দু’মিনিট হাতে পেলে গিয়ে উঠতাম ছাতে,’ বলল রানা। ‘তখন ওরা কাতার ফায়ার দিত আমাদেরকে।’

‘ভাগ্যের নিষ্ঠুর খেলায় বিপদে পড়েছে দুই বাঙালি সিন্দাবাদ,’ মাথা দোলাল সোহেল।

দরজা আরেকটু ফাঁক করল রানা। দেখা গেল করিডরের একটা অংশ। ভেসে এল পদধ্বনি। বোঝা গেল না কোথায় চলেছে কারা।

তিন সেকেন্ড পর বলল রানা, ‘ওরা এদিকেই আসছে।’ সামান্য ফাঁক করে রেখেছে দরজা।

ওদের পাশ কাটিয়ে করিডর ধরে চলেছে দুই লোক, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে এক তরুণীকে। খুব ভয় পেয়েছে সে। আরও কিছু আছে চোখে-মুখে। এক মুহূর্ত পর চমকে গেল রানা।

পলকের জন্য ওই মেয়েকে দেখেছে, কিন্তু ভুলতে পারবে না। কালো চুল মেয়েটার, বিষণ্ণ চোখ। চেহারা প্রায় রবার্তো ম্যানিনির দি আইল্যান্ডের...

‘ঝামেলা হয়ে গেল,’ দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বলল রানা।

‘তুই বলছিস, গোলকধাঁধার গুহার এই জটিল সমস্যার বাইরেও আরও ঝামেলা আছে?’ ভুরু কঁচকাল সোহেল। ‘সেটা কী জানতে পারি?’

‘জ্যাকো কাপুলের ছবি দেখিসনি?’ জানতে চাইল রানা।

‘হ্যাঁ। তাতে কী?’

‘ওর চেহারা মনে আছে?’

‘আছে। চমৎকার দেখতে ছেলেটা। ষাঁড়ের মত শক্তিশালী।
ওজন হবে এক শ’ আশি পাউণ্ড...’

‘এবার ওর বোনের বর্ণনা দে।’

‘দুগুণিত চেহারা। হতেই পারে। ভাইকে হারিয়েছে।’

‘দেখতে কেমন?’

‘অপূর্ব সুন্দরী। রেশমি চুল কোমরে, দীর্ঘ উরু...’

‘ঠিক। তা হলে করিডরে কাকে দেখলাম?’

‘তুই কী বলতে...’ থেমে গেল সোহেল। পরক্ষণে বলল, ‘তা
হলে রবার্তো ম্যানিনির দ্বীপে ওই মেয়ে কে?’

‘জানি না,’ বলল রানা। ‘কিন্তু যেভাবে বিজ্ঞানীর ওপর ঝট্
করে পিস্তল তাক করেছিল, ওকে আমার পেশাদার মনে হয়েছে।’

‘তুই বলেছিলি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে...’ গম্ভীর হয়ে
গেছে সোহেল। ‘তার মানে ওই মেয়ে নকল। মস্ত বিপদে আছে
আসিফ, তানিয়া আর ম্যানিনি।’

মাথা দোলাল রানা। ‘ওদেরকে সতর্ক করতে হবে। ওই মেয়ে
যে-ই হোক, সে কাজ করছে জায়েদ বিন মনযুরের হয়ে।’

সোহেল কিছু বলবার আগেই জোরালো লাথিতে দড়াম করে
খুলে গেল দরজা, ভিতরে ঢুকল উষি সাবমেশিনগান হাতে একদল
লোক। প্রতিরোধের সুযোগই পেল না রানা বা সোহেল। ঝাঁপিয়ে
পড়ে মেঝেতে গৌঁথে ফেলা হলো ওদেরকে।

তিনজন করে চেপে বসেছে রানা ও সোহেলের বুক-পেট-
উরুতে। দু’জন সার্চ করল ওদেরকে।

যা ছিল সবই কেড়ে নেয়া হলো। গায়ের উপর চেপে বসা
লোকগুলো উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাঁচকা টানে তুলল ওদেরকে। ঘরে

এসে ঢুকল এক দীর্ঘদেহী আরব লোক, হাতে রাইফেল। রানা-সোহেলের চিনতে ভুল হলো না জায়েদ বিন মনযুরকে।

রানার সামনে থামল সে, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আমরা তোমাদের আসার অপেক্ষায় ছিলাম।’

‘জানি, তোমার গুপ্তচর আগেই জানিয়েছে,’ বলল রানা।

খুশিতে চকচক করছে বেদুঈনের চোখ, নিষ্ঠুর হাসল। ‘হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ।’ কথাটা শেষ করেই রাইফেলের কুঁদো দিয়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো দিল রানার পেটে।

ফুসফুসের বাতাস ভুস্ করে বেরিয়ে গেল রানার। প্রায় দুই ভাঁজ হয়ে ধুপ্ করে পড়ল মেঝেতে।

‘ওর নাম আলেয়া বিনতে আব্বাস, শুভেচ্ছা জানিয়েছে তোমাদের।’

পঁচিশ

ভাসমান দ্বীপ দি আইল্যাণ্ডে দিনের বেশিরভাগ সময় বিজ্ঞানী রবার্টো ম্যানিনির সঙ্গে কাটিয়েছে আসিফ রেজা ও তানিয়া। পরীক্ষা করা হয়েছে সাগর থেকে তুলে আনা ন্যানোবট।

দ্বীপের সামনের দিকের নিমজ্জিত ল্যাবোরেটরিতে কাজ করা সম্ভব নয় বলে নতুন করে গুছিয়ে নেয়া হয়েছে ছোট একটা ল্যাবোরেটরি। ওখানে রয়েছে ছোট একটা কমপিউটার, রেডিয়ো ট্রান্সমিটার আর টুকটাক যন্ত্রপাতি।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ নেই, কাজেই আলাদাভাবে শনাক্ত

করা যায়নি ন্যানোবট। অবশ্য, তার বদলে দুটো মেডিকেল গ্রেড অপটিকাল স্কোপ কাজে লাগিয়েছে ওরা। দুটো স্কোপ ব্যবহার করে জট পাকিয়ে যাওয়া ন্যানোবটগুলো দেখে মনে হয়েছে, অ্যালগি বা ব্যাকটেরিয়ার মত।

কমপিউটার কম্পোলে বসে টাইপ করে চলেছেন বিজ্ঞানী ম্যানিনি। কাছেই বসেছে জ্যাসিস্টা, নার্ভাস। বার-বার দুই হাত মোচড়া-মুচড়ি করছে। সারা সকাল মূল ন্যানোবটের ডিযাইন অনুযায়ী টেস্ট করা হয়েছে। নানান ধরনের নির্দেশ দেয়ার চেষ্টা করেছেন ম্যানিনি।

‘ওরা কিছুই করছে না,’ দশমবারের মত বলল আসিফ।

‘ঠিক বলছেন তো?’ এখনও কমাণ্ড প্রোটোকল ট্রান্সমিট করছেন ম্যানিনি। ‘আসলে অনেক ছোট তো, বোধহয় খেয়াল করতে পারছেন না।’

‘মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে দেখছি, চুপ করে বসে আছে,’ বলল আসিফ। ‘পিকনিকে ভরপেট খাওয়া মোটা লোকের মত।’

‘তুমি কি আমার বাবার পেট নিয়ে...’ চট করে একবার স্বামীকে দেখে নিল তানিয়া।

‘না-না, উনি নন, বলছি আমার চাচা-শ্বশুরের পেটের কথা,’ আত্মরক্ষা করল আসিফ। দুষ্টুমিতে চকচক করছে চোখ।

‘কী-ই বা মোটা? বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শুয়ে পড়েন দুটো খেয়ে, মাঝে বার বিশেক খান, তারপর ওঠেন রবিবার সকালে।’ মাইক্রোস্কোপে চোখ দিল তানিয়া।

কেশে নিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করলেন ম্যানিনি, ‘এরা খেতে রাজি না। আমার মনে হচ্ছে কমাণ্ড কোড পাল্টে দিয়েছে ডিবোয়ে।’

‘এসব জেনে কী লাভ হবে আমাদের?’ বিরক্ত স্বরে বলল জ্যাসিস্টা।

ম্যানিনি জবাব দেয়ার আগেই কাজের কথায় এল তানিয়া, ‘আমরা কোনোভাবে ন্যানোবট থেকেই কোড জেনে নিতে পারি না? রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে আসবে? জেনে নেয়া যাবে ওদের প্রোগ্রামিং?’

বারকয়েক মাথা নাড়লেন ম্যানিনি। ‘না, সম্ভব না। সেজন্যে অন্য ইকুইপমেন্ট দরকার। এখানে সেসব নেই।’

‘পিয়েরে ডিবোয়ের পেট থেকে সব বের করা যেতে পারে,’ বলল জ্যাসিন্টা। ‘অথবা তার সঙ্গীদের কাছ থেকে? তাদেরকে আটকে রাখা হয়েছে নীচের সেলে। চাবি নিয়ে চলুন গিয়ে কথা বলি তাদের সঙ্গে। মুখ খুলতে রাজি না হলে, অত্যাচারের ভয় দেখালে ঠিকই খুলবে।’

চট করে আসিফকে দেখে নিল তানিয়া। ওরা চিন্তিত হয়ে পড়েছে জ্যাসিন্টার জন্য। বিমান দুর্ঘটনার পর থেকে ক্রমেই আরও রেগে উঠছে মেয়েটা।

‘আমি অত্যাচারের বিপক্ষে,’ বললেন রবার্তো।

‘ওই লোক খুন করতে চেয়েছে আমাদেরকে,’ কড়া সুরে বলল জ্যাসিন্টা।

কয়েক সেকেন্ড পর বললেন বিজ্ঞানী, ‘কথাটা ভুল না। ঠিক আছে, চলুন গিয়ে পিটিয়ে ওর মুখ খুলি। দেখি পেটাবার মত রাবারের হোস পাই কি না।’

‘আপনি তো দেখছি মীর জাফরের মত চট করে চোখ উল্টে নেন!’ বিস্ময় প্রকাশ করল তানিয়া।

‘মীর জাফর কে?’

‘পরে বলব।’

সন্দেহ নিয়ে তানিয়ার দিকে চেয়ে রইলেন বিজ্ঞানী।

‘অত্যাচার না করে আর কোনও উপায় নেই?’ জানতে চাইল তানিয়া।

‘আপনিই পথ বাতলে দিন,’ অভিমান ভরা সুরে বললেন বিজ্ঞানী।

‘সাগরে যেহেতু নির্দেশ দেয়া হয়েছে ন্যানোবটকে, আমরা যদি ওই সিগনাল ইন্টারসেস্ট করি?’

‘থিয়োরিটিক্যালি সম্ভব,’ বললেন ম্যানিনি, ‘কিন্তু সেক্ষেত্রে ওদের খুব কাছে যেতে হবে।’

‘কতটা কাছে?’ জানতে চাইল জ্যাসিস্টা।

কাছে যাওয়ার চিন্তাটা ভাল লাগছে না আসিফের। ‘কতটা কাছে গেলে চলবে?’

‘নির্ভর করে কোন্ টাইপের ট্রান্সমিশন,’ বললেন ম্যানিনি। ‘তা হতে পারে লো-ফ্রিকোয়েন্সি সিগনাল বা শর্টওয়েভ বাস্ট। ওগুলো অনেক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। পাঠানো যায় প্রায় যে-কোনও জায়গা থেকে। আবার হতে পারে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি বা লাইন-অভ-সাইট ট্রান্সমিশন। ওসব পাঠাতে হবে এয়ারক্রাফট, জাহাজ বা স্যাটালাইট থেকে। হতে পারে, ওই ন্যানোবটের পালের একপাশ থেকে পাঠানো হয়েছে সিগনাল। সেক্ষেত্রে সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় উপস্থিত থেকে সিগনাল দিতে হবে।’

‘তাও তো পিয়েরে ডিবোয়েকে নির্যাতন করে কথা বের করার চেয়ে সহজ মনে হচ্ছে,’ বলল জ্যাসিস্টা।

‘সবসময় সবচেয়ে সহজ পথ খুঁজে বের করা সবচেয়ে কঠিন,’ মন্তব্য করল আসিফ। ‘ডক্টর, আপনি কোন্ ধরনের ট্রান্সমিশনের কথা ভাবছেন?’

চুপ করে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন রবার্তো ম্যানিনি, তারপর বললেন, ‘শর্ট-রেঞ্জ কোডেড ব্রডকাস্ট। হাই-ফ্রিকোয়েন্সি।’

‘তার মানে ওই জিনিস খুঁজতে হবে,’ বলল আসিফ।

‘ওটা হবে খুব শর্ট ব্রডকাস্ট,’ সতর্ক করবার ভঙ্গিতে বললেন

বিজ্ঞানী। ‘হয়তো মিলিসেকেণ্ডের হবে। বার-বার বিরতি নিয়ে পাঠাতে পারে। কিন্তু কী খুঁজছি না জানলে বুঝবই না ওটা কী। ব্যাকথ্রাউণ্ডে থাকবে পরিবেশের আওয়াজ। স্ট্যাটিক, রেডিয়ো ট্রান্সমিশন, আইয়োনাইজেশন...এমনি কোটি কোটি সমস্যা।’

‘কাজ শুরু করার আগেই পিছিয়ে যাবেন না তো?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘শুরুতেই সাহায্য পাবেন,’ বলল তানিয়া। ‘আমাদের কাছে একটা জিনিস আছে, ওটা আমাদের পক্ষে কাজ করবে।’ স্যাম্পল দেখাল ও। ‘ওদের আওয়াজ রেকর্ড করলেই হবে। ঘুম থেকে উঠুক, জেনে নেব তাদের কাছে কী ট্রান্সমিট করা হয়েছে।’

খুশি হয়ে উঠলেন ইটালিয়ান বিজ্ঞানী। ‘গুড! এবার কাজ হবে! আর এদিকে দ্বীপটাকে নিয়ে যাব ওই পালের কাছে। আশা করি ছত্রিশ ঘণ্টার ভেতর ওখানে পৌঁছে যেতে পারব।’

ছাব্বিশ

কাজ কেমন এগোচ্ছে দেখতে বিজ্ঞানী রবার্তো ম্যানিনির ল্যাবোরেটরিতে এসে ঢুকল তানিয়া রেজা। কীসের উপর যেন ঝুঁকে মনোযোগ দিয়ে দেখছেন ডক্টর। পাশেই জ্বলন্ত হিট ল্যাম্প। পানি ভরা সরু এক বিকারে রেখেছেন টেম্পারেচার প্রোব। বিকারের ভিতরের পানি কেমন যেন ধূসর রঙের।

‘ডক্টর, ওটার ভিতর কি ন্যানোবট?’ জানতে চাইল তানিয়া।

হঠাৎ ঝট করে সোজা হয়ে বসলেন ম্যানিনি। ‘অ্যা? আপনি

আমাকে চমকে দিয়েছেন, মিসেস রেজা!’

‘সরি।’

‘ঠিকই ধরেছেন, ভিতরে ওই জিনিসই,’ কণ্ঠ থেকে হতাশা লুকাতে পারলেন না বিজ্ঞানী। একটা প্রোব নেড়ে নিয়ে পরীক্ষা করলেন ডিসপ্লে।

‘কী করছেন, তা বলবেন?’

‘একটা ব্যাপার বুঝতে চাইছি,’ কণ্ঠ শুনে মনে হলো, এ বিষয়ে কথা বলতে আপত্তি আছে তাঁর।

সামনের চেয়ারে বসল তানিয়া। সরাসরি চোখ রাখল বিজ্ঞানীর চোখে। ‘বলুন তো, কেন ভয় পায় পুরুষরা? একটু ভ্রান্ত ধারণা করলেই লঙ্কা-কাণ্ড বেধে যাবে?’

‘ওটা আমার সমস্যা নয়,’ বললেন ডক্টর। ‘জীবনে হাজার হাজার ভুল করেছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে, ঠিক হতে পারে আমার ধারণা। আর সেজন্যেই ভয় লাগছে।’

‘কী বিষয় নিয়ে আপনার ভয়?’

‘সম্ভবত ভয়ঙ্কর একটা পরিবর্তন ঘটছে সাগরে।’

‘অথচ, সবই গোপন করছেন,’ বলল তানিয়া। ‘বেশিরভাগ পুরুষের মতই, কথা বলার আগে যথেষ্ট প্রমাণ খুঁজছেন, নইলে কাউকে কিছুই জানাবেন না। ভেবে দেখেছেন, ক্ষতি হতে পারে এতে? আমাদের মাথা থেকেও তো বেরোতে পারে কিছু।’

‘কথা ঠিক।’

‘তা হলে খুলে বলুন।’

‘আপনার স্বামী আপনার কাছে কিছুই গোপন করতে পারেন না, বুঝতে পারছি,’ কাঁধ ঝাঁকালেন ম্যানিনি। ‘আমিই বা পার পাব কী করে?’ কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভেবে নিলেন, তারপর বললেন, ‘আমার ধারণা, সত্যি সত্যি সাগরের তাপমাত্রা কমিয়ে দিচ্ছে ন্যানোবট। কয়েক বছর আগে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঠেকাবার

এক পরিকল্পনার কথা শুনেছিলাম। তাতে বলা হয়েছিল, একের পর এক রকেট ছোঁড়া হবে অর্বিট-এ, আর ওগুলো ছড়িয়ে দেবে কোটি কোটি ছোট রিফ্লেকটিভ ডিস্ক। বিশেষ করে পোল-এ। রিফ্লেকটিভ ডিস্কগুলো ঠেকিয়ে দেবে রোদ, উল্টো সেই তাপ পাঠিয়ে দেবে মহাশূন্যে। এতে তাপমাত্রা কমবে গোটা পৃথিবীর। এখন সাগরে যে সমস্যা দেখছি আমরা, ঠিক একই প্রতিক্রিয়া দেখা যেত ওই ডিস্ক ব্যবহার করলে।’

ওই আর্টিকেলের কথা মনে পড়ল তানিয়ারও।

‘বাস্তবে ওরকম রকেট ছুঁড়ে সফল হতে হলে, আগে সমাধান করতে হবে এক হাজার একটা সমস্যা,’ বললেন ম্যানিনি। ‘কিন্তু চিন্তাটা খারাপ লাগেনি আমার কাছে। মাঝে মাঝেই ভেবেছি, সত্যি কি সম্ভব সফল হওয়া?’

‘এমন নমুনা কিন্তু আমাদের হাতের কাছেই আছে,’ বলল তানিয়া। ‘বড় অগ্ন্যুৎপাতের পর গোটা দুনিয়া জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে ছাই। বাতাসে ভেসে রোদ আটকে দিয়েছে ওই জিনিস, এমন আগেও হয়েছে। প্রায় আপনার ওই ডিস্কের মতই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে অগ্ন্যুৎপাতের কারণে ছাই ঢেকে দিয়েছিল সূর্যকে, ফলে ইউরোপে ফসল উৎপাদন হয় খুব কম, শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। আবার আঠারো শ’ পনেরো সালের কথা বলা যায়: গ্রীষ্মহীন বছর ছিল ওটা। অনেক কমে গিয়েছিল পৃথিবীর তাপমাত্রা। ধারণা করা হয়: এর কারণ ছিল ইন্দোনেশিয়ার মাউন্ট ট্যামবোরা।’

‘আমার ধারণা ছাইয়ের মত করেই সূর্য-কিরণকে আটকে রাখছে ন্যানোবট,’ বললেন ম্যানিনি, ‘অ্যাটমসফিয়ারে তা করছে না, করছে সাগরে।’

তঁার এক্সপেরিমেণ্টের দিকে আঙুল তাক করলেন তিনি। ‘পানির স্যাম্পলে সোলার ওয়ার্মিং আর কুলিং সাইকেল তৈরি করেছি। কিন্তু আমার থিয়োরিতে বড় একটা সমস্যা আছে।

বিকারের ওপরের দিকের ন্যানোবট কাজ করছে প্রায় সাগরের
লবণের মত ।’

‘তাতে সমস্যা কোথায়?’

‘ন্যানোবট কিছু তাপ শুষে নিচ্ছে বটে, কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে
ঠাণ্ডা করছে না পানি । বাস্তবে তার চেয়ে অনেক বেশি শীতল হয়ে
উঠেছে সাগর ।’

‘দু’ধরনের তাপমাত্রার তফাৎ কতটা?’

‘অনেক তফাৎ । নব্বুই পার্সেন্ট ডিভিয়েশন ।’

‘তার মানে আপনার এক্সপেরিমেন্টে...’

‘মাত্র দশ পার্সেন্ট ঠাণ্ডা হচ্ছে পানি । কিন্তু সাগরে... বুঝতেই
পারছেন ।’

ঘরের চারপাশ দেখে নিল তানিয়া । ভাবছে, ঘন্টার পর ঘন্টা
এক্সপেরিমেন্ট করছেন বিজ্ঞানী, কাজটা করতে গিয়ে বড় কোনও
ভুল করেননি তো? অক্সফোর্ডের অধ্যাপক ছিলেন, তার আগে
ছিলেন নাম করা ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপনা ছেড়ে গবেষণা শুরু করেন
কমপিউটার প্রোগ্রামার হিসাবে । তাঁর ভাল করেই জানা থাকার
কথা, কী নিয়ে কাজ করছেন । এর আগে তানিয়া দেখেছে ছয়টি
সেটআপ, প্রতিটি এই এক্সপেরিমেন্টের মতই ছিল নিয়ন্ত্রিত ।

‘দুই ধরনের তাপমাত্রা থেকে কী বুঝব?’ জানতে চাইল
তানিয়া । ‘ধরে নিন আপনি একজন মহিলা, সেভাবে খুলে বলুন
সমস্যা আসলে কী ।’

‘দুটো সম্ভাবনা দেখছি,’ লাজুক হাসলেন ম্যানিনি । ‘কোনও
প্রাকৃতিক কারণে তাপমাত্রা কমেছে, নইলে তাপ কমিয়ে দিচ্ছে
ন্যানোবট । হয়তো ওটা এমন কোনও মেকানিসম, যেটা আমরা
জানি না । বা আবিষ্কার করতে পারিনি ।’

‘সেক্ষেত্রে ওদের পালের দিকে ভেসে যাওয়া ঠিকই আছে,’
বলল তানিয়া । ‘হয়তো কাছে গেলে কিছু জানা যাবে ।’

‘হয়তো।’

আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল তানিয়া, এইমাত্র ঝনঝন আওয়াজে বাজতে শুরু করেছে ল্যাবোরেটরিতে অ্যালার্ম। যেন ফেটে যাবে কানের পর্দা। কমপিউটার মনিটরে বার-বার জ্বলতে শুরু করেছে লাল বাতি।

‘কী হয়েছে, ডক্টর?’ জানতে চাইল তানিয়া।

‘ফায়ার অ্যালার্ম!’ ইন্টারকম সুইচ অন করে বললেন বিজ্ঞানী, ‘কী হয়েছে, চিফ?’

‘একই সঙ্গে কয়েকটা হিট সিগনাল, স্যর,’ বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। ‘এইমাত্র কনফার্মেশন পেলাম। আগুন লেগেছে ইঞ্জিন রুমে।’

চারপাশে ঝনঝন শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে সতর্ক-ধ্বনি, দুই মিনিটের ভিতর বিজ্ঞানীর ল্যাবোরেটরিতে পৌঁছে গেল আসিফ রেজা। দেখল, ইন্টারকমে নির্দেশের পর নির্দেশ দিচ্ছেন ইটালিয়ান বিজ্ঞানী। তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে তানিয়া, চিন্তিত। আসিফকে দেখে বলল, ‘আগুন লেগেছে।’

‘বুঝতে পেরেছি,’ বলল আসিফ। নাকে আসছে ডিজেল পোড়া গন্ধ। ‘ইঞ্জিন রুমে?’

মাইক্রোফোনে জানতে চাইলেন বিজ্ঞানী, ‘রোবট কাজে লাগানো যায় না?’

‘কোনও সাড়া দিচ্ছে না।’

‘কাজ করছে না ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম?’

‘রেসপন্স করছে না।’

অসুস্থ বোধ করছেন রবার্তো ম্যানিনি। ‘সব চালু করার চেষ্টা করুন।’ আবারও ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন তিনি। ‘নিজেদেরই লড়তে হবে। জিয়েনেলি আর আইসোলাকে বলুন আমার সঙ্গে

দেখা করতে। অন্যদের তৈরি থাকতে বলুন।’

আসিফ আর তানিয়ার দিকে ফিরলেন ম্যানিনি। ‘আপনাদের কারও ফায়ার ফাইটিং ট্রেনিং আছে?’

‘আমার আছে,’ বলল আসিফ। ‘আমি আপনার সঙ্গে যাব।’

আন্তে করে মাথা নাড়ল তানিয়া। ‘প্লিজ, আসিফ...’

‘আমার কিছু হবে না,’ স্ত্রীকে ভরসা দিল আসিফ। ‘কয়েকবার ওই ট্রেনিং নিয়েছি। তুমি নিরাপদ কোথাও সরে যাও।’

‘তানিয়া, আপনি কন্ট্রোল রুমে চলে যান,’ বললেন ম্যানিনি। ‘ওখানে আছে আমার চিফ ইঞ্জিনিয়ার। নিরাপদেই থাকবেন।’

‘আপনারা দয়া করে সতর্ক থাকবেন,’ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল তানিয়া।

আসিফের পিছু নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন রবার্তো ম্যানিনি, চলেছেন স্টেয়ারওয়েলের দিকে। নেমে যেতে হবে মেইন ডেকে। ওখানে দ্বিতীয় স্টেয়ারওয়েল ব্যবহার করে নামলে সামনে পড়বে চওড়া করিডর। শেষমাথায় দ্বীপের পিছনের দিকে ইঞ্জিন রুম। ওরা কাছাকাছি যেতেই অনেক বেড়ে গেল ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ।

‘ওই যে ফায়ার স্টেশন,’ লম্বা কয়েকটা দরজা দেখালেন বিজ্ঞানী। ছুটে চলে গেলেন ওখানে।

ওরা আছে ইঞ্জিন রুমের দরজা থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে। পোড়া তেলের গন্ধে জ্বলতে শুরু করেছে নাক। এতটা দূর থেকেও টের পাওয়া গেল আগুনের তাপ।

আগুনের সম্বল আঁকা একটা দরজা খুললেন ম্যানিনি। ভিতরে হুক থেকে বুলছে নোমেক্সের উজ্জ্বল হলদে ফায়ার ফাইটিং সুট। তার উপর ফিতার মত কমলা রং। প্রতিটি সুটের উপরের তাকে রয়েছে এয়ার ট্যাঙ্ক আর মুখোশ। প্রতিটি সুট এসসিবিএ, বা সেলফ-কন্টেইণ্ড ব্রিডিং অ্যাপারেটাস, সঙ্গে ফায়ার অ্যাণ্ড হিট

রেযিস্ট্যান্ট মাস্ক। শেষের জিনিসটার সঙ্গে রয়েছে ইন্টিগ্রেটেড রেগুলেটর, কমিউনিকেশন সিস্টেম আর হেডস-আপ ডিসপ্লে। সুটের একটা হার্নেসে ফ্ল্যাশলাইট এবং অন্যান্য টুলস। পাশেই লো-প্রেশার এয়ার সিলিণ্ডার। সবই ঝুলবে পিঠে।

রবার্তো ম্যানিনি আর আসিফ একটা করে সুট নামিয়ে নিল হ্যাণ্ডার থেকে, দেরি না করে পরতে শুরু করেছে। এমন সময় উপস্থিত হলো জিয়েনেলি আর আইসোলা। ব্যস্ত হাতে সুট নিয়ে পরতে লাগল।

নিজের মুখোশ পরে নিয়েছে আসিফ, চালু করল রেগুলেটর ভালভ। বুড়ো আঙুল তুলে দেখাল বিজ্ঞানীকে। ঠিকভাবেই বাতাস পাচ্ছে।

আসিফের মুখোশের একপাশের একটা সুইচ অন করে দিলেন ম্যানিনি। এক সেকেন্ড স্ট্যাটিক শুনল আসিফ, তারপর হেডফোনে ভেসে এল বিজ্ঞানীর কণ্ঠস্বর।

‘কথা শুনতে পাচ্ছেন?’

‘পরিষ্কার,’ জবাব দিল আসিফ।

‘গুড। রেসপিরেটোরের সঙ্গে রেডিয়ো আছে।’

সম্পূর্ণ তৈরি আসিফ। প্রায় প্রস্তুত দুই ত্রু। দেয়ালের স্টানশনের কাছে সরে গেলেন ম্যানিনি, ওটা থেকে হোস নিয়ে খুলতে শুরু করেছেন।

সামনে বেড়ে হোসের ওজন নিল আসিফ। দ্রুত পায়ে রওনা হয়ে গেল ওরা দু’জন।

ইঞ্জিন রুমের বালকহেড ডোরের দিকে যেতে যেতে বলল আসিফ, ‘কী ধরনের পরিকল্পনা করেছেন, ডক্টর?’

‘চিফ ইঞ্জিনিয়ার চালু করবে রোবট, এদিকে ততক্ষণ আগুন নেভানোর চেষ্টা করব আমরা।’

‘ইঞ্জিন রুমের দরজা বন্ধ করে দিলে ভাল হতো না?’ জানতে

চাইল আসিফ। ‘আগুন ছড়িয়ে পড়ত না।’

‘ভেতরে রয়ে গেছে আমার এক লোক,’ বললেন ম্যানিনি।

জ্বলন্ত ইঞ্জিন রুমের দিকে চাইল আসিফ। ওর মনে হলো না ওই লেলিহান আগুনের ভিতর কেউ বেঁচে আছে। তবুও, থাকতে তো পারে? যা-ই ঘটুক, খুঁজে বের করতে হবে তাকে।

‘কোথায় আশ্রয় নিয়ে থাকতে পারে?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘পিছনে ছোট অফিসঘর আছে। ওটার দরজা বন্ধ করে দিলে বেঁচে যাবে।’

দুটো হোস পাইপ নিয়ে সামনে বাড়ছে ওরা চারজন।

প্রথমটা আসিফ ও ম্যানিনির কাছে। দ্বিতীয়টার দায়িত্বে জিয়েনেলি ও আইসোলা।

‘হোসের মুখ খুলে দিন,’ চেষ্টা করে বললেন ম্যানিনি।

ক্রুদের একজন খুলে দিল ভালভ। জীবন্ত হয়ে উঠল মরা সাপের মত হোস। ফুলে উঠেছে পানির তোড়ে। নয়ল খুলে দিলেন ম্যানিনি, ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল হাই-প্রেসার পানি। আসিফ আর ম্যানিনির রীতিমত কষ্ট হলো হোস বাগিয়ে ধরে রাখতে। অ্যানাকোণ্ডা সাপের মত গড়াতে চাইছে হোস। বয়স্ক মানুষটার কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পেরে পিঠে টোকা দিল আসিফ। ম্যানিনি ঘুরে চাইতেই বলল, ‘আপনি আমার পিছনে থাকুন, নয়ল তাক করছি আমি।’

ম্যানিনি বুঝতে পেরেছেন, নয়ল ফেলে পিছিয়ে এলেন। নয়ল তুলে নিয়ে সামনে বাড়ল আসিফ। ঢুকে পড়ল ওরা ইঞ্জিন রুমের গভীরে। একেকটা বালকহেড পেরোবার সময় মনে হতে লাগল পার করছে নরক। বয়স্ক ম্যানিনির কথা ভেবে খারাপই লাগল আসিফের। ঘন ধোঁয়া, যেন চারপাশে ফেলা হয়েছে কালো চাদর।

কখনও কখনও মাত্র কয়েক ফুট সামনে আসিফকে দেখতে পাচ্ছেন না বিজ্ঞানী। আঁধার করে দেয়া কালো ধোঁয়ার মাঝে

দেখা যাচ্ছে আসিফের রেসপিরেটোরের বিকন। নোমেস্কের সুট ভেদ করে আসছে ভয়ঙ্কর তাপ। সিল করা মুখোশের ফাঁক দিয়ে ঢুকছে ধোঁয়া, বার-বার জ্বলে উঠছে চোখ। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে কমলা শিখা। সামনে এগোতে এগোতে আগুন লক্ষ্য করে পানি ছুঁড়ছে আসিফ, ঠেকাতে চাইছে দু'পাশের শিখা। একেকটা শিখা যেন নরকের ইবলিশ, নেচে চলেছে নিজস্ব আনন্দে। দূরে কয়েকটা বিস্ফোরণ হতেই থরথর করে কেঁপে উঠল ঘর।

সামনে আর দু'পাশের আগুন নেভাতে চাইছে আসিফ। নয়ল অ্যাডজাস্ট করে নিল। পানি ছড়িয়ে পড়বে বিস্তৃত আগুনে। ম্যানিনির দুই ক্রু হোস হাতে লড়ছে আগুনের বিরুদ্ধে। কোথাও থেকে ছিটকে আসছে তপ্ত বাষ্প।

‘ওই বাষ্পের সোর্স বুঝতে পেরেছেন?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘না!’ অন্ধকারের ভিতর চারপাশ দেখছেন ম্যানিনি।

‘চলুন, সামনে বাড়তে হবে!’

আসিফের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছেন ম্যানিনি। আসিফের মনে হয়েছিল, উনি দুর্বল চিন্তের মানুষ, কিন্তু এখন বুঝে গেল, মস্ত ভুল করেছিল। নিজের লোককে রক্ষা করবার জন্য জীবনের ঝুঁকি নিতে একটুও দেরি করেন না এই মানুষটি। আর প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন এই ভাসমান দ্বীপ।

অন্য হোসের সামনের লোকটা চিৎকার করে বলল, ‘ওদিকে!’

সত্যিই ওদিকে দেখা গেল সরু একটা পথ। ওদিক দিয়ে সামনে বাড়তে পারবে ওরা। পিছনে ম্যানিনিকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল আসিফ। ওরা ঢুকে পড়ছে দাবানলের মত এক জায়গায়।

আগুনের মতই তপ্ত হয়ে উঠেছে ডেকের ইস্পাত। আসিফের মনে হচ্ছে, দাঁড়িয়ে আছে জ্বলন্ত লাভার উপর। এমন সময় বাম থেকে এল বিস্ফোরণের আওয়াজ। প্রচণ্ড শক ওয়েভ ধাক্কা দিয়ে

মেঝেতে ফেলে দিল ওদের দু'জনকে ।

বসে বিজ্ঞানীকে উঠতে সাহায্য করল আসিফ । ‘লাভ হচ্ছে না, ডক্টর! আমাদের বোধহয় পিছিয়ে যাওয়াই ভাল!’

‘আপনি চলে যান! আমার লোক এখানে আটকা পড়েছে! ওকে না নিয়ে ফিরব না!’

আস্তু করে মাথা দোলাল আসিফ । পরিস্থিতি এমন হলে নিজেও একই কাজ করত ও ।

আরেকটা বিস্ফোরণ কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ওদেরকে । সামনে লাল একটা দেয়াল তুলে লকলক করছে আগুন । তবে দুই হোসের পানির তোড়ে পথ ছাড়তে হলো ওই প্রাচীরকে ।

ইঞ্জিন রুম তিনতলা উঁচু । দৈর্ঘ্যে এক শ’ বিশ ফুট, চওড়ায় ষাট ফুট । ভিতরে অসংখ্য ইকুইপমেন্ট, পাইপ, হোস আর ক্যাটওয়াক । কোথাও কোথাও আগুনের জিভ ছাত চাটছে । ধোঁয়ার কারণে কিছুই দেখা যাচ্ছে না । আসিফ বুঝে গেল, এই লড়াইয়ে হারতে শুরু করেছে ওরা ।

‘পানি দিয়ে ভরে দিতে হবে কমপার্টমেন্ট,’ জানাল রেডিয়োতে । ‘এ ছাড়া উপায় নেই ।’

‘চেষ্টা করা হয়েছে,’ বললেন ম্যানিনি, ‘কাজ করছে না ফায়ার-সাপ্রেশন সিস্টেম । এক শ’ ষাট ডিগ্রি তাপ হলে কাজ শুরু করার কথা, কিন্তু কিছুই হয়নি । ব্রিজ থেকে চালু করার চেষ্টা করা হয়েছিল, ব্যর্থ হতে হয়েছে ।’

‘নিশ্চয়ই কোথাও ওভাররাইডের ব্যবস্থা আছে?’ বলল আসিফ । ‘ম্যানুয়াল ট্রিগার?’

চারপাশে চোখ বোলাতে শুরু করেছেন ম্যানিনি । ‘চারটা আছে । কাছেরটা সোজা সামনে । জেনারেটরগুলোর পাশে ।’

‘ওটাই অ্যাকটিভেট করতে হবে ।’

দ্বিধাবিহীন হয়ে পড়লেন বিজ্ঞানী । ‘কিন্তু ওটা ট্রিগার করলেই

বন্ধ হয়ে যাবে সব দরজা। ভিতরে যে বা যারা থাকবে, সবাই আটকা পড়বে।’

‘কতক্ষণের জন্যে?’

‘আগুন নেভার পর তাপ কমলে, তখন মুক্তি।’

‘তা হলে চলুন দেরি না করে কাজটা সেরে ফেলি।’

পোড়া জঞ্জাল ভরা পিছনের পথ একবার দেখলেন ম্যানিনি। ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলে নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে পারবেন। বিস্ফোরণের কারণে মাঝামাঝি জায়গায় দুমড়ে গেছে একটা ক্যাটওয়াক, বন্ধ করেছে ওদিকের পথের বেশিরভাগ অংশ। ওখানে ছাতের কাছ থেকে আগুন, ধোঁয়া আর ফুটন্ত পানি ছড়িয়ে পড়ছে নীচে। ওই পথে যেতে পারবেন না। চেষ্টায়ে সম্মতি জানালেন ম্যানিনি, ‘ঠিক আছে, চলুন সামনে যাই!’

কন্ট্রোল রুমে পা রেখে হৈ-চৈ শুনল তানিয়া রেজা। বিজ্ঞানীর ত্রু-রা ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে কমপিউটারে। চালু করতে চাইছে রোবট বাহিনীকে। এখনও চেষ্টা করা হচ্ছে ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ঠিক করতে।

বেঁটে এক মোটা গ্রিক লোক এই দ্বীপের চিফ ইঞ্জিনিয়ার, আগুনের অগ্রগতির ওপর চোখ রাখছে। দুই অগ্নিনির্বাপক টিম নিজেদের মাঝে কথা বলছে, শুনতে পেল তানিয়া। মনে হচ্ছে না তারা লড়াইয়ে জিতছে।

‘এখন অবস্থা কেমন?’ জানতে চাইল তানিয়া। ওর ধারণা হয়েছিল, এতক্ষণে সব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে আসিফরা।

‘আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ছে,’ বলল চিফ। ‘পুরো ইঞ্জিন রুম জ্বলছে। ফিউয়েল লিক হয়েছে বোধহয়। এ ছাড়া আটকা পড়েছে একজন ত্রু। তাকে যেভাবে হোক...’

‘ওরা কি বড় কোনও বিপদে আছে?’ ভয় লেগে উঠল

তানিয়ার। আসিফ আটকা পড়তে পারে আগুনের ফাঁদে।

‘এখনও বেরিয়ে আসতে পারবে,’ বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

‘তাই করা উচিত?’ জানতে চাইল তানিয়া। এইমাত্র ঘরে ঢুকেছে জ্যাসিষ্টা, চোখে-মুখে আতঙ্ক।

‘আসলে কী হয়েছে?’ জানতে চাইল।

‘ইঞ্জিন রুমে আগুন,’ বলল তানিয়া। ‘ভেতরে আটকা পড়েছে এক ত্রু। সব অটোমেটিক সিস্টেম বিকল হয়ে গেছে।’

ধপ্ করে চেয়ারে বসল জ্যাসিষ্টা। কাঁপতে শুরু করেছে ওর হাত। মনে হলো ভেঙে পড়বে মেয়েটা। আপাতত তার দিকে মনোযোগ দেয়ার সময় নেই তানিয়ার। জানতে চাইল, ‘আগুন আরও ছড়িয়ে গেলে— তখন? আমার স্বামী আর অন্যরা ফাঁদে পড়ে যাবে?’

‘যদি আগেই নেভাতে পারে, কোনও বিপদ হবে না,’ বলল গ্রিক। ‘অবশ্য, সেজন্যে ঠেকিয়ে দিতে হবে আগুন।’

লোকটা হাল ছাড়ছে না, ভাবল তানিয়া।

‘নীচে আরও লোক পাঠানো উচিত,’ তানিয়ার মনের কথা বেরোল জ্যাসিষ্টার মুখ দিয়ে।

তানিয়া আর চিফ ইঞ্জিনিয়ার একপলক দেখল জ্যাসিষ্টাকে।

‘রোবট যদি কাজ করতে না পারে, আরও লোক দরকার ওখানে,’ জোর দিয়ে বলল জ্যাসিষ্টা।

‘ও ঠিকই বলেছে,’ সায় দিল তানিয়া। মেয়েটা হঠাৎ করে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পেরেছে দেখে অবাক হয়েছে ও।

‘আমরা চালু করতে চাইছি রোবটগুলো,’ আপত্তির সুরে বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

‘আপনার রোবটের কথা বাদ দিন,’ কড়া সুরে বলল তানিয়া। ‘মাত্র চারজন মানুষ ওই আগুন ঠেকাতে পারবে না।’

‘দ্বীপে আছে সব মিলে বিশজন ত্রু,’ বলল গ্রিক ইঞ্জিনিয়ার।

এটা বিজ্ঞানীর মস্ত ভুল ডিসিশন ছিল, ভাবল তানিয়া। এখন চাইলেই আরও লোক এসে সাহায্য করবে, তা সম্ভব নয়। ‘আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে জানে, এমন লোক নীচে পাঠান,’ তাড়া দিল ও। ‘নইলে ফিরে আসতে বলুন আসিফ আর অন্যদেরকে।’

কমপিউটার নিয়ে ব্যস্ত দুই লোকের দিকে চাইল চিফ। ‘পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হলো?’

মাথা নাড়ল তারা। ‘এটা লুপ কোড। বাইরের লেয়ার ভেদ করলেই নতুন করে রিসেট হচ্ছে। নতুন করে চালু হচ্ছে।’

এর মানে কী, জানে না তানিয়া। কিন্তু এটা বুঝতে পারছে, সফল হতে পারছে না এরা। এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

বড় করে শ্বাস ফেলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। ‘রোবটের কথা ভেবে লাভ নেই।’ কমপিউটারের সামনে বসা লোকগুলোকে বলল, ‘ঠিক আছে, তোমরা রওনা হয়ে যাও। আমি একটু পর আসছি ইঞ্জিন রুমে।’

কমপিউটার স্টেশন ছেড়ে রওনা হয়ে গেল লোকগুলো। তারা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগেই বলল তানিয়া, ‘থ্যাঙ্ক ইউ!’ যাক, ব্যাকআপ হিসাবে কয়েকজনকে পাবে আসিফ।

রেডিয়োতে ভেসে এল ম্যানিনির কণ্ঠ, ‘কপাল খুলল, চিফ?’

‘নেগেটিভ,’ মাইক্রোফোনে জানিয়ে দিল গ্রিক। ‘আপনাদের সাহায্যে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি।’

‘বুঝলাম,’ বললেন ম্যানিনি, ‘আমরা ওভাররাইড করব।’

‘তার মানে কী?’ জানতে চাইল তানিয়া।

‘হ্যালোন দিয়ে ভাসিয়ে দেবেন সব কমপার্টমেন্ট,’ বলল চিফ ইঞ্জিনিয়ার। ‘এবার দপ্ করে নিভে যাবে আগুন।’

‘এর খারাপ দিকটা কী?’ সন্দেহ নিয়ে বলল তানিয়া।

‘হ্যালোন টক্সিক। বন্ধ জায়গায় কাজ করে। ওঁরা অ্যাকটিভ

করলে সঙ্গে সঙ্গে আটকে যাবে সব দরজা। বলতে পারেন, বন্দি হবেন ওঁরা। তারপর আগুন নিভে যাওয়ার পর সেন্সার ঠিক করবে কখন দরজা খুলবে। রুমের তাপ নির্দিষ্ট পরিমাণে কমে গেলে, তখন...’

ভয়ে দম্ব আটকে আসতে চাইল তানিয়ার। বুঝে গেছে কী ধরনের বিপদে পড়বে আসিফ।

‘ওটা বড় সমস্যা নয়,’ বলল চিফ। ‘কমপার্টমেন্টগুলো ভেসে গেলে তিরিশ সেকেন্ডে নিভবে আগুন। ওঁই ঘরের তাপমাত্রা এখন দুই শ’ ছাপ্রান্ন ডিগ্রি। আমার হিসেব অনুযায়ী, কোনও ভুল না হলে ঘরের তাপ কমতে লাগবে বড়জোর দশ মিনিট।’

ভয়ঙ্কর তাপের মাঝে দশ মিনিট পার করবে আসিফ, ভাবতে গিয়ে গলা-বুক শুকিয়ে গেল তানিয়ার। তার চেয়েও খারাপ একটা চিন্তা এল ওর মনে। কয়েক সেকেন্ড পর বলল ও, ‘কোনও ভুল না হলে... আর যদি ভুল হয়? দরজা যদি বন্ধ না হয়? তার চেয়েও বড় কথা, পরে যদি দরজা না খোলে?’

কোনও জবাব দিল না চিফ ইঞ্জিনিয়ার। তার চেহারা দেখে তানিয়ার মনে হলো, এ লোকও একই কথা ভেবেছে।

মেইন ডেকের নীচে ইঞ্জিন রুমে পিছনের দেয়ালের কাছে যাওয়ার জন্য আগুনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে আসিফ ও ম্যানিনি। গুহার মত মস্ত ঘরে সামনে বাড়তে গিয়ে ওদের মনে হচ্ছে, কোনও দিন আর শেষমাথায় পৌঁছাতে পারবে না। বার-বার ভাঙা জিনিসপত্র আর জ্বলন্ত ফিউয়েল রোধ করছে ওদের পথ। অন্য পথে এগোতে হচ্ছে। আরেক জায়গায় ফাটল ধরা পাইপ থেকে ছিটিয়ে পড়তে লাগল ফুটন্ত পানি। এসব পান্ডা না দিয়ে ইকুইপমেন্টের আঁকাবাঁকা গলির মাঝ দিয়ে সামনে বাড়ল ওরা।

পিছনে ফেউয়ের মত আসছে ম্যানিনির দুই ত্রু। চেষ্টা করছে

কাছাকাছি থাকবার। একবার হারিয়ে গেলে বিপদে পড়বে। হোস টেনে একেকবারে তিন ফুট করে সামনে বাড়ছে ওরা। কিছুক্ষণ পর সরল একটা পথ পেয়ে গেল চারজন।

‘হোস সামলে!’ হাঁক ছাড়ল আসিফ। ‘আপনারা পানি তাক করবেন, আর সেই সুযোগে ছুটে পেরিয়ে যাব আগুনের ওই দেয়াল। একবার ওদিকে যেতে পারলে, সিগনাল দেব, তখন আসবেন!’

পিছলে এগিয়ে নয়ল ধরলেন ম্যানিনি। ‘ঠিক আছে, দৌড় শুরু করুন!’

হোস ছেড়ে দৌড় শুরু করল আসিফ। দেখল না, হোস পাইপ নিয়ে টলমল করছেন বয়স্ক বৈজ্ঞানিক। আসিফের বামে ও ডানে পানি ছিটাতে শুরু করেছেন। ইচ্ছা করেই ভিজিয়ে দিলেন সাহসী, বাঙালি যুবককে।

আগুনের প্রথম পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে গেল আসিফ। থামল না, ছুটছে পজিরাজের মত। ঠিক তখনই একপাশ থেকে এল আগুনের ভয়ঙ্কর হলকা। তার ভিতর হারিয়ে গেল আসিফ।

ওদিকে পানি ছুঁড়লেন ম্যানিনি, কিন্তু আগুনের ভিতর যুবককে আর দেখতে পেলেন না।

‘মিস্টার রেজা?’

সামনের ধোঁয়ার মেঘ এতই পুরু, কিছুই দেখা গেল না। দরদর করে ঘামছেন ফায়ার সুটের ভিতর। কটু ধোঁয়ায় জ্বলছে দুই চোখ। কপাল থেকে টপ করে দুটো ঘামের ফোঁটা নামল তাঁর দুই চোখে। চারপাশে পানি ছিটাতে ছিটাতে সামনে বাড়লেন তিনি। কয়েক সেকেন্ড পর দেখলেন ওদিকে সামান্য নড়াচড়া। হোস হাতে এগোতে শুরু করলেন, পেরিয়ে গেলেন আগুনের প্রথম পর্দা, আর তখনই ছিটকে ফেলে দিল তাঁকে আরেকটা বিস্ফোরণের শক ওয়েভ।

ওই একই সময়ে পিছনে চেয়েছে আসিফ। দেখল, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছেন বিজ্ঞানী। জুলজুল করছে তাঁর বিকন।

‘মিস্টার ম্যানিনি পড়ে গেছেন!’ চিৎকার করে জানিয়ে দিল আসিফ। ‘আমি আবারও ফিরছি।’

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করেছে আসিফ, ওদিক থেকে এল পানির ছিটা। তাতে কমল না আগুনের হলকার দাপট। কিন্তু সংকীর্ণ একটা জায়গায় আগুন থেকে একটু দূরে পড়েছেন ম্যানিনি। ভিজে গেছেন, মোটেও নড়ছেন না।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর ওখানে পৌঁছে গেল আসিফ, দেখল কালো হয়ে গেছে বিজ্ঞানীর হুড। ছিঁড়ে পড়েছে মুখোশের অর্ধেক অংশ। খপ্ করে ভঙ্গুর শরীরের বিজ্ঞানীকে পঁজাকোলা করে তুলে নিল আসিফ, ঘুরেই আরেক দৌড়ে বেরিয়ে গেল আগুনের পর্দা ভেদ করে।

বেদম কাশতে শুরু করেছেন ম্যানিনি। আগুন থেকে দূরে তাঁকে মেঝেতে শুইয়ে দিল আসিফ। কিন্তু তখনই থরথর করে কেঁপে উঠল গোটা ঘর। ছাতের কাছ থেকে ঝরঝর করে ওদের উপর নামল জঞ্জাল। আসিফ বুঝে গেছে, এই জায়গা নিরাপদ নয়, আবারও ম্যানিনিকে দাঁড় করিয়ে দিল ও। তাতে কাজ হলো না, ঝপ্ করে হাঁটু মুড়ে বসে পড়লেন বিজ্ঞানী। হাত নেড়ে বললেন, ‘ভারসাম্য রাখতে পারছি না!’

তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরে উঠে দাঁড়াল আসিফ। সরে যেতে শুরু করেছে। ওর মনে পড়ল, ছোটবেলায় স্কুলের এক প্রতিযোগিতার কথা। ময়দার বস্তায় তিনজন ওরা তিন পা পুরে ছুটত। কয়েক রাউন্ডের পর যে দলটা জিতত, তাদের একটা করে বই উপহার দেয়া হতো। এখন পুরস্কার দেয়ালের কাছে— ওরা পৌঁছেও গেছে ম্যানুয়াল ওভাররাইড বিকনের কাছে।

‘আমরা পেরেছি,’ মাইক্রোফোনে জানিয়ে দিল আসিফ।

‘আপনারা বেরিয়ে যান। আমরা ট্রিগার করব হ্যালোন।’

হাত বাড়িয়ে দিল আসিফ, সেফটি সরিয়ে দিয়ে হাত রাখল ওভাররাইড হ্যাণ্ডেলের উপর। কিছুক্ষণ পর ওর মনে হলো, চিরকাল ধরে অপেক্ষা করেছে। ইঞ্জিন রুমের ভিতর আরেকটা জোরালো বিস্ফোরণ হলো।

‘আমরা বালকহেড থেকে সরে গেছি,’ ক্রুদের একজন জানিয়ে দিল।

‘এবার হ্যাণ্ডেল নামিয়ে আনুন,’ বললেন ম্যানিনি।

পরক্ষণে হ্যাঁচকা টানে হ্যাণ্ডেল নামিয়ে আনল আসিফ।

ঘরের একাশিটা জায়গা থেকে ছিটকে বেরোল হ্যালোন, দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা এলাকায়। শুরু হয়েছে জোরালো হিসহিস আওয়াজ। চারপাশের হ্যালোনের দাবড়ি খেয়ে নিভু নিভু হতে শুরু করেছে আগুন। দীর্ঘ শিখাকে কান ধরে মেঝেতে শুইয়ে দেয়া হচ্ছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডে হার মানল আগুন, যেন জাদু-দণ্ডের নির্দেশনায় দপ্ করে নিভে গেল সব।

প্রকাণ্ড ঘরে কোনও আওয়াজ নেই। থমথম করছে চারপাশ।

আসিফের মনে হলো, পৃথিবীর বাইরে চলে এসেছে ওরা। আর কোনও আগুন নেই, কোনও বিস্ফোরণও নেই। আছে শুধু ঘন ধোঁয়া। হ্যালোন নয়ল থেকে এখনও তৈরি হচ্ছে হিসহিস আওয়াজ। কোথাও ভাঙা পাইপ থেকে ঝরঝর করে পড়ছে পানি। ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত ধাতুর তৈরি চার-দেয়াল থেকে আসছে ক্যাচকোঁচ আওয়াজ।

আগুন নিভতে স্বস্তি ফিরেছে আসিফ আর ম্যানিনির মনে। কয়েক মুহূর্ত নড়ল না কেউ। মুখ খুললে যেন আবারও পড়তে হবে ওই নরকে। পুরো আধমিনিট পর আসিফের দিকে ফিরলেন বৈজ্ঞানিক, চোঁটে চওড়া হাসি।

‘ওয়েল ডান, মিস্টার রেজা! ওয়েল ডান!’

খুশি মনে হাসল আসিফ। মস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে ওরা। কিন্তু ঠিক তখনই তীক্ষ্ণ একটা ইলেকট্রনিক বিপ শুরু হলো। বিজ্ঞানীর এসসিবিএ-র পিঠে দপ্ দপ্ করছে লাল বাতি। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পর ওই একই আওয়াজ শুরু হলো আসিফের সুট থেকেও। দুই অ্যালার্ম যেন বেসুরো দাঁড়কাক।

‘আবার কী হলো, ডক্টর?’ জানতে চাইল আসিফ।

‘রেসকিউ বিকন,’ ঢোক গিললেন ম্যানিনি।

‘এখন চালু হলো কেন?’

দুশ্চিন্তার ছাপ পড়েছে বৈজ্ঞানিকের মুখে। মুষড়ে পড়া কণ্ঠে বললেন, ‘কারণ... খুব দ্রুত ফুরিয়ে আসছে আমাদের বাতাস!’

সাতাশ

পেরিয়ে গেছে বেশ কয়েক ঘণ্টা, আটকে রাখা হয়েছে মাসুদ রানা আর সোহেল আহমেদকে। খাবার নেই, পানি নেই, আলো নেই, আশপাশেও কেউ নেই। পেটানো হয়নি ওদেরকে, জিজ্ঞাসাবাদ বা নির্যাতনও করা হয়নি। শুধু ছোট এক ঘরে মোটা পাইপের সঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে ওদের হাত। ওই পাইপ গেছে টেস্ট ট্যাঙ্কে।

আঁধারে শোনা গেল সোহেলের শুকনো, কর্কশ কণ্ঠ: ‘প্রশংসা করতে পারছি না শালা! আমাদেরকে কুস্তার মত আটকে রেখেছে শিকল দিয়ে!’

পানির অভাবে শুকিয়ে গেছে রানার কণ্ঠ। এতক্ষণ চুপ করে

দাঁড়িয়ে ছিল। এবার বলল, ‘অনেক আগেই এদের আসার কথা।’

‘শত্রু শেষ করে আসতে দেরি হচ্ছে।’

‘লড়াই তো অনেক আগেই শেষ।’

‘ব্যাটার হারেমের চারপাশ পরিপাটি করছে।’

‘নিশ্চয়ই নতুন কোনও বার্তা পাঠিয়েছে নকল জ্যাসিণ্টা।’

‘তাতে আমাদের কী লাভ,’ বলল সোহেল। ‘বুঝলাম না: ডকে মেয়েলোকটার ওপর হামলা করেছিল কেন?’

চুপচাপ ভাবছে রানা। কিছুক্ষণ পর বলল, ‘ওটা ছিল ভাল ডাইভারশন। ধরে নিয়েছিলাম, মেয়েটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। ভাবতেও পারিনি নকল। কাজেই কোনও সন্দেহও করিনি। সত্যিকারের ভাল অভিনয় শিল্পী। প্রথম থেকেই দক্ষতার সঙ্গে ভিড়ে গেছে দলে। আসলে, যা দেখতে চাই, তাই আমরা দেখি। ধরে নিয়েছি, বিপদে পড়েছে অবলা নারী। জ্যাকো, জনসন আর টিনা হারিয়ে যাওয়ায় হয়ে উঠি অতিরিক্ত সতর্ক। নকল জ্যাসিণ্টাকে উদ্ধার করার পর আড়াল করে রেখেছি।’

‘তার ওপর ওর কাছে ছিল আসল জ্যাসিণ্টার পাসপোর্ট,’ কৈফিয়তের সুরে বলল সোহেল।

‘তোর এত লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই,’ বলল রানা। ‘আমরা কেউ ভাবিনি খুঁটিয়ে দেখা উচিত ওই পাসপোর্ট।’

‘গুনেছি, ভাইয়ের বিষয়ে নুমা-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছে জ্যাসিণ্টা,’ দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহেল, ‘ভাবতেও পারিনি আসল জ্যাসিণ্টার পাসপোর্ট নিয়ে হাজির হবে নকল মেয়েলোকটা। আসল মেয়ে মালে দ্বীপে নামতেই ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে এখানে।’

ওরা বুঝতে পারছে, সামনে অপেক্ষা করছে মস্ত বিপদ। তা এড়াতে চাইলে বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

কিছুক্ষণ পর বলল রানা, ‘আমার পাইপ হাতড়ে দেখেছি।

কোনও দুর্বল জায়গা নেই।’

‘এটাতেও নেই। নেড়েচেড়ে টিলা করতে চেয়েছি। কিন্তু পাথরের দেয়ালে গাঁথে রেখেছে। নড়ে না।’

আবার চুপ হয়ে গেল দুই বন্ধু।

এক মিনিট পেরোবার আগেই খুলে গেল ঘরের দরজা। দপ্ করে জ্বলে উঠল ছাতে উজ্জ্বল বাতি।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য অন্ধ হয়ে গেল রানা-সোহেল।

ঘরে ঢুকেছে জায়েদ বিন মনযুর আর দাড়িওয়ালা এক লোক। পিছনের জনকে আগেও দেখেছে ওরা। এ-ই সুইমিং পুলের নীচের ঘর থেকে সরিয়ে নিয়েছিল বেদুঈন নেতাকে। এখন তাদের সঙ্গে একদল সশস্ত্র লোক।

‘দাওয়াত করুল!’ আরবিতে বলল সোহেল। মনে হলো স্বয়ং সৌদি বাদশা। ‘কিন্তু খানা কোথায়?’

‘চোপ, বেয়াদব!’ বেদম জোরে ধমক দিল খালিফ।

ডান হাত উপরে তুলল জায়েদ বিন মনযুর। অখুশি নয়। ‘আজ চমৎকার কাটল তোমাদের।’ নিখুঁত ইংরেজি বলে সে। আরবি টান নেই কণ্ঠে। ‘সামনে আরও সুন্দর দিন আসছে। সেই প্রথম থেকেই চোখ রাখা হচ্ছে তোমাদের ওপর।’

‘তুমিও জানো না, অনেকে চোখ রাখছে তোমার ওপর, জায়েদ বিন মনযুর,’ জবাবে বলল রানা। ‘আমাদের ছেড়ে না দিলে একদল লোক এসে তোমাকে পুঁতে রেখে যাবে এখানে।’

‘তা হলে ধরেই নিয়েছ, মারা পড়ছ?’ মৃদু হাসল জায়েদ।

‘মরার ভয় আমরা করি না,’ শুকনো গলায় বলল সোহেল।

‘তোমার নিজের কপালে কী ঘটবে, ভাল করে ভেবে নাও,’ বলল রানা।

রাগের ছাপ পড়ল বেদুঈন নেতার চোখে। ‘আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাদের।’

‘না ভেবে পারছি না,’ বলল রানা। ‘পাহাড়ের নীচের ওই ল্যাবোরেটরিতে খেলনা তৈরি করছ, কিন্তু সবই উড়ে যাবে বোমার আঘাতে। নুমা থেকে কেউ না এলেও বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকে আসবে ট্রেইণ্ড, দুর্ধর্ষ এজেন্টরা। ওরা কিন্তু কোনও দয়ামায়া করবে না তোমাদের। কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।’

‘পালাতে চাইব ভাবছ, মিস্টার রানা?’ ভুরু কৌচকাল জায়েদ।

‘এখনও না চাইলে ভুল হচ্ছে,’ বলল রানা। ‘পিঠ বাঁচাতে হামলা করেছে নুমার সেইল বোটে, আজ খুন করেছে দুই লোককে— এ থেকে বুঝতে পারছি, নানান দুর্বলতা আছে তোমার।’

পেট থেকে উঠে এল বেদুঈনের খলখল শব্দের হাসি। ওটা থামবার পর বলল, ‘আমার চেয়ে অনেক বড় বিপদে আছ তোমরা।’

‘বাঁচতে চাইলে এখনও পথ দেখিয়ে দিতে পারি,’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা।

চট্ করে রানাকে দেখে নিল সোহেল। মুখ আরেক দিকে ফিরিয়ে বিড়বিড় করল বাংলায়, ‘শালা, চাপাবাজ!’

শত্রুর মনে সন্দেহের বীজ বুনতে চাইছে রানা। ‘জায়েদ বিন মনযুর, জানো না বিসিআই আর নুমার লোক এখন ইয়েমেনে...’

‘চুপ!’ রানার বামে সরল জায়েদ। ‘মৃত্যুর জন্য তৈরি হও!’

‘মরবে সবাই,’ নির্বিকার কণ্ঠে বলল রানা। ‘কিন্তু অন্য বিষয়ে আলাপ করা যাক: ভেবে দেখেছ, কেন পাঠানো হলো আমাদের? আমেরিকানরা পাঠাতে পারত বাস্কার-বাস্টিং বোমা সহ স্টেলথ ফাইটার। বদলে আমাদের কেন? ...কারণ, বিসিআই চিফ আর নুমা চিফ আলাপ করেছেন, সুযোগ দিতে চাইছেন তাঁরা তোমাকে। তাঁরা চান...’

‘এসব মিথ্যা বানোয়াট গল্প,’ বলল বেদুঈন নেতা।

‘কথা মানা না মানা তোমার ইচ্ছা,’ বলল রানা। ‘আমাদের বলা হয়েছে, চারপাশ দেখে বিসিআই-এ রিপোর্ট করতে। আর এরপর বৃহত্তম শক্তি, অর্থাৎ আমেরিকান সরকার যোগাযোগ করবে তোমাদের সঙ্গে। তাদের টাকার অভাব নেই। ক্ষমতাও...’

‘বোকা মনে হয় বুঝি আমাকে?’ হঠাৎ করেই রেগে গেল লোকটা। ‘শুয়োরের বাচ্চা আমেরিকান সরকার চিরকালের বেঈমান! কোনও চুক্তি করে না! আর করলেও তা ভঙ্গ করে!’

‘কথাটা ঠিক নয়,’ বলল রানা, ‘নিশ্চয়ই বইয়ে পড়েছ, ওয়ার্নার ফন ব্রাউনের নাম? সে ছিল নাযি। জার্মান ওই বিজ্ঞানী তৈরি করেছিল হাজার হাজার মানুষকে খুন করার রকেট। তাকে উল্টো জামাই আদরে রেখেছিল আমেরিকান সরকার। তার কাছ থেকে রকেটের প্রযুক্তি জেনে নিয়েছিল। বা ধরো রাশান পাইলট ভিক্টর বেলেনকোর কথা। সে মিগ-২৫ নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়। তাকে দেয়া হয়েছিল রাজকীয় সম্মান। প্রতি বছর আমেরিকান সরকার সেরা ব্যালে ড্যান্সার থেকে শুরু করে তীক্ষ্ণদী কমপিউটার প্রোগ্রামার নিয়ে যাচ্ছে নিজেদের দেশে। যাদেরই মগজে দেয়ার মত কিছু আছে, তারা থাকছে আরামে। তুমি হতে পারো তাদের সেরা। অনেক কিছু দেয়ার আছে তোমার। ওই ন্যানোবট...’

‘যথেষ্ট শুনলাম,’ দাড়িওয়ালা লোকটার দিকে ঘুরল জায়েদ বিন মনযুর।

‘তোমাদের দেশে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ,’ নাছোড়বান্দার মত বলছে রানা, ‘তোমার টাকা বা টেকনোলজি এখানে নিরাপদ নয়। আর রাতে যাদেরকে খুন করলে, তাদের লোকও ছাড়বে না তোমাকে। কিন্তু চাইলেই এড়িয়ে যেতে পারো বিপদ। আমাদের মুক্ত করে দিলে প্রমাণ হবে, তুমি রাজি আমেরিকান সরকারের

হয়ে কাজ করতে ।’

একবার আড়চোখে চট করে সোহেলকে দেখল রানা ।

নাক কুঁচকে গেছে সোহেলের । অস্ফুট স্বরে বলল, ‘শেষে জন্নের বদ এক দেশের নাম ভাঙিয়ে...’

ভয়ঙ্করভাবে ভুরু কুঁচকে নিয়েছে জায়েদ বিন মনযুর । ‘আর বেশি দিন নেই, আমার পা চাটবে তোমার আমেরিকান বাবারা! কিন্তু তার অনেক আগেই মরুভূমিতে পড়ে থাকবে তোমাদের সাদা হাড়!’ গার্ডদের দিকে ইশারা করল সে । ‘আগে আচ্ছামত ধোলাই দাও এদের, তারপর নিয়ে আসবে বাইরে । ওখানে থাকব আমি ।’

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল লোকটা । পিছু নিল তার বৃদ্ধ সঙ্গী । রয়ে গেছে শক্তপোক্ত চারজন লোক । নরম করে নেয়ার জন্য প্রথম গোটা দশেক ঘুষি নামল রানা-সোহেলের ঘাড়ে-নাকে-মুখে । তারপর শুরু হলো ডাঙা দিয়ে গা-হাত-পায়ের হাড় ছেঁচে দেয়া । সঠিক সময়ে গা মুচড়ে সরতে চাইছে রানা । যতটা ব্যথা লাগছে, তার তিন গুণ আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে ।

একই কাজ করছে সোহেল, সরছে দক্ষ মুষ্টিযোদ্ধার মত । তাতে যে খুব লাভ হচ্ছে, তাও নয় ।

ডাঙার একটা বাড়ি বেকায়দাভাবে নামল রানার ডান ভুরুর উপর, ঠাস করে ফেটে গেল চামড়া । রক্তাক্ত হয়ে উঠল ক্ষতটা । ওই আঘাত মারাত্মক, এমন ভঙ্গি নিয়ে টলতে শুরু করেছে রানা । শিকলে বাঁধা দুই হাতে ভর করে বসে পড়ল । ডাঙার আরও দুটো বাড়ি আর কোমরে এক লাথি খেয়ে বুলে থাকল শিকলে ।

ওর উপর থেকে আগ্রহ হারাণ লোক দু’জন, মৃদু মৃদু হাসছে । আরবিতে কী যেন বলল, বোধহয় খারাপ কোনও গালি ।

অর্থ বুঝল না রানা । চুল ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো ওকে । খুলে গেল হ্যাণ্ডকাফ । পিঠে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । অর্ধনিম্নীলিত চোখে বন্ধুকে খুঁজল রানা । পাশেই সোহেল ।

ওর মত করেই ঠেলে নেয়া হচ্ছে।

উত্তপ্ত কড়াই থেকে এবার জ্বলন্ত উনুনে?— ভাবল রানা।

প্রধান সুড়ঙ্গে বেরোতেই পেয়ে গেল জবাব।

এবার ওদেরকে বের করবে গুহা থেকে। শাফটের মাঝ দিয়ে দেখা গেল, সূর্যের উজ্জ্বল কমলা রোদ। মাঝ দুপুর। এ সময়ে লেলিহান আগুন ভরা নরক হয়ে ওঠে মধ্যপ্রাচ্যের মরুভূমি।

ঠেলে ঠেলে ওদের নিয়ে যাওয়া হলো এক এসইউভির পিছনে। গার্ডরা অস্ত্র তাক করে রেখেছে, ভয়ঙ্কর অশুভ চেহারার এক গার্ড তিন ফুটি দুটো দড়ির প্রান্তে বেঁধে দিল রানা-সোহেলের হাত। দড়ির অপর প্রান্ত বাঁধা আছে গাড়ির পিছনের বাম্পারে।

‘সুখী হতে পারলাম না,’ বিড়বিড় করল সোহেল।

‘বোধহয় টেনে নেবে মরুভূমির ওপর দিয়ে,’ বলল রানা।

কথা শুনে ভাষা না জানলেও খিকখিক করে হাসল ড্রাকুলার মত চেহারার এক গার্ড। উঠে পড়ল গাড়ির ড্রাইভিং সিটে। গর্জন ছাড়ল শক্তিশালী ইঞ্জিন। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে দ্রুত ভাবতে শুরু করেছে রানা, কিন্তু হাত বাঁধা অবস্থায় চাইলেও ধরতে পারবে না গাড়ির এদিকের মসৃণ দেহ।

আরেকবার গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

চট করে রানার দিকে চাইল সোহেল।

‘কিছুই করার নেই,’ শুকনো কণ্ঠে বলল রানা।

আস্তে করে মাথা দোলাল ওর প্রিয় বন্ধু।

তখনই চাকা পিছলে হেঁচট খেয়ে রওনা হলো এসইউভি। তাল সামলে পিছু নিয়ে ছুটেতে শুরু করেছে রানা-সোহেল।

কয়েক সেকেণ্ড পর অবাক হলো রানা, মোটেও গাড়ির গতি বাড়াচ্ছে না ড্রাইভার। ওদের টেনে নিয়ে চলেছে জগিঙের চেয়ে একটু জোর গতিতে।

ওদের পিছনে হাসছে প্রহরীরা। তারিয়ে তারিয়ে দেখছে, তাল

সামলে রাখতে গিয়ে কেমন হোঁচট খাচ্ছে ওরা ।

কিন্তু এক মিনিট পর সামান্য বাড়ল গাড়ির গতি । সামনের বালি হয়ে উঠেছে কর্কশ, এবড়োখেবড়ো ।

‘এবার কী?’ হতাশ সুরে বলল সোহেল, ‘শালারা আমাদেরকে নরকের দিকে নিয়ে চলেছে!’

নরম বালির ভিতর ডেবে যাচ্ছে পা ।

প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে রানা । সোহেলকে বলল, ‘টিকে থাকার চেষ্টা কর!’

‘কীভাবে? তাল রাখা কঠিন হয়ে উঠছে!’

‘তোরা মাথায় কিছু আসছে?’ জানতে চাইল রানা ।

‘কী করে? তুই হচ্ছিস তুখোড় বিসিআই ব্রেন! আর আমি হচ্ছি অপরূপ সুন্দর, আকর্ষণীয় রোমিও, হারেমের রাজা!’

‘শালা, বালির ভেতর দিয়ে জায়গা মত পৌছে দেখবি তোরা নাভির নীচ পর্যন্ত ক্ষয়ে মিশে গেছে বালিতে! তখন বেরিয়ে যাবে রাজাগিরি ।’

জবাব দিল না সোহেল । ছোট একটা টিলার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করেছে এসইউভি । আরও কঠিন হয়ে উঠছে দৌড়ে ওঠা । গাড়ির পিছনের চাকা থেকে ছিটকে ওদের চোখে-মুখে পড়ছে বালি আর কাঁকর । চূড়া পেরিয়ে যাওয়ার পর আবারও নামতে লাগল ওদিকে ।

আগুনের মত তাপ ঢালছে সূর্য । বাতাসের তাপমাত্রা কমপক্ষে এক শ’ দশ ডিগ্রি । গরমের ভিতর তিন মিনিট দৌড়াবার পর খাঁ-খাঁ করছে ওদের বুক । দরকারী পানি বেরিয়ে যাচ্ছে শরীর থেকে । দূরে আরেকটা পাথুরে জমি দেখল ওরা । জায়গাটা হবে এখান থেকে কমপক্ষে এক মাইল দূরে । ওই দিকেই ওদের নিয়ে চলেছে গাড়ি ।

কীসে যেন বেধে পড়তে পড়তেও সামলে নিল সোহেল ।

বিড়বিড় করে বলল, ‘কসম, আর কখনও বিয়ার আর সিগারেট
ছুঁয়েও দেখব না!’

‘দৌড়ের দিকে মন দে,’ সতর্ক করল রানা।

চুপচাপ দৌড়াতে থাকল সোহেল। বিপদ এড়াবার জন্য কী
করা উচিত, ভাবছে রানা।

পিছনের ওই প্রহরীরা আসছে না। একবার যদি ওরা দু’জন
পৌছাতে পারে সামনের ওই পাথুরে এলাকায়, চট করে তুলে
নেবে একটা পাথর। অন্তত চেষ্টা তো করবেই। আর তা যদি
করতে পারে, ওই পাথর দিয়ে কেটে দেবে দড়ি। যা করার
ঝটপট করতে হবে, নইলে মরতে হবে। বেশিক্ষণ দৌড়াতে
পারবে না ওরা বালির ভিতর।

রানা এসব ভাবছে, এমন সময় দক্ষিণে বাঁক নিল এসইউভি।
ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটা গাড়ি। ওখানে পৌছে ব্রেক
কষে থেমে গেল এসইউভি। কুকুরের মত বসে পড়ে হাঁপাতে
থাকল রানা-সোহেল। বুকের কাছে নামতে চাইছে শুকনো জিভ।

‘শালারা সাক্ষাৎ ইবলিশ,’ সামলে নেয়ার ফাঁকে বলল
সোহেল।

চুপ করে জিরিয়ে নিতে চাইল রানা। দেখল, একটু দূরে
দাঁড়িয়ে আছে জায়েদ বিন মনযুর। সঙ্গে বেশ কয়েকজন লোক।
পাশে মনে হলো পরিত্যক্ত একটা কূপ।

ওদের দিকে হেঁটে এল বেদুঈন নেতা। খেয়াল করেছে রানার
চোখ কূপের উপর। ‘খুব তৃষ্ণা, তাই না?’ জানতে চাইল।

চুপ করে থাকল রানা।

ওর উপর ঝুঁকে এল জায়েদ বিন মনযুর। ‘তুমি কখনও
জানবে না তৃষ্ণা নিয়ে আস্ত মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ছোট একটা
মরুদ্যান দেখলে কেমন লাগে। ততক্ষণে বুক-গলা-মুখ বুজে
এসেছে বালিতে। শুকিয়ে গেছে দুই চোখের কোটর। শরীরে পানি

নেই যে একটু ঘাম বেরোবে। বেদুঈনের জীবন এমনই। দু'চার মাইল মরুভূমিতে হাঁটতে বিন্দুমাত্র আপত্তি থাকে না আমাদের।’

‘তুমি চেপে এসেছ উটে, আর আমাদের টেনে এনেছ এসইউভি দিয়ে,’ আপত্তির সুরে বলল সোহেল।

দলের লোকগুলোর দিকে ফিরল জায়েদ বিন মনযুর। ‘আমাদের অতিথিদের আপ্যায়ন করতে হবে। ওদের নিয়ে চলো কূপের পাশে।’

প্রহরীরা খুলে দিল রানা আর সোহেলের হাতের দড়ি। চুল ধরে টেনে তোলা হলো। পিঠে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে চলল কূপের দিকে। খুব কাছে পৌঁছে রানা টের পেল, ওখানে পানি নেই। ওই গহ্বর থেকে উঠে আসছে মৃত্যুর দুর্গন্ধ।

মানসিকভাবে তৈরি হয়ে গেল রানা, পরক্ষণে ঘুরেই লাথি বসিয়ে দিল পাশের প্রহরীর গোড়ালিতে। খপ করে কেড়ে নিতে চাইল তার অস্ত্র। একই সময়ে কাজে নেমেছে সোহেল, ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিল ডান হাত, ওর একটা ঘুষি নামল বামের গার্ডের ঘাড়ের রগে।

ওদের আকস্মিক হামলা হতবাক করে দিয়েছে বেদুঈনদের। ভাবতেও পারেনি, খাবার, পানি আর বিশ্রাম ছাড়া প্রায় একটা দিন কাটিয়ে দেয়া দু’জন লোক আক্রমণ করবে উল্টে। আচ্ছামত তাদেরকে পেটানোও হয়েছে। মরুভূমির ভিতর দিয়ে হাঁটিয়ে আনা হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা, মাত্র এক মিনিট আগেও বালিতে শুয়ে ছিল শুকনো ঝিনুকের খেলের মত।

সঙ্গীদের সাহায্য করতে ছুটে এল জায়েদের চারজন লোক। কিন্তু দুই দুর্ধর্ষ বাঙালি এজেন্ট যেন হয়ে উঠেছে তুমুল ঘূর্ণিঝড়। ওদের একের পর এক গোটা পাঁচেক ঘুষি খেল দুই প্রহরী। একজনের মুখে লাগল রানার লাথি। সোহেলের লাথি পড়ল বামদিকের প্রহরীর অণ্ডকোষের উপর। বিকট এক চিৎকার ছাড়ল

সে ।

সামলে নিয়ে রানাকে ট্যাকল করতে চাইল আরেকজন । বড় একটা লাফ দিয়ে সরে গেল রানা, তার আগে পা বাধিয়ে ফেলে দিয়েছে লোকটাকে আরেক সঙ্গীর গায়ে । ধড়াস্ করে বালিতে পড়ল তারা । আরেক লাফে সামনে বাড়ল রানা, বালি থেকে তুলে নিতে চাইল একজনের পিস্তল । কিন্তু তখনই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিন বেদুঈন, তারাও পিস্তল হাতে পাওয়ার জন্য হাতড়াচ্ছে বালি ।

রানা পিস্তল তুলে নিল ঠিকই, কিন্তু তাক করতে পারল না । ‘বুম!’ শব্দে বেরিয়ে গেল বুলেট । কেঁউ করে উঠল এক বেদুঈন । উড়ে গেছে তার একটা আঙুল । আবারও ট্রিগার টিপতে চাইল রানা, কিন্তু তখনই প্রচণ্ড একটা বাড়ি পড়ল ওর মাথার পিছনে । হাত থেকে পড়ে গেল পিস্তল ।

রানার মত করেই বালিতে গেঁথে ফেলা হলো সোহেলকেও ।

‘ওদের টেনে তোলা!’ উত্তেজিত কণ্ঠে নির্দেশ দিল জায়েদ ।
‘ফেলে দাও ভেতরে!’

ক্ষিপ্ৰ চিতার মত ঝটকা দিয়ে সরতে চাইল রানা, কিন্তু চার হাত-পা ধরে দুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে কূপের কাছে । যারা দাঁড়িয়ে দেখছে, সবাই দুলতে শুরু করেছে কনসার্টে ব্যাণ্ডের গানের শ্রোতার মত ।

রানা-সোহেলকে চ্যাংদোলা করে নিল কূপের পাশে । ওখানে বালিতে নামিয়ে হাফ নেলসন স্টাইলে রানাকে সামনে ঠেলল এক প্রহরী । এবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে ।

ডাঙায় তোলা মাছের মত বার-বার ঝটকা দিচ্ছে রানা । ওর ডান পা ছুটে যেতেই কষে একটা লাখি বসিয়ে দিল বামপাশের লোকটার মুখে । পিছাতে গিয়ে পোড়া মাটির নিচু দেয়ালে বেধে গেল লোকটার গোড়ালি, চমৎকার একটা ডিগবাজি খেয়ে পড়ে

গেল কূপের ভিতর। নীচে নেমে গেল আর্তচিৎকার। কিন্তু মাত্র তিন সেকেণ্ড পর থেমে গেল সব আওয়াজ।

অন্য তিনজন দোলাতে শুরু করেছে রানাকে, ও যেন ভারী বালির বস্তা। আরেকবার দুলিয়ে নিয়ে ওকে ফেলে দেয়া হলো কূপের মুখ দিয়ে।

পড়তে শুরু করে সামনে নিচু দেয়াল দেখল রানা। গা মুচড়ে পড়ে যাওয়ার সময় ধরতে চাইল নিচু এ-ফ্রেম। ধরেও ফেলল। বুলছে দক্ষ বাঁদরের মত।

এক সেকেণ্ড পর ভাঙা বালতির মত ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো সোহেলকে কূপের ভিতর। পড়তে শুরু করে বাঁচবার জন্য খপ্প করে রানার পা জাস্টে ধরল সোহেল।

তগু এ-ফ্রেম প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে রইল রানা, সম্পূর্ণ অসহায়।

হেলে পড়া সূর্যকে আড়াল করল কালো একটা ছায়া।

জায়েদ বিন মনযুরের হাতে দেখা দিল একটা ব্যাটন। মাথার উপর ওটা তুলল সে, তারপর নেমে এল ডাঙা রানার আঙুল লক্ষ্য করে। ওটা লাগবার এক সেকেণ্ড আগে হাত ছেড়ে দিল রানা।

সোজা কূপের গভীর লক্ষ্য করে রওনা হয়ে গেল দুই বন্ধু। প্রথমে সরাসরি বিশ ফুট নীচে বালির একটা ঢালু জায়গায় পড়ল ওরা, সড়াৎ করে পিছলে নামল আরও বিশ ফুট। থামল কূপের একেবারে নীচে।

প্রথম পতনে সারা শরীরের হাড় নড়ে গেছে রানার। কিন্তু বালির ঢাল থেকে ধুপ্প করে নেমেছে পচে যাওয়া দুটো লাশের ওপর। মৃতদেহ দুটো এয়ার ব্যাগের কাজ করেছে। অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে আঘাত।

এত ওপর থেকে বিদঘুটে ভঙ্গিতে উপড় হয়ে পড়ে অবশ হয়ে গেছে দেহ, জোর করে চোখ খুলল রানা। মাত্র এক ফুট বামেই

সোহেল । মনে হলো ছেঁড়া কাপড়ের পুতুল । দেহের নীচে চাপা পড়েছে বাম হাত । ডান পা বেকায়দা অ্যাংগেলে । একটুও নড়ছে না সোহেল ।

উপরে আওয়াজ শুনল রানা । সাহস হলো না নড়তে । চোখের কোণে দেখল, কুয়ার পাড় থেকে উঁকি দিয়েছে জায়েদ বিন মনযুর । কয়েক সেকেণ্ড পর শুরু হলো গুলি । নানান দিকে ছিটকে গেল ধুলোবালি আর পাথরের টুকরো । তীক্ষ্ণ কী যেন কেটে দিল রানার পা । একটা বুলেট বা পাথরের ফ্র্যাগমেন্ট লাগল ওর মুখ থেকে মাত্র এক ইঞ্চি দূরে । ছিটকে উঠল বালি ।

মরা কচ্ছপের মত পড়ে রইল রানা । সাহস নেই যে নড়বে । আটকে রেখেছে দম ।

কিছুক্ষণ পর উপর থেকে শুনল আরবি নির্দেশ । ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলা হলো কুয়ার মাঝে । চোখের কোণে ওটা দেখছে রানা । নড়ছে না ভুলেও । আশা করছে, লোকগুলো ওকে দেখে নিশ্চিত হবে, সত্যিই মারা গেছে ও ।

আবার তুলে নেয়া হলো ফ্ল্যাশলাইট । কী যেন আলাপ চলছে উপরে । এক মিনিট পর কুয়ার পাড় থেকে সরে গেল মুখগুলো । নীরবে পড়ে থাকল রানা । দেড় মিনিট পর গর্জে উঠল বেশ কয়েকটা ইঞ্জিন । রওনা হয়ে গেল গাড়িগুলো । একটু পর হারিয়ে গেল সব আওয়াজ ।

রানা এখন মোটামুটিভাবে নিশ্চিত, বেদুঈন নেতা ধরে নিয়েছে, লাশ হয়ে গেছে ওরা দু'জন ।

আপাতত আর কোনও বিপদ নেই, ভাবল রানা । কিন্তু গভীর এই কূপ থেকে কোনোভাবে বেরোতে না পারলে ধীরে ধীরে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে ওদের ।

(দ্বিতীয় খণ্ডে সমাপ্য)

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

নরকের কীট

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সত্যিই কি সবুজ-শ্যামল-মায়াময় এই বাংলাদেশ হয়ে

যাবে ধূ-ধূ মরুভূমি? কিছুতেই না!

ইয়েমেনের মৃত্যু-কূপ থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়ার

দুই দিকে ছুটল রানা ও সোহেল।

শত্রু-বিমান দখল করার পরও আকাশের বহু ওপর

থেকে জ্বলন্ত বিমান ছেড়ে ঝাঁপ দিতে বাধ্য হলো রানা।

তারপর বন্দি হলো রূপকথার মত অদ্ভুত এক

সভ্যতা বিবর্জিত দেশে।

ওদিকে শত্রু-দ্রাকো চেপে পৌঁছুল সোহেল মিশরে।

খুনি জায়েদের ন্যানোবটগুলো নাসের হৃদের

প্রকাণ্ড আসওয়ান ড্যাম উড়িয়ে দেয়ার আগেই

তা ঠেকানোর চেষ্টা করতে হবে! পারবে সোহেল?

অবশেষে নৃশংস একদল খুনির মোকাবিলা করতে

ভাসমান দ্বীপে গিয়ে উঠল রানা। সেখানে ওকে

চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে চায় সর্বভুক ওই নরকের কীট!



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে সহস্রসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থান সন্ধান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা দিয়ে বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মুজিব

খীন রোড, ঢাকা।

শুনেছি, আপনার এলাকায় কোনও লাইব্রেরি নেই? এটা কেমন কথা? আপনার এলাকাবাসী তো সব শিক্ষিত ব্যক্তি। সবাই মিলে একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারলেন না?

✱ সাধারণত পাঠাগার গড়ে উঠতি বয়সের ছেলেরা। ওরা তো এখন খুব ব্যস্ত লেখাপড়া, কোচিং, ফেসবুক আর মোবাইল নিয়ে। ব্যস্ত বুড়োরাও।

এ বি এম তামিম, মোবা: ০১৮৩২-২৪৯০০০

আসমা ভবন, সৈয়দ শাহ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম ৪২০৩।

কাজীদা, কেমন আছেন? অনেক দিন আপনাকে চিঠি লিখি না। পরীক্ষার পর লিখতে বসে বার-বার মনে হচ্ছে আপনার কাছে পৌছাবে কি না। আচ্ছা, কন তো, পাঞ্চ লাইন কী জিনিস? আপনি যে সংজ্ঞাই দেন, আমি বলব, মাসুদ রানার গল্পের যে লাইনগুলো পড়ে রানার জন্য বুকটা হাহাকার করে ওঠে, তা-ই পাঞ্চ লাইন। আপনার বইয়ের শেষ অংশগুলো মাঝে-মাঝে একদম কাবু করে ফেলে, জাদুর মত।

উদাহরণ:

নিখোঁজ: হঠাৎ করেই পরিবেশটা বড্ড নিস্তব্ধ মনে হলো রানার কাছে, একটা পাখিও ডাকছে না কোথাও। যেন প্রকৃতিও নীরবতা পালন করছে এক বীর দেশপ্রেমিকের চির-বিদায়ে। শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে এল রানার।

স্বপ্নের ভালবাসা: ওদের দু'জনকে নিভতে থাকতে দিয়ে ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এল রানা। রেলিং ধরে আকাশের দিকে তাকাল। একটা-দুটো করে

তারা ফুটে গুরু করেছে। সাঁঝ নামলেই কী এক অজানা কারণে বিষণ্ণ হয়ে যায় ওর মনটা। সেই বিষণ্ণতা যেমন প্রাচীন, তেমনি গভীর। মানে খোঁজে জীবনের, পায় না।

বহু দূরে তাকিয়ে আছে রানা। বিড়বিড় করে বলল, ‘কী রে, লিয়ন? খুশি হয়েছিস, দোস্ত?’

হ্যাকার: ‘আই, ছাড়ো, ছাড়ো। করছটা কী... মাসুদ ভাইয়ের সামনে...’ বলতে-বলতে থেমে গেল টিনা। রানা নেই। ওদের দু’জনকে একা হবার সুযোগ দিয়ে কখন যেন চলে গেছে ও।

কাজীদা, আমার এমনটা মনে হয়, তা-ই লিখলাম। সবার এমন মনে না-ও হতে পারে।

পাতকিনী বইটির জন্য ধন্যবাদ। বইটিতে মাসুদ রানা ও সোহানা যেন বাংলার সবুজ মাঠে, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো গ্রামীণ বালক-বালিকার প্রতিচ্ছবি। যদিও বিদেশ, তারপরেও। আমার একটি কাল্পনিক গ্রাম আছে। গ্রামটিতে একটি ছোট নদী, পাহাড়, বিশাল বাগান আর হরেক রকম পাখি ও গাছগাছালি আছে। গ্রামটির নাম নিসর্গ পল্লী। সেখানে রয়েছে তিনটি কুঁড়ে ঘর—একটিতে লাইব্রেরি ও স্টাডিরুম, আরেকটিতে থাকি আমি। বাকিটা আপনাদের জন্য। মন খারাপ থাকলেই চলে আসবেন।

* আর মন ভাল থাকলে? আসবো না? ...আপনার কোমল অনুভূতির নরম পরশ মাখা চিঠিটা খুব ভাল লাগল। ধন্যবাদ।

ফরহাদ

রামপুরা, ঢাকা।

পাতকিনী পড়ছি। ভাল লাগছে—হঠাৎই ছন্দপতন: ‘ওরা আসছে,’ ভিটেলা রেমারিকের কণ্ঠ শুনল রানা। আমার মাথায় সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল। কিছু অসঙ্গতি ধরা পড়ল। সাউদিয়া ১০৩-এ লিভার সিরোসিসে মৃত রেমারিক আবার সশরীরে হাজির। লেখার সময় স্মরণ ছিল না নিশ্চয়ই? জানি, বলতে পারেন মৃত্যুর আগের কাহিনি। কিন্তু কুয়াশার সাগরেদ পবনের কথা বলে এবং ফোর-জি’র ব্যাপক ব্যবহার সেটা কঠিন করে তুলবে। তবে রেমারিক আমাদের সঙ্গেই থাকুক, উপযুক্ত কাহিনি যদি পান, তবে আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য আনবেন আশা করি।

প্রচ্ছদ চলনসই, তবে বিপ্লবদাকে ধন্যবাদ জানাতে কার্পণ্য করব না। আমার চিঠি আপনার ভাল লাগে জেনে খুব খুশি হলাম। সুস্থ থাকুন সবসময়।

* কে বলেছে রেমারিক মারা গেছে? রানা? উইঁ। ও তো মাল্টা-গোজো ফেরি বোটের টপ ডেকে দাঁড়িয়ে শুধু ভেবেছে। তখন সেই রকম সংবাদই পেয়েছিল। মাস ছয়েক পর রেমারিক ফিরে আসায় ভুলটা ভেঙেছে ওর। তবে তখন কাছেপিঠে ওই ফেরি ছিল না বলে রানা টপ ডেকে দাঁড়িয়ে ওর কথা ভাবতে পারেনি। আর বলুন তো, ও না ভাবলে আমরা বলি কী করে?

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ২০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজার বরাবর লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না। বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ডি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ১০০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪-৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

৪/৫/১৫ সূত্রের সন্ধান+অমঙ্গলের পূর্বাভাস+ভুতুড়ে পুতুল

(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৩৫) শামসুদ্দীন নওয়াব

সূত্রের সন্ধান/শামসুদ্দীন নওয়াব: কারাতে ক্লাসে ভর্তি হয়েছে তিন গোয়েন্দা। বিল লারা নামে একটি ছেলে বিখ্যাত সিনেমাষ্টার ক্রস ল্যাণ্ডের উপহার দেয়া একটি ব্ল্যাক বেণ্ট নিয়ে এল। কিন্তু ক্রাস শেষ হওয়ার পরপরই জানা গেল বেণ্টটি চুরি গেছে। কথা ছিল বিল ক্রস ল্যাণ্ডকে কারাতে ক্লাসে নিয়ে আসবে। কিন্তু এখন বলছে চোরদের মাঝে সে অ্যাকশন হিরোকে আনবে না। সবাই হতাশ। অগত্যা তদন্তে নামল তিন গোয়েন্দা।

অমঙ্গলের পূর্বাভাস/শামসুদ্দীন নওয়াব: বিডনের রক্ষক মুমূর্ষু, তিনি আশঙ্কা করছেন ভয়ঙ্কর অশুভ কোন শক্তি বিডন গ্রহটিকে গ্রাস করতে চাইছে। হিরু চাচার সাহায্য চাইলেন রক্ষক। বিডনের রক্ষা করতে গিয়ে ভয়ানক এক বিভীষিকার মুখোমুখি হলো চাচা-ভাতিজা। প্রাণ নিয়ে টানাটানি। রুখে দাঁড়ানো ছাড়া গতি রইল না হিরু চাচা আর কিশোরের।

ভুতুড়ে পুতুল/শামসুদ্দীন নওয়াব: মেরি চাচীর বোনের ছেলে কিন কিছুদিন থাকবে বলে খালার বাসায় এসেছে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে অদ্ভুত এক পুতুল। ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা করে কিশোরকে তটস্থ করে রেখেছে ওটা। কিশোরের ধারণা পুতুলটা জ্যান্ত। আসলেই কি তাই?

আরও আসছে

১১/৫/১৫ বিপাক

(ওয়েস্টার্ন)

মাসুদ আনোয়ার

মাসুদ রানা

নরকের কীট

[প্রথম খন্ড]

কাজী আনোয়ার হোসেন

কেন ক্রমেই হাস পাচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশের গড় বৃষ্টিপাত ?
তবে কি আসছে মারাত্মক খড়া, তারপর ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ ?
এ বিষয়ে রিসার্চ করতে গিয়েই গায়েব হয়ে গেল নুমার তিনজন
গবেষক। রানা-সোহেল তখন ছুটিতে। বন্ধু রাহাত খানের
সাহায্য চাইলেন নুমা চিফ অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিল্টন।
মালদ্বীপে কার্যত বাতিল হলো রানা ও সোহেলের ছুটি। বিসিআই
চিফের নির্দেশে তৎপর হয়ে উঠলো ওরা। রানা জানতে চাইল
কেন এক অদ্ভুত সুন্দরী চোখ রেখেছে ওদের উপর ? কিডন্যাপারদের
কাছ থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করেই ছুটল ভাসমান এক দ্বীপের
পিছনে, সেখান থেকে ছুটল দুই বন্ধু সুদূর ইয়েমেনে। পৌছেও গেল
শত্রু-শিবিরে, দেখল ন্যানোবটের কারখানা। কিন্তু কিছু করার আগেই
ফেলে দেয়া হল ওদেরকে গভীর এক মৃত্যু কূপে।



সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

প্রজাপতি শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০